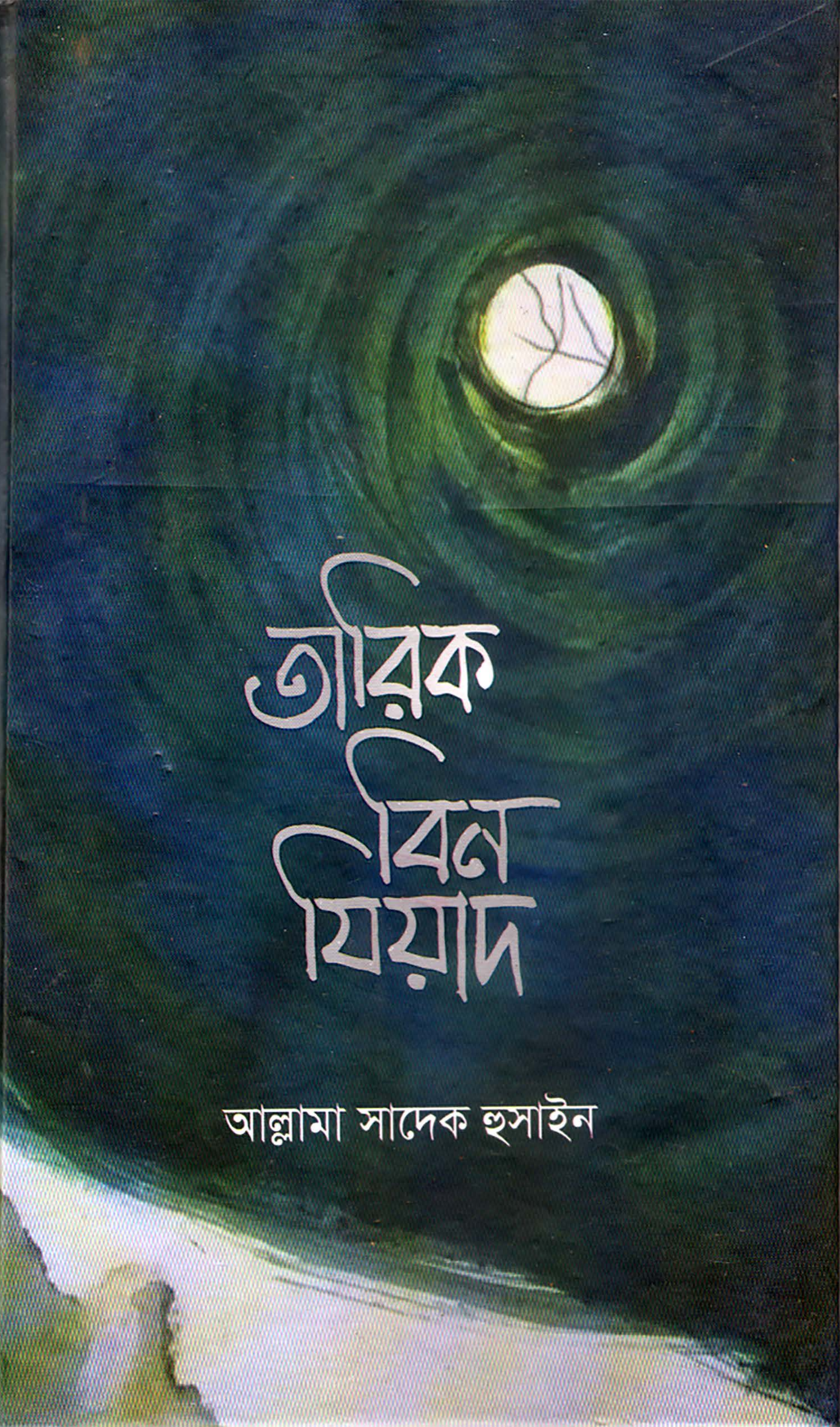

তারিক বিন যিয়াদ

আল্লামা সাদেক হুসাইন

তারিক বিন যিয়াদ

তারিক বিন যিয়াদ

মূল
আল্লামা সাদিক হুসাইন রহ.

অনুবাদ
এ এন এম মাহবুবুর রহমান ভূঞা

নজরে সানি
মাওলানা আবদুল্লাহ জুবায়ের (রাফি)
ফাযেল : জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

মাকতাবাতুত তাকওয়া
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৬২-৪১৫০৭০

তারিক বিন যিয়াদ

মূল আল্লামা সাদিক হুসাইন রহ.

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ আগস্ট : ২০১৫ ঈসায়ী, জিলকদ : ১৪৩৬ হিজরী
প্রথম সংস্করণ অক্টোবর : ২০১৯ ঈসায়ী, সফর : ১৪৪১ হিজরী

প্রকাশনায় ইবন শামসুজ্জামান (কুতুব ভূঁইয়া)
মাকতাবাতুত তাকওয়া
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৬২৪১৫০৭০

মূল্য ৩৪০ (তিনশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণে দি হক প্রিন্টার্স, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

বন্ধু, তোমার বহ্নির শিখা জ্বালালো যে দাবদাহে
মোর কল্পনা ঘন-বনে, সহসা হেরিনু তাহে,
সত্য বন্দী অক্ত-অন্ধকারের কারার মাঝে
মিথ্যা দীপ্ত ভাস্করসম, নিত্য সে হেথা রাজে।

* * *

একদা যাহার কৃপাণের আভা আলো দিল বসুধারে,
বড় দুঃখ জাগে মর্‌চে ধরেছে আজি সেই তরবারে।
তারি মাঝে লুটে স্পেন-বিজয়ী চিরজয়ী শমসের–
তুলে দিনু তাহে; তোমার হস্তে আবেগে এ-হৃদয়ের।
আজাদীর এই প্রথম প্রভাতে শিশু চির-নির্ভর,
মোর মুসাসম বাহিবার যেন করিতে দিগ্বিজয়।

ভূমিকা

[কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব লিখিত অমর বাণী]

তমাদ্দুনিক সংগঠনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন আমাদের কবি-সাহিত্যিরা।

কিন্তু আফসোস! আমাদের যাঁরা কবি-সাহিত্যিক তাঁদের অনেকেরই এ সম্বন্ধে কোনো চেতনা নেই। মনে তাঁদের এখনো বাঁধা রয়েছে শতাব্দীর গোলামীর জিঞ্জির। তাঁদের কাছে সাহিত্য যেন নিছক একটা স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। নতুন যুগের পদধ্বনি তাঁরা এখনো শুনতে পাননি।

সুখের বিষয়, আমাদের তরুণ ঔপন্যাসিক ইব্রাহীম খলিল সাহেব এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাঁর সাহিত্যে দেখতে পেয়েছি একটা সৃষ্টির বেদনা, একটা সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি, আর দেশ ও জাতির প্রতি একটা আন্তরিক মমত্ববোধ। ইতিপূর্বে তিনি 'সমাধি' নামক একটি উপন্যাস লিখে যশস্বী হয়েছেন; স্পেন-বিজয়ী মূসা তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। আমি তাঁর নব সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হয়েছি। উপন্যাস লিখবার আঙ্গিক (technique) লেখকের জানা আছে, তাই তাঁর লেখা হয়ে ওঠে রসঘন ও প্রাণবন্ত। বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি, তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত এবং অন্তরের ঐকান্তিক সংবেদনাই তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের মাধুর্য-গৌরব ও প্রতিভার পরিচয় তো সেখানেই।

গত যুগে আমাদের কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা যে সার্থক হয়েছে, তা বলা যায় না। উপন্যাস লেখা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর পেছনে দরকার একটা সুষ্ঠু আত্মবলিষ্ঠ ভাবোতকর্ষ এবং সমালাচকের সৃষ্টিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। অক্ষমের হাতে তা সার্থক হয় না। এই নাট্যকারের মধ্যে সে শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দিত।

ঝর্না যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে, ঠিক তখনই যেমন তাকে কোনো ছকে ফেলে আমরা উপসংহার টেনে দিতে পারি না, ঠিক তেমনি ইব্রাহীম খলীল সম্বন্ধেও শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। তবে নতুন জমানার নবসৃষ্টির প্রেরণাপথে তিনি যে একজন অগ্রপথিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক স্পেন-বিজয়ের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীকে রূপ দিয়েছেন। মহাবীর মূসার আদেশে তারিক মাত্র সাত হাজার সৈন্য নিয়ে অগণিত খ্রিস্টান সেনার মোকাবেলায় যেমন করে স্পেন বিজয় করলেন, সেই কাহিনীই নাটকের বিষয়বস্তু। লেখক তাঁর নাটকে সেই যুগের এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন– যা মনকে আনন্দ দেয়। স্থানে স্থানে তাঁর মন্তব্য ও ইঙ্গিতগুলো চমৎকার হয়েছে।

দৃষ্টান্ত দেখুন :

“মূসা... সেই হযতের উম্মত হয়ে মুসলমান ভয় করবে শত্রুর সংখ্যাকে? অসম্ভব। এ হতে পারে না। শোন তারিক, যুদ্ধ জয় হয় সংখ্যা বলে নয়–ঈমানের বলে। যতদিন মুসলমানের বুকে ঈমানের জোর থাকবে, ততদিন দুনিয়াতে সে থাকবে অজেয়-অপরাজেয়।” (৪ পৃষ্ঠা)

অন্য আর একস্থানে লেখক বলেছেন :

“মুসলমান ভীরু নসীবের দাসত্ব করে না, নসীবই করে তার গোলাম।”

চমৎকার! এই ধরনের বহু ‘ভাববার’ কথা আছে এই উপন্যাসটিতে। এই ‘ভাববার’ মধ্যেই নিহিত থাকে নাটকের সার্থকতা এবং সৃষ্টির গৌরব, –তথা নাট; প্রতিভার বিকাশ।

বাংলার মুসলিম সমাজে রেনেসাঁ আনতে হলে উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সিনেমা থিয়েটার দেখব অথচ নিজেদের উপযোগী করে তা গড়ে তুলব না, এ মনোভাব মারাত্মক। দিন দিন বিজাতীয় আদর্শের নাটক দেখে দেখেই মন ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে আমাদের নিজেদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের অতীতের গৌরব-গাথা ক্রমে ক্রমে ধারণা ও অনুধাবনের বাইরে চলে যাচ্ছে। উর্দুওয়ালারা ইতিপূর্বেই এ কাজ করেছে; ইসলামী আদর্শ বজায় রেখে তাা চিত্র-নাটক রচনা করে সমাজকে বিজাতীয় আদর্শ থেকে অন্তত বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার মুসলমানরা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। এই পথে পা বাড়িয়ে লেখক সত্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই প্রথম শুরু হয়েছিল ইসলামের দিগবিজয়। একদিকে স্পেন, কর্ডোভা, অপরদিকে প্রাচ্যের দেশসমূহের বুকের উপর দিয়ে সে জয়যাত্রা চলে গেছে দুর্নিবার। আমাদের তামুদ্দুনিক জয়যাত্রার প্রথমেই উপহার দিলেন একজন শিল্পী সেনানী সেই মহাবীর মূসা-তারিকের রোমাঞ্চকর স্পেন-বিজয়ী কাহিনী। এ-ও যেন “আর এক স্পেন-বিজয়”! এর জেরে জড়ানো আছে, ‘কুতুবমিনার’ ‘তাজমহল’ ‘জুমা মসজিদ’ এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন। সে স্বপ্নও তাঁর এবং তাঁর সমধর্মীদের হাতে সফল হয়ে উঠুক, এই কামনাই করি।

শান্তিনগর, ঢাকা –গোলাম মোস্তফা
১০/০৭/৪৯

মুখবন্ধ

মুসলমানদের স্পেনবিজয়ের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম তারিক ইবনে যিয়াদ। অসমসাহসী যোদ্ধাহিসেবে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত। মাওলানা সাদিক হুসাইন একজন ঐতিহাসিক ও উর্দু কথাসাহিত্যিক। ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখক উপন্যাসের আঙ্গিকে সে মহান বিজয়ীর চরিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। বইটি উপন্যাস হলেও লেখক কোনো চরিত্রকে অতি মানবিক গুণাবলীর রঙ চড়িয়ে দেননি। বরং ঐতিহাসিক চিত্রায়নে লেখকের সংযমী ভাষা কাহিনিকে করে তুলেছে আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী।

ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী তারিক ইবনে যিয়াদের ন্যায় প্রতিষ্ঠায় দুর্বার সংকল্পআর নিপীড়িত মানবতার মুক্তির তাঁর দরদ ও আকুতি আমাদের প্রেরণার উৎস। এ মহান বিজয়ীর অজানা ইতিহাস ভবিষ্যত বংশধরের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

গ্রন্থখানি নির্বাচন ও অনুবাদের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন বন্ধুবর আবুসাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী। একরকম তাঁর একক উৎসাহেই আমি বইটির অনুবাদে হাতদিই। পরে জীবনসঙ্গিনী বেগম জাকিয়া পারভীনের ব্যক্তিগত প্রেরণা ও উৎসাহে দেরিতে হলেও অনুবাদ কার্য সমাপ্ত করি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতেও তাঁর বিশেষ অবদান আছে।

বইটি প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ধাপে ধাপে যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এ শুভ মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে সবাইকে স্মরণ করছি। আল্লাহ সবাইকে জাযায়েখায়ের দান করুন।

পরিশেষে বলি, বইটি পাঠকের কাছে ভালো লাগলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ হাফেজ।

১৮/১২/১৯৮৮ ঈ.

অনুবাদক
এ এন এম মাহবুবুর রহমান ভূঞা

সূচিপত্র

প্রথম অংশ

এক. ফরিয়াদ ০৯
দুই. বিস্ময়কর স্বপ্ন ২২
তিন. রওয়ানা ২৬
চার. সুসংবাদ ৩১
পাঁচ. অপর এক মজলুম ৩৫
ছয়. যুদ্ধ ৪৫
সাত. পরাজয় ৫১
আট. বন্দীকরণ ৫৪
নয়. পশ্চাদ্ধাবন ৫৯
দশ. ফেরারী ৬২
এগার. সম্রাট রডারিক ৬৬
বার. দুই বৃদ্ধ রক্ষী ৭০
তের. ভয় ৭৪
চৌদ্দ. সামরিক চুক্তি ৭৯
পনের. রহস্যময় গম্বুজ ৮৪
ষোল. গম্বুজের গোপন রহস্য ৮৮
সতের. প্রস্থান ৯২
আঠার. নিখোঁজ ৯৫
উনিশ. দুঃখজনক সংবাদ ১০০
বিশ. সাহায্যকারী বাহিনী ১০৪
একুশ. একটি সুন্দর প্রতিকৃতি ১০৮
বাইশ. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ১১২

দ্বিতীয় অংশ

এক. হারিয়ে গেল বিলকিস ১১৯
দুই. বিরাট বিজয় ১২৩
তিন. অগ্রযাত্রা ১২৮
চার. প্রকৃতির ভাণ্ডার ১৩২

পাঁচ. অহঙ্কারী খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ১৩৫
ছয়. মালাগা জয় ১৩৯
সাত. হারানো প্রিয়তমা ১৪৩
আট. রূপের রানি বিলকিস ১৪৭
নয়. জিহাদী প্রেরণা ১৫১
দশ. দুঃসাহসিক অভিযান ১৫৫
এগার. দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদীন ১৫৯
বার. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ১৬৩
তের. কর্ডোভা বিজয় ১৬৭
চৌদ্দ. অদ্ভুত কৌশল ১৭১
পনের. ফরমান ১৭৭
ষোল. টলোডো বিজয় ১৮২
সতের. সুন্দরী রাহীল ১৮৭
আঠার. বিচ্ছিন্নদের পুনর্মিলন ১৯২
উনিশ. বিজয়ের বন্যা ১৯৭
বিশ. ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ২০৩
একুশ. শহীদি বুরূজ ২০৭
বাইশ. স্বপ্নের ব্যাখ্যা ২১৩
তেইশ. মোহময়ী নারী ২১৭
চব্বিশ. হৃদয়ের আকর্ষণ ২২১
পঁচিশ. নতুন সিদ্ধান্ত ২২৭
ছাব্বিশ. মহান বিজয়ীর অপসারণ ২৩২
সাতাশ. বিদ্রোহের শাস্তি ২৩৭
আটাশ. স্পেনের শাসক ২৪১
উনত্রিশ. প্রতারক খ্রিষ্টান ২৪৬
ত্রিশ. অপর এক বিজয় ২৫০
একত্রিশ. সুন্দরীদের আনন্দ ২৫৪
বত্রিশ. থিওডমিরের চালাকি ২৫৮
তেত্রিশ. থিওডমিরের বুদ্ধিমত্তা ২৬৩
চৌত্রিশ. তুষ্ট লোকদের আকাঙ্ক্ষা ২৬৮

প্রথম অংশ

সেদিন শুক্রবার। কায়রোর মুসলিম বাসিন্দারা জুমআর নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কায়রো আফ্রিকা মহাদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর। মুসলিম আরব সাম্রাজ্যের ভাইসরয় বা রাজ-প্রতিনিধি সে শহরে বাস করেন। তাঁর নাম মূসা ইবনে নুসায়র। তিনি খুবই সাহসী, বিচক্ষণ ও কৌশলী ব্যক্তি। খলিফা তাঁকে 'আমির-ই-খলিফা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল অভিযানে তিনি যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। খ্রিষ্টান জগতেও তাঁর বেশ পরিচিতি। তিনি একজন উঁচু মাপের শাসক। ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কেবল মুসলিম অধিবাসীরাই নয়, অমুসলিম প্রজারাও ছিল তাঁর শাসনের প্রশংসামুখর।

চলছে হিজরি ৯২ সাল। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা তখন ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক। খিলাফতের রাজধানী দামেশক। কায়রো শহর মুসলমানরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শহরটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক একটি চমকপ্রদ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হিজরি ৬০ সালে মুয়াবিয়া ইবনে ফুদায়হ আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল জয় করে নৈসর্গিক দৃশে সুশোভিত একটি সুন্দর উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। স্থানটি তাঁর এতোই পছন্দ হয় যে, তিনি সেখানে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করেন। কিন্তু সমস্যা হলো, গোটা উপত্যকা তখন নানা প্রকার হিংস্র জন্তু জানোয়ার ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীতে ভর্তি। সেখানে তখন মানুষের বসতি স্থাপন কিংবা কোনো শহর প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। কিন্তু মুয়াবিয়া ইবনে ফুদায়হ সেখানে একটি শহর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য উপত্যকার অদূরেই তিনি শিবির স্থাপন করলেন।

একদিন ফজরের পর ঘন বৃক্ষের সারি ও ডালপালা অতিক্রম করে তিনি সে উপত্যকায় পৌছলেন। সেখানে পৌছে তিনি উচ্চস্বরে বলতে থাকলেন, "হে জন্তু জানোয়াররা! বনকুঞ্জ সুশোভিত ও ছায়াঘেরা অঞ্চলে মুসলমানরা বসতি স্থাপন করতে চায়। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের অনুসারী মুসলিম জাতি এবং আল্লাহর অনুগত বান্দা। তোমরা এ স্থান ছেড়ে চলে যাও। এখন থেকে এটা আর তোমাদের আবাস নয়।" এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। পরপর তিনদিন তিনি সেখানে গিয়ে একই বাক্য উচ্চারণ করেন। তৃতীয় দিন

সমস্ত জন্তু-জানোয়ার সে উপত্যকা ছেড়ে চলে গেলে সেটি সম্পূর্ণরূপে একটি জন্তুমুক্ত স্থানে পরিণত হয়।'

একদিন এমন মুসলমানও ছিলেন, যাদের নির্দেশ জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত মেনে চলত; কিন্তু এখন মুসলমানদের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, আমাদের কথা আমরা নিজেরাই মেনে চলি না। সত্যি বলতে কি, প্রথম যুগের মুসলমানরাই ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তাঁরা এত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, সবসময় তাঁরা আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ করতেন, আল্লাহকে ভয় করতেন এবং নিবিষ্টচিত্তে তাঁর ইবাদত করতেন। আল্লাহ্ আদেশ নিষেধের প্রতি তাঁরা সর্বদা খেয়াল রাখতেন। ফলে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁদের দুআরও প্রভাব ছিল। তাঁরা যা দুআ করতেন, তা-ই কবুল হতো। তাঁরা যা আশা করতেন, আল্লাহ্ তাই পূরণ করতেন।

কিন্তু বর্তমানে আমরা মুসলমান হিসেবে পরিচিত কেবল মুসলমানের সন্তান হিসেবে। নতুবা আমাদের রীতিনীতি মুসলমানদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আমরা নামায পড়ি না, রোযা রাখি না, হালাল হারামের বাছ-বিচার করি না, এরপরও আমরা কিসের মুসলমান! কেন আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন? উপত্যকা থেকে সমস্ত জন্তু চলে যাওয়ার পর মুয়াবিয়া ইবনে ফুদায়হ সেখানে শহরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। অল্পকালের মধ্যে সেখানে এক বিরাট শহর গড়ে উঠল। দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ী, কারিগর ও পেশাজীবী লোকেরা সেখানে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফার প্রতিনিধি কায়রোয় বাস করতে শুরু করেন। তাতে শহরটির সৌন্দর্য আরো দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন ইসলামি শাসন ছিল, ছিল ইসলামি শহর, ইসলামি বিধিবিধান জারি ছিল। জুমআর দিনে সবরকমের ব্যবসা বাণিজ্য, দোকানপাট ও হাটবাজার বন্ধ থাকত। সকাল থেকেই মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ, শিশু থেকে বুড়ো সবাই জুমআর নামাযের প্রস্তুতি নিতে শুরু করতো। বর্তমানে আমাদের সমাজে ঈদের দিনে নামাযের যেমন ধুম পড়ে তখনকার দিনে জুমআর নামাযের তেমনি ধুম পড়ে যেতো।

কায়রোতে তখন পঞ্চাশটি গোসলখানা। লোকজন সেদিন সকাল সকালই গোসল সেরে মসজিদে আসতে শুরু করেছে। সেদিন তাদের আগে আগে মসজিদে পৌছার কারণ তারা শুনেছিল, সিউটা[১] থেকে কয়েকজন খ্রিষ্টান একটি ফরিয়াদ

---

[১] সিউটা মরক্কোর উত্তর উপকূলে অবস্থিত একটি শহর। সে শহরে কনস্টানটিনোপল সম্রাটের মনোনীত একজন গভর্নর বাস করতেন। যার নাম ছিল কাউন্ট জুলিয়ান। কিন্তু শহরটির অবস্থান ইস্তাম্বুল থেকে বহু দূরে হওয়ায় রোমান সম্রাট স্বেচ্ছায় উক্ত প্রদেশটি স্পেনের অধীনে ছেড়ে দেন। -লেখক

নিযে কায়রো এসেছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি মূসা ইবনে নুসায়র আজ তাদের ফরিয়াদ শুনবেন। তাই সূর্য মধ্যগগনে হেলে পড়ার পূর্বেই পঞ্চাশ হাজার লোক সংকুলান উপযোগী কায়রোর বিশাল মসজিদ মুসল্লিতে ভরে গেল। কয়েকজন মিনারে উঠে আযান দিলেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মসজিদ থেকে আযানের ধ্বনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এর পরপরই মূসা ইবনে নুসায়র তাঁর পুত্র আবদুল আযীযকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হয়ে গেলেন। তিনি দেখতে বয়সের ভারে কিছুটা ন্যূব্জ, মুখে পাকা লম্বা দাড়ি, নূরানী চেহারা, প্রশস্ত ললাট এবং ডাগর ডাগর চোখ। আর আব্দুল আযীয দেখতে সুদর্শন ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী যুবক, মুখে সুন্দর কাঁচা দাড়ি।

মূসা মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়ে জুমআর নামায পড়ালেন। নামাযের পর তিনি পুনরায় মিম্বারে উঠলেন। মুসল্লিগণ নিজ নিজ স্থানে বসে আছেন। সবার মাঝে গভীর নীরবতা বিরাজ করছে। মূসা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণকীর্তন করে তিনি বললেন, মুসলিম ভাইয়েরা! আমরা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ, যে জাতি নিজেদের খুবই সম্মানিত ও শক্তিধর বলে মনে করত, তারাই আজ ফরিয়াদিরূপে আমাদের দরবারে উপস্থিত হয়েছে। তোমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'সিউটা' নামক একটি শহর আছে। এটি একটি প্রাদেশিক রাজধানী। সে শহরের গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান একটি ফরিয়াদ নিয়ে আজই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। যদিও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য আমার অজানা তবে আমার ধারণা, তিনি স্পেনের খ্রিষ্টান সম্রাট রডারিক কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছেন। খ্রিষ্টান সম্রাটদের আরাম-আয়েশ ও বিলাস স্পৃহা এতো বেড়ে গিয়েছে যে, আপামর জনসাধারণের আবরু-ইজ্জত ও জান মালের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমি কাউন্ট জুলিয়ানকে তোমাদের সামনে ডেকে আনছি। আমি চাই, তোমরা সবাই নিজ নিজ স্থানে বসে তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

মূসা মিম্বার থেকে নেমে এসে সামনে আট-দশ জন লোক বসার মতো জায়গা খালি করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরই পাঁচ ছয়জন খ্রিষ্টান এসে মূসার দিকে অগ্রসর হতে থাকল। তারা যেদিক দিয়ে যাচ্ছে, বসা লোকেরা তাদের জন্য পথ করে দিচ্ছে। আগতদের মধ্যে একজন মাঝারি বয়সের, গাত্রবর্ণ গৌর, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে দামি রেশমী পোশাক, গলায় কয়েকটি মোতির মালা। তিনিই কাউন্ট জুলিয়ান।

সে দলে আছেন এক বৃদ্ধ, যার পরনে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা লম্বা চোগা, রেশমী ডোর দিয়ে কোমর বাঁধা, মাথায় উঁচু টুপি, নাভি পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। তিনি

হচ্ছেন সেভিলের পাদরি। দলের অন্যান্যরা জুলিয়ানের কর্মচারী। তারা মসজিদে ঢুকেই একবার চতুর্দিকে তাকালেন। মসজিদে এত লোকের সমাবেশ দেখে তারা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তারা সামনে এগিয়ে মূসার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। মূসা দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

জুলিয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা মূসাকে অভিবাদন জানালেন। তিনি হাসিমুখে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে তাদের বসতে বললেন। সবাই শান্তভাবে বসে পড়লেন। মূসা তাদের লক্ষ্য করে বললেন, বলুন, আপনারা কী বলতে চান।

জুলিয়ান : আমি এক নিপীড়িত, মজলুম। সম্রাট রডারিক আমার ইজ্জতের ওপর আঘাত হেনেছে। সে এতোই শক্তিধর ও প্রতাপশালী যে ইতালি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের রাজারা পর্যন্ত তাকে সমীহ করে চলে। তার স্বভাব এতোই হিংস্র যে কেউ তার থেকে প্রতিশোধ নিতে সাহস করে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে না পারব, ততক্ষণ আমার হৃদয়ের জ্বলতে থাকা আগুন নিভবে না।

মূসা : সে আপনাকে কীভাবে অপমান করেছে?

জুলিয়ান : সে এক দুর্ভাগ্যের কাহিনি। অত্যাচারী রডারিক আমার বংশের মান ইজ্জত ভূ-লুণ্ঠিত করে দিয়েছে।

এরপর সেভিলের পাদরি স্ক্যাফ বললেন,

সে এক লজ্জাকর ও হৃদয়বিদারক কাহিনি হুজুর! আমার কাছ থেকে শুনুন। রডারিক এক লাম্পট্যজনক আচরণ করেছে। তাতে ধর্ম ও মানবসভ্যতায় হাহাকার পড়ে গেছে।

মূসা : আমি আরও বিস্তারিত শুনতে চাই।

স্ক্যাফ : আমিও আপনাকে বিস্তারিত বলছি। আপনি তো জানেন স্পেনের বর্তমান সম্রাট রডারিক।[২]

---

[২] প্রথম দিকে রডারিক ছিল সামরিক বাহিনীর একজন সাধারণ নেতা। সে ছিল ভীষণ ধূর্ত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের অসৎ। তখন স্পেনের সম্রাট ছিলেন গথ বংশীয় ডনরা। তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু ও ধর্মভীরু। সে সময় পাদরিদের খুবই প্রভাব ছিল এবং তারা ইহুদিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। তারা অসহায় ইহুদিদের প্রতি জুলুম শুরু করে, এতে স্পেনের রাজা ডনরা পাদরিদের বাধা প্রদান করেন। সময় বুঝে রডারিক পাদরিদের রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং ইহুদিদের প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করে। পাদরিরা ডনরাকে বরখাস্ত করে রডারিককে সম্রাট মনোনীত করে। রডারিক সম্রাট হওয়ার পর রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হলেও ক্ষমতার অহমিকা তাকে পাপী করে তোলে। আরাম আয়েশে মত্ত হয়ে মানুষের মান ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে থাকে। কিন্তু তার প্রতি

মূসা : হ্যাঁ, তা জানি।

স্ক্যাফ : কয়েক যুগ ধরে স্পেনে এই রীতির প্রচলিত যে, প্রত্যেক গভর্নর, দুর্গাধিপতি বা মেয়র, প্রত্যেক নেতা, এমপি এবং কাউন্সিলদের সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত রাজা ও রানির সান্নিধ্যে লালিত পালিত হয়। ছেলেরা সম্রাটের কাছে এবং মেয়েরা রানির কাছে থাকে। শাহী প্রাসাদেই তাদের পড়াশুনা চলে। পরিণত বয়সে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তাদের বিদায় দেয়া হয়।

মূসা : এ অভিনব রীতির কারণ কী?

স্ক্যাফ : এর উদ্দেশ্য যাতে রাজদরবারে থেকে নেতা, প্রিন্স ও গভর্নরদের সন্তানরা দরবারী রীতিনীতি ও আদব কায়দা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

মূসা : আমার ধারণা, এই রীতির পেছনে অন্য কোনো কারণও আছে।

স্ক্যাফ : আপনার মতে আর কী কারণ থাকতে পারে?

মূসা : প্রিন্স, নেতা, গভর্নর এবং কাউন্সিলরের সন্তানদের সম্রাট এ উদ্দেশ্যে নিজের কাছে লালনপালন করেন যাতে পরিণত বয়সে তাদের কেউ বিদ্রোহ করতে না পারে।

স্ক্যাফ : জী হ্যাঁ, তা-ও হতে পারে। তবে তা কেবল নিয়মই নয়, বরং এটা একটি আইন এবং বহুদিন যাবত এ আইনটি চলে আসছে। কাউন্ট জুলিয়ানের এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, যার নাম ফ্লোরিন্ডা। বাল্যকাল থেকেই সে রানির কাছে লালিত পালিত হয়ে আসছে। যৌবনে পদার্পণের পর তার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং সম্রাট রডারিক তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। জোরপূর্বক তার সতীত্ব[৩] হরণ করে।

এই কাহিনি শুনে মূসার চেহারা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। রাগত কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, 'এরূপ নির্মম অত্যাচার!'

স্ক্যাফ : জী হ্যাঁ, ফ্লোরিন্ডা তার প্রতি এ অত্যাচারের কাহিনি পিতাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে। জুলিয়ান তা জেনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু বিপদের ভয়ে তিনি প্রতিবাদ করেননি। তিনি রডারিকের কাছে গিয়ে আবেদন করেন, ফ্লোরিন্ডার মা অত্যন্ত অসুস্থ। তার বাঁচার কোনো আশা নেই। সে শেষবারের মতো কন্যাকে

প্রভাবশালী পাদরিদের সমর্থন থাকায় কেউ তার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করতে পারত না। –লেখক

[৩] খ্রিষ্টান এবং আরব ঐতিহাসিকগণ রডারিকের এ পাপচার কাহিনির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এখানে যুদ্ধের কারণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ঘটনাটির প্রতি কেবল ইঙ্গিত করা হলো। –লেখক

একনজর দেখতে চায়। এই বাহানা দিয়ে তিনি তাঁর কন্যাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। আপনি হয়ত অবগত আছেন, রডারিকের পূর্বে স্পেনের সম্রাট ছিলেন ডনরা। তিনি তাঁর কন্যাকে কাউন্ট জুলিয়ানের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। ডনরা ছিলেন গথ রাজ বংশোদ্ভূত। এই ঘটনা দ্বারা রডারিক গথ বংশেরই অপমান করেছে।

মূসা : আপামর সাধারণ খ্রিষ্টানরা কি এ অমানবিক কাহিনি জানতে পারেনি?

স্ক্যাফ : ঘটনাটি সকলেই জেনেছে। সবাই অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছে।

মূসা : এতকিছু পরও কেন এমন পাপী ও লোভী রাজাকে অপসারণ বা হত্যা করা হয়নি?

স্ক্যাফ : কারণ, সবাই তাকে ভয় পায়।

মূসা : এখন আপনারা আমার কাছে কী চান?

জুলিয়ান : কেবল এইটুকু, আপনি আমার প্রতি তার অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন।

মূসা : কিন্তু আমরা তো বিনা কারণে কোনো দেশের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাই না।

জুলিয়ান : একজন মজলুমের সাহায্যার্থে আপনি সৈন্য প্রেরণ করবেন, এর চাইতে অধিক যুক্তিসঙ্গত কারণ আর কি থাকতে পারে?

মূসা : এটা তো আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার, আপনাদের নিজেদেরই এর সমাধান করা উচিত।

জুলিয়ান : আমাদের নিজেদের পক্ষে এর সমাধান সম্ভব হলে হয়ত আপনার দ্বারস্থ হতাম না।

স্ক্যাফ : আমরা তো মুসলমানদের সম্পর্কে শুনেছি, তাঁরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং মজলুমের সাহায্য করা নিজেদের অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেন।

মূসা : হ্যাঁ, আপনি সত্য কথাই শুনেছেন।

স্ক্যাফ : জুলিয়ানকে যে অপমান করা হলো, তা কি তার প্রতি জুলুম নয়?

মূসা : নিশ্চয়ই, এটা তার প্রতি চরম জুলুম।

স্ক্যাফ : আর রডারিক!

মূসা : সে তো জালেম, অত্যাচারী।

স্ক্যাফ : এরপরও একজন মজলুমকে সাহায্য করা এবং জালেমকে তার অত্যাচারের শাস্তি বিধান করা আপনার দায়িত্ব নয় কি?

মূসা : নিশ্চয়ই, মুসলমান হিসেবে এটা আমার জন্য অপরিহার্য।

স্ক্যাফ : তাহলে আপনি ঈশ্বরের নামে একজন মজলুমকে সাহায্য করুন এবং জালেমকে শাস্তি দিন। মানবতার নামে আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

জুলিয়ান : আপনি যদি আমাদের সাহায্য না করেন আর আমি যদি বর্বর রডারিকের অত্যচারের প্রতিশোধ নিতে না পারি, তাহলে যীশুর নামে শপথ করে বলছি, আমি সাগরে ডুবে আত্মহত্যা করব। আর আমার মৃত্যুর জন্য দায়ি হবেন আপনি।

এ কথা শুনে মূসা ঘাবড়ে গেলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আল্লাহ চাহেন তো আমি আপনাদের সাহায্য করব। কিন্তু ...

স্ক্যাফ : কিন্তু, কিসের কিন্তু?

মূসা : আমি খলিফার অধীন একজন প্রতিনিধি মাত্র, আমি স্বাধীন নই। আপনি চাইলে আপনাদের বিবৃত সমস্ত ঘটনা লিখে খলিফার কাছে দূত পাঠিয়ে সামরিক অভিযানের জন্য অনুমতি গ্রহণ করতে পারি।

স্ক্যাফ : আপনার প্রস্তাব অতি উত্তম।

মূসা : তাহলে আমি শিগগির লিখে পাঠাচ্ছি।

মূসা তৎক্ষণাৎ খলিফা বরাবর একটি পত্র লিখে একজন বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দিলেন। কাউন্ট জুলিয়ান ও স্ক্যাফ মূসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। তাদের বিদায়ের পর মূসা তাঁর পুত্র আবদুল আযীযকে সঙ্গে নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। এরপর মুসল্লিগণ সকলেই উৎসাহ ভরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ ঘরে চলে গেলেন।

দুই. বিস্ময়কর স্বপ্ন

সকল মুসলমান, মূসা ও অন্যান্য কর্তকর্তারা সবাই ভালো করে জানতেন খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক যেমন উদার, দয়ালু ও দাতা, তেমনি তিনি এও চান, দুনিয়ার কোনো অংশেই যেন কোনো মুসলমানের সামান্যতম দুঃখ-কষ্ট না হয় এবং প্রতিবেশী শাসকদের সঙ্গে যেন কোনোরূপ তিক্ততা দেখা না দেয়। তিনি চান, সকল দেশে যেন শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

মূসা ইবনে নুসায়র যখন পাশ্চাত্য প্রদেশগুলোর শাসক তখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আছ-ছাকাফী প্রাচ্যের প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা। হাজ্জাজ ইরাকে আর মূসা আফ্রিকায়। মূসার জানা ছিল, সিন্ধুর এক স্বেচ্ছাচারী রাজা লংকা দ্বীপ থেকে আগমনকারী একদল মুসলমানকে আটক করেছে এবং সেই রাজার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ব্যাপারে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ খলিফা থেকে অনুমতি লাভ করেছেন।

মূসা ধারণা ছিল, সিন্ধুতে বন্দী মুসলমানদের উদ্ধারের জন্য খলিফা হাজ্জাজকে সেখানে সৈন্য পাঠানোর অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু তিনি স্পেন অভিযানে সম্মত হবেন না। কারণ, তখন স্পেনের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া স্পেনের খ্রিষ্টানরা তখন পারস্পরিক কলহ বিবাদে লিপ্ত। এতদসত্ত্বেও খলিফার উদারতার কথা ভেবে মূসা কিছুটা আশান্বিতও ছিলেন। সে আশার ওপর ভরসা করে তিনি স্পেন অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। আফ্রিকা থেকে স্পেন যাওয়ার পথে সাগর পড়ে। জাহাজ ছাড়া সাগর পাড়ি দেয়া অসম্ভব।

ভূমধ্যসাগর আফ্রিকাকে স্পেন থেকে পৃথক করে দিয়েছে। মুসলমানরা তখনো ভূমধ্যসাগরে জাহাজ চালায়নি। কিন্তু স্পেন অভিযানে যেতে হলে সাগর পাড়ি দেয়ার জন্য জাহাজ তৈরি অপরিহার্য। সুতরাং মূসা জাহাজ তৈরি শুরু করলেন। মুসলমানরা জাহাজ চালায়নি মানে এই নয়, তারা জাহাজ তৈরি করতে ও চালাতে জানে না। তারা সবই জানে। কিন্তু এতদিন এর প্রয়োজন হয়নি বলেই করা হয়নি।

কেবল চারটি জাহাজ তৈরি করা হলো। সেগুলো বেশ বড়। প্রতিটি জাহাজে দুহাজার লোকসহ তাদের পনের বিশদিনের রসদপত্র সহজেই ধারণ করা যাবে।

কায়রোর প্রতিটি মুসলমান এই যুদ্ধে অংশগ্রহণে অত্যন্ত ইচ্ছুক। কিন্তু সে অভিযানে কী পরিমাণ সৈন্য পাঠানো হবে, কে এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের নেতৃত্ব

দিবেন, তা কারো জানা নেই। আগ্রহী মুসলমানরা তখন থেকেই যুদ্ধে যাওয়ার আবেদন শুরু করলেন। যারা অভিজ্ঞ ছিলেন, বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা-সাধনা শুরু করেন।

অনেকেই ধারণা করেছিলেন, মূসা হয়ত পুত্র আবদুল আযীযকে এই যুদ্ধের নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু মূসা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকায় নিশ্চিতভাবে এ ব্যাপারে কারো পক্ষে কিছু বলা সম্ভব ছিল না।

মুসলমানরা ইতিপূর্বেও স্পেনের অত্যাচারী সম্রাট রডারিকের বিলাসী জীবন-যাপনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তখন থেকেই তারা রডারিকের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁরা চাইতেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার এই পাপাচার ও লোভ-লালসার সমুচিত শাস্তি দেয়া হোক। কারণ তারা নিজেরা অন্যায় ও অসৎ কাজ করতেন না। অন্য কেউ অন্যায় করুক, তা-ও তাঁদের ছিল অপছন্দ। মুসলমানদের প্রত্যাশা ছিল তাদের মতো সারা দুনিয়ার মানুষ সোনার মানুষ হয়ে উঠুক। জুলুম, অত্যচার নির্মূল হয়ে সারা দুনিয়ায় ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

একদিনের ঘটনা। মূসা তাঁর কার্যালয়ে বসা। সে সময় তাঁর কাছে উপস্থিত আলী ইবনে রাবী, হাব্বাব ইবনে তামীমী ইবনে আব্দুল্লাহ আইয়ুব এবং তাঁর পুত্র আব্দুল আযীযের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা সবাই ছিলেন খ্যাতিমান যোদ্ধা এবং কোনো না কোনো অভিযানের নেতা।

আলী : স্পেন অভিযানের নেতৃত্বদানের ব্যাপারে কারো কথা ভেবেছেন কি?

মূসা : হ্যাঁ ভেবেছি। তাঁর নাম বললে আপনারা সবাই তাঁকে সমর্থন করবেন।

আবদুল আযীয : হযরত! আজ রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি।

মূসা : স্বপ্ন! তুমি কী স্বপ্ন দেখেছ?

ইতিমধ্যেই কাউন্ট জুলিয়ান ও পাদরি স্ক্যাফ সেখানে এসে হাজির হলেন। তারা কায়রোতেই অবস্থান করছিলেন। পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পর তারা উভয়ে আসন গ্রহণ করেন। মূসা আবদুল আযীযকে তাঁর স্বপ্ন বর্ণনার নির্দেশ দিলেন।

আবদুল আযীয : দেখি, আমি সাগরে ভ্রমণ করছি। আমার সাথে বহু লোক। আমরা একটি সবুজ শ্যামল পাহাড়ে আবতরণ করলাম। পাহাড় থেকে নেমে নৈসর্গিক দৃশ্য সুশোভিত মাঠের ওপর দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি। চারিদিকে হাজার হাজার পাখি। আমাদের দেখলেই সেগুলো উড়ে যায়। কখনো কখনো আমাদের ঠোকর দিতে আসছে; কিন্তু আমরা সেদিকে দৃষ্টি ফেরানো মাত্রই সেগুলো উড়ে যাচ্ছে।

মাঠ পার হয়ে আমরা জনবসতি দেখতে পেলাম। বসতিগুলো খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গোছানো। আরো এগিয়ে গিয়ে একটি প্রশস্ত নদী দেখতে

পেলাম। নদীর উপরে একটি উঁচু সেতু। সেতুটি খুবই মজবুত এবং দেখতেও সুন্দর। সেতুর অনেক নীচ দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে। আমি ইতিপূর্বে এতো উঁচু সেতু আর কখনো দেখিনি। সেতুর ওপর দিয়ে নদী পার হয়ে আমি একটি সুন্দর উপত্যকায় পৌঁছলাম। সেখানে অনেকগুলো ভাঙ্গাচোরা ইমারত। তার একটিতে একটি অতিকায় মূর্তি। মূর্তিটি এতো লম্বা যে, নিচে দাঁড়িয়ে এর মাথা দেখা যায় না। আমরা সকলেই মূর্তিটি দেখে বিস্মিত হলাম। এমন সময় মূর্তিটির পেছন দিক থেকে কয়েকজন মহিলাকে আসতে দেখলাম। যারা খুবই সুন্দরী এবং দামী রেশমী পোশাক পরিহিতা। তাদের গায়ে হীরা জহরত খচিত স্বর্ণালঙ্কার। দলের মধ্যমণি মহিলাটি সর্বাধিক সুন্দরী। তার পোশাক পরিচ্ছদও অধিকতর জমকালো। তার অলংকারগুলো সব মোতি ও জওহর সুশোভিত, গলায় দামী রুবি পাথরের হার। হারের চাকচিক্যে তার ললাট ও মুখমণ্ডল ঝলমল করছে। তার চেহারা চাঁদ থেকেও উজ্জ্বল। মহিলাটি আমাকে ইশারায় ডাকল। আমি তার পিছু নিলাম। কিন্তু মূর্তিটির কাছাকাছি পৌঁছতেই মহিলাটি ও তার সঙ্গীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এমনি মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

মূসা, স্ক্যাফ, কাউন্ট জুলিয়ানসহ উপস্থিত সবাই তন্ময় হয়ে আবদুল আযীযের একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে মনযোগ দিয়ে স্বপ্নের বর্ণনা শুনছিলেন। বর্ণনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূসা বললেন, 'তুমি বড় বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছ।'

জুলিয়ান : হ্যাঁ, বিস্ময়কর তো বটেই, তবে আমি একটি বিষয় জানতে চাই।

আবদুল আযীয : কী বিষয়?

জুলিয়ান : আপনি কি কখনো স্পেনে গিয়েছেন?

আবদুল আযীয : না তো, কখনো যাইনি।

মূসা : হঠাৎ আপনার এ প্রশ্ন কেন?

জুলিয়ান : কারণ, তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তা হুবহু স্পেনেরই দৃশ্যের বর্ণনা।

মূসা : সেখানকার মাঠঘাট ও পাহাড় পর্বত কি খুবই শস্য শ্যামল?

জুলিয়ান : জী হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে স্পেন হলো একটি ভূ-স্বর্গ। স্রষ্টা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, তার সবই স্পেনে রয়েছে। ফল ফুলের সমারোহ ও পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশের দিকে দিয়ে তা সিরিয়া, উপযোগী আবহাওয়ার বিচারে ইয়ামান বা আরবের মরুদ্যান, প্রচার ফুল উৎপাদনের দিক দিয়ে হেজায, ফুলের সুবাসের বিচারে হিন্দুস্তান, সমুদ্র উপকূলের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের দিক দিয়ে তা এডেনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মূসা : আপনি তো প্রশস্তির এক বিরাট ফিরিস্তি তুলে ধরলেন।

জুলিয়ান : দেশটি সত্যিকারভাবেই প্রশংসার দাবিদার; কিন্তু আপনার পুত্রের দেখা স্বপ্ন তো আমাকে বিস্মিতই করে ফেলেছে।

মূসা : কেন?

জুলিয়ান : কারণ, বাস্তবে তিনি কখনো স্পেন দেখেননি; কিন্তু স্বপ্নে ঠিকই স্পেনে পৌঁছে গেছেন। তিনি যে মূর্তিটির কথা বলেছেন, তা মারিডা নামক স্থানে অবস্থিত। মূর্তিটির নাম গ্যালিশিয়া। এতো বড় মূর্তি বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই।

মূসা : সেই মহিলাগুলো কারা?

জুলিয়ান : তিনি সবচেয়ে সুন্দরী যে মহিলার কথা বললেন, তিনি হলেন সম্রাট রডারিকের স্ত্রী নায়লা। তার গলার হারটি গোটা দুনিয়ায় নজীরবিহীন। তার সৌন্দর্যও বর্ণনার অনুরূপ। সেই সুন্দরী মহিলা সমগ্র স্পেনে 'হাসিনা' বা সুন্দরী নামে পরিচিতা।

মূসা আবদুল আযীযকে লক্ষ্য করে বললেন, বেটা! তাজ্জব ব্যাপার যে, তুমি স্বপ্নে স্পেন দেখে ফেলেছ!

আবদুল আযীয : আপনি কি আমাকে জাগ্রত অবস্থায় স্পেনে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না?

মূসা : না, সে অভিযানের জন্য অন্য কাউকে মনোনীত করা হয়েছে।

আবদুল আযীয (নিরাশ কণ্ঠে) : তিনি কে?

মূসা : খলিফার অনুমতি এসে পৌঁছলেই সবাইকে তা জানিয়ে দেয়া হবে।

এমনি মুহূর্তে এক খাদেম এসে খবর দিল, দূত দামেশক থেকে ফিরে এসেছে। শুনে সবাই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। মূসা দূতকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনতে বললেন। একজন তাকে ডেকে আনতে চলে গেলেন। সবাই অধীর আগ্রহে দূতের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

[illegible]

দূত দরবারে আসতে একটু দেরি হলো। সকলের মনে নানা প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি।

জুলিয়ান : আপনার কী মনে হয়, খলিফা স্পেন অভিযানের অনুমতি দিয়েছেন?

মূসা : সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছি না। কারণ এখন হিন্দুস্তানে একটি সামরিক অভিযান পাঠানো হচ্ছে আর সে অভিযানও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

জুলিয়ান : কেন?

মূসা : সিন্ধুর কপট অহংকারী রাজা কিছু সংখ্যক মুসলমানকে বন্দী করেছে, তাদের মুক্ত করার জন্য সেখানে সৈন্য পাঠানো খুবই প্রয়োজন।

জুলিয়ান : মুসলমানদের মধ্যে তো যথেষ্ট একতা আছে।

মূসা : কেন থাকবে না? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই'। সুতরাং এক ভাই কোনোরকম বিপদে পড়লে অথবা কোনো সমস্যায় পড়লে অপর ভাই কি তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না? কোনো মুসলমান যদি অপর মুসলমানের সমস্যা বা বিপদে সাহায্য না করে, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এজন্য প্রত্যেক মুসলমান অপর কোনো মুসলমান ভাইকে সম্ভাব্য সাহায্য করতে বাধ্য। ফলে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ভ্রাতৃত্ববোধ অত্যন্ত প্রবল।

জুলিয়ান : হ্যাঁ, আপনাদের মুসলমানদের মধ্যে যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভাতৃত্ববোধ রয়েছে, বিশ্বের অন্যকোনো জাতির মধ্যে তা অনুপস্থিত।

ইতিমধ্যে একজন দূত এসে ভিতরে প্রবেশ করল এবং সালাম জানাল।

মূসা সালামের জবাব দিয়ে দূতকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। দূত বসে পড়ল। মূসা বললেন, মহামান্য খলিফা কেমন আছেন?

দূত : আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন জনাব!

মূসা : দরবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা কেমন আছেন?

দূত : সবাই ভালো আছেন। আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। কিন্তু খলিফাসহ অন্য সবাই সিন্ধুর রাজা দাহির কর্তৃক আটককৃত মুসলমানদের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। সবার দৃষ্টি এখন সিন্ধু অভিযানের দিকে।

মূসা : আমার আবেদনের কোনো জবাব পাওয়া গেছে কি?

দূত : জী হ্যাঁ, খলিফা একখানা পত্র দিয়েছেন।

দূত পত্রখানা মূসার হাতে অর্পণ করে। মূসা সেটা হাতে নিয়ে চুম্বন করে খুলে পড়তে লাগলেন,

মুমিনদের আমির খলিফা আল্লাহর বান্দা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে খলিফার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রতিনিধি মূসা ইবনে নুসায়রের প্রতি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্,

আল্লাহর হামদ ও রাসূলের দরুদের পর সমাচার এই যে, দুনিয়া থেকে অন্যায় অত্যাচার, পাপাচার ও অসত্যকে দূর করার জন্য পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমানদের আবির্ভাব হয়েছে। এই মুহূর্তে সিন্ধু অভিযানটি আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমরা মজলুমকে সাহায্য করার ব্যাপারে হাত গুটিয়ে রাখতে পারি না। জুলিয়ান মজলুম, মজলুমের সাহায্য করা আমাদের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। আমি তোমার ওপর উক্ত অভিযানের দায়িত্ব ন্যস্ত করলাম। তুমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে অভিযানের আয়োজন শুরু করো। সাহসী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকে স্পেন অভিযানে পাঠাবে। একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত অভিযানের সেনাপতি নির্বাচিত করবে। প্রথমেই অধিক সংখ্যক সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন নেই। অল্প কিছু সৈন্য পাঠাবে। পরে প্রয়োজন হলে আবার পাঠাবে।

স্বাক্ষর ও সীল মোহর
দামেশক

পত্রখানা পাঠ করে মূসা খুবই আনন্দিত হলেন। সবচেয়ে বেশী খুশি হয়েছেন স্ক্যাফ ও কাউন্ট জুলিয়ান। স্ক্যাফ বললেন, এখন তো খলিফার অনুমতি পাওয়া গেল। এবার আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে জনাব?

মূসা : আমি তো কেবল এরই অপেক্ষায় ছিলাম। খলিফা আপনাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এখন আর কোনো বাঁধা নেই। আগামী পরশু শুক্রবার। সেদিন জুমার নামাযের পর আল্লাহ চাহেন তো আমাদের সৈন্য স্পেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে।

স্ক্যাফ এবং কাউন্ট জুলিয়ান মূসাকে অভিবাদন জানিয়ে সেদিনের মতো দরবার ত্যাগ করলেন। মূসা সেদিনই সাত হাজার বিচক্ষণ ও সাহসী যুবককে নির্বাচন করে তাদেরকে স্পেন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

স্পেন অভিযানে যাওয়ার জন্য হাজার হাজার লোক প্রস্তুত ছিল। সকলের ধারণা ছিল, এই অভিযানে কমপক্ষে পনের বিশ হাজার সৈন্য পাঠানো হবে। কিন্তু দেখা গেল, মাত্র সাত হাজার সৈন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তাতে সবাই সীমাহীন বিস্মিত হলো। নির্বাচিতরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রস্তুত হতে লাগল, অন্যরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। হাতে মাত্র একদিন। সবাই সেই ঐতিহাসিক দিনটির অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক সময় সেদিনটিও উপস্থিত হলো। সবাই

সকাল সকাল অযু গোসল সেরে মসজিদে আসতে লাগলেন। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মসজিদ ভরে গেল। যথাসময়ে আযান হলো এবং নামায সম্পন্ন হলো। মূসা নামায সেরে মিম্বারে এসে বসলেন। পিনপতন নীরব পরিবেশ। মূসা সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

মুসলমান ভাইয়েরা! সকল প্রশংসা মহান সত্তার, যিনি এই জগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি না কখনোও নিদ্রা যান এবং কখনো তন্দ্রাচ্ছন্ন অনুভব করেন না। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। যখন কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন। যখন এই ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনো তিনি থাকবেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য। আল্লাহর হাজার শুকরিয়া এজন্য যে, আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। মনে রেখো, বিশ্বে কেবল মুসলমানরাই তাওহীদের ধারক বাহক এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা কেবল মুসলমানদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে।

পৃথিবীতে আর কোনো নবীর আবির্ভাব হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই কুরআন, এই আইন এবং এর ধর্মই বিদ্যমান থাকবে। তাওরাত, যাবুর, ইনযীল ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছে। এগুলোর অনুসারীরা এগুলোকে অনেক রদবদল করে ফেলেছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আল কুরআনের একটি বর্ণেরও কোনোরকম রদবদল হয়নি। কেননা আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'আমি নিজেই তোমাদের ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণের যিম্মাদার।'

আল্লাহর থেকে অধিক সংরক্ষক আর কে হতে পারে? এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আজ পর্যন্ত একটি নোকতারও পরিবর্তন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। অতঃপর সমস্ত প্রশংসা করছি আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দার, যিনি শত সহস্র কষ্ট ভোগ করেও আল্লাহর বাণী প্রচারে পিছপা হননি। আমরা গর্বিত, আমরা এমন এক রাসূলের উম্মত যিনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ফেরেশতার বন্ধু এবং জগতবাসীর নয়নের মণি। তাঁর ওপর বর্ষিত হোক শত সহস্র সালাম।

পরকথা, কাউন্ট জুলিয়ান ফরিয়াদীরূপে মুসলমানদের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। মহামান্য খলিফা তাঁর ফরিয়াদ শ্রবণ করে তাঁকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। আজ স্পেনে সৈন্য পাঠানো হচ্ছে। তারা সেখানকার অনায় অত্যাচার, ভোগ বিলাস ও ব্যক্তি পূজার অবসান ঘটাবে। তোমরা সবাই দুআ করো। আল্লাহ যেন মুসলিম মুজাহিদদের বিজয় দান করেন।

সবাই হাত তুলে অত্যন্ত একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর কাছে দুআ করেন।

অতঃপর মূসা বললেন, কাকে এই অভিযানের সেনাপতি মনোনীত করা হবে, তোমরা সবাই হয়তো তা জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছো। আমার কাছে সহস্রাধিক ব্যক্তির লিখিত ও মৌখিক আবেদন এসছে। যাদের সকলেই এই অভিযানের নেতৃত্বলাভের প্রত্যাশী। আমার পুত্র আবদুল আযীযও তাদের একজন; কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তিকে সেনাপতি মনোনীত করেছি, যিনি সকল দিক দিয়েই উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি হচ্ছেন একজন বারবার গোলাম। আমি তাকে আযাদ করেছি। তার নাম তারিক।

তারিক ছিলেন বারবারের অধিবাসী। মুসলিম মুজাহিদদের বারবার আক্রমণের সময় তারিক স্বদেশ রক্ষায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধরত অবস্থায়ই তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হলেন। যুদ্ধবন্দীরা তখন গোলামে পরিণত হতো। সে হিসেবে তারিকও মুসলমানদের গোলামে পরিণত হন। তিনি মূসার কাছে থাকতেন। মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেন।

মূসা তখনই তারিককে আযাদ করে দিয়ে মরক্কোর গভর্নর নিযুক্ত করেন। যিনি ছিলেন একজন সাধারণ যুদ্ধ বন্দী ও গোলাম, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি হয়ে গেলেন একজন গভর্নর। বিশ্বে সাম্য ও উদারতার এর চাইতে বড় নজীর আর কি হতে পারে!

হিন্দুস্তানের নিচু শ্রেণির হিন্দুরা কোনো মন্দির বা উপাসনালয়ে গেলে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুদের পাশে বসতে পারে না। এমনকি উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরা যে পথ দিয়ে গমন করে, নিচু শ্রেণির হিন্দুরা সে পথ দিয়েও যেতে পারে না। মনু সংহিতা হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থ। তাতে এ কথাও লেখা হয়েছে, কোনো অস্পৃশ্যের কানে বেদ মন্ত্র শোনানো যাবে না। ভুলক্রমে কেউ শুনে ফেললে, তার কানে সিসা গলিয়ে ঢেলে দাও। খ্রিষ্টানদের মধ্যেও একই রীতি বর্তমান। কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সমাজে যেতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি, শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের দেবতা উচ্চ শ্রেণির দেবতাদের চাইতে স্বতন্ত্র। কী উদ্ভট কল্পনা!

একমাত্র ইসলামই উঁচু-নিচুর কোনো ভেদাভেদ করে না। এখানে কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের প্রশ্ন নেই। জাত-পাতের পার্থক্য নেই। যে কোনো দেশ বা যে কোনো বর্ণের লোকই হোক না কেন, ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অপর একজন মুসলমানের মতো যে কোনো মসজিদ, উপাসনালয় বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করে। তাই সাম্য যদি থেকে থাকে, তবে কেবল ইসলামেই আছে। যেখানে তাওহীদের বাণী প্রচারিত হয়েছে, সেখানে ইসলামের সাম্যমৈত্রীর আদর্শও প্রসারিত হয়েছে।

মুসলমানরা তারিকের নাম শুনতে পেলে সবাই অত্যন্ত খুশি হলেন। শুধু এজন্য যে, একজন নওমুসলিম এই সম্মানের অধিকারী হলেন। মুগীছ আর-রূমীর মতো প্রবীণ ব্যক্তিও তারিকের অধীনে গমন করবেন। সারা দুনিয়ার মানুষ জানতে পারলো, মুসলমানরা একজন নওমুসলিমকেও একজন প্রবীণ মুসলমানের মতোই মনে করে। মুসলমানরা মুগীছ আর-রূমীর মনোনয়নেও অত্যন্ত খুশি হলেন। তাঁদের আগেই জানানো হয়েছিল। উভয়েই প্রস্তুত ছিলেন। এবার মূসা সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, কায়রোর মুসলিম ভাইয়েরা! তোমরা আজ মুজাহিদদের আনন্দের সাথে বিদায় দাও। উপস্থিত মুসলমানরা সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মুজাহিদরা পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। যে পথ দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন, নারী পুরুষ, যুক বৃদ্ধ তাঁদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করছিল। প্রায় সকল কায়রোবাসী তাদের বিদায় জানাতে সমবেত হলো। এক আনন্দঘন পরিবেশে মুজাহিদদের বিদায় জানানো হলো।

চার. সুসংবাদ

সমুদ্র উপকূল কায়রো শহর থেকে বেশ দূরে। তাই সকল কায়রোবাসী মুজাহিদদের বিদায় জানাতে উপকূল পর্যন্ত আসতে পারেনি, তা সত্ত্বেও প্রায় পনের/বিশ হাজার লোক উপকূলে উপস্থিত হয়েছে। মুজাহিদরা ছিলেন পাগড়ী পরিহিত। লম্বা পাগড়ীর শুভ্র আঁচল এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। স্পেন অভিযানে গমনকারী মুসলিম মুজাহিদরা সবাই পদাতিক। ঘোড়া নেয়ার প্রয়োজনীয় জাহাজের ব্যবস্থা করতে না পারায় তাদের পদাতিকই পাঠাতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছে, তাঁরা যেন কোনো প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছেন। অথচ তাঁরা এমন এক দেশে যাচ্ছেন, যেখানকার প্রতিটি মানুষ তাদের রক্তপিয়াসী। এমন এক জাতির মোকাবিলা করতে তারা যাচ্ছেন যাদের অঢেল অস্ত্র ও জনবল আছে। তদুপরি তারা সে দেশেরই অধিবাসী। সে দেশের আকাশ-বাতাস তাদের পরিচিত। তারা যা চাইবে তাই পাবে। প্রয়োজন পরিমাণ সরঞ্জামের চাইতেও বেশি তারা লাভ করতে সক্ষম।

কিন্তু মুসলমানদের দেশ সেখান থেকে অনেক দূরে। মাঝখানে আবার সাগর। অতিরিক্ত কোনো প্রকার সাহায্যেরই আশা ছিল না। তাদের না আছে জনবল, আর না অস্ত্রবল। অনেকের কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্র, এমনকি বর্ম পর্যন্ত নেই। সৈন্য সংখ্যাও মাত্র সাত হাজার, কিন্তু সেদিকে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

তাদের সবচেয়ে বড় বল, তারা মুসলমান। আছে আল্লাহর ওপর তাদের পূর্ণ ভরসা। তাঁদের বিশ্বাস, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে বিজয় দান করবেন। জিহাদে অংশগহণের সুযোগ পাওয়াটাই তাদের সবচে বড় আনন্দ। এই আনন্দে নিমগ্ন হয়ে তাঁরা পথ চলছেন। দলের সর্বাগ্রে আছেন তারিক। তিনি বয়সে তরুণ, কিন্তু তাঁর বুকে পাহাড়সম সাহস আছে, আছে জিহাদী প্রেরণা। অপরদিকে আছেন মুগীছ আর-রূমী। মধ্যবয়সী হলেও আবেগ ও প্রেরণায় তিনি যুবকসম। তাদের পেছনে বিদায় সংবর্ধনাদানকারী অসংখ্য কায়রোবাসী। যাদের কাছে আছেনানা ধরনের ফলমূল, তরিতরকারি, খাদ্যসামগ্রী। তারা এসব দ্রব্যসামগ্রী মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে চলছে। প্রত্যেকেই চাইছে, তার উপহারটি যেন মুজাহিদগণ গ্রহণ করেন, তাহলে উপহারদাতাও জিহাদের ছওয়াবে অংশীদার হতে পারবে। মুজাহিদগণও সামনে যা পাচ্ছেন, অকপটে সেসব গ্রহণ করে নিচ্ছেন। একজন সওদাগর চাকরের মাথায় এবং খচ্চরের পিঠে করে এত অধিক পরিমাণ ফলমূল

নিয়ে এসেছেন যে, সারা রাস্তায় বণ্টনের পরও তা শেষ হয়নি। মুজাহিদরা সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে সে সওদাগর মূসার কাছে আবেদন জানালেন, তিনি যেন মুজাহিদদের একটু থামিয়ে দেন। তাতে তিনি তাঁর সমস্ত উপহারসামগ্রী মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করতে পারবেন। মূসা তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। অবশেষে সওদাগর তাঁর বয়ে আনা অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করতে সক্ষম হলেন।

স্ক্যাফ, কাউন্ট জুলিয়ান ও তার অন্য সঙ্গীরা মুসলমানদের বদান্যতার এ নমুনা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। পাদরি স্ক্যাফ কাউন্ট জুলিয়ানকে বললেন, আপনি কি মুসলমানদের অবস্থা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা এক মুসলমান অপর মুসলমানের প্রতি যে সৌজন্য প্রদর্শন করছে, আমাদের মধ্যে প্রিয়জনরাও একে অপরের প্রতি এমন সৌজন্য প্রদর্শন করে না।

মূসা তাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে পেয়ে বললেন, যাঁরা জিহাদে যাচ্ছেন তাঁরা আমাদেরই ভাই। তাঁদের মধ্যে কে ফিরে আসবেন আর কে শহীদ হবেন, আমরা তো বলতে পারি না। এজন্য আমরা আমাদের উত্তম জিনিসগুলো আমাদের কলিজার টুকরা মুজাহিদদের দিয়ে দিতে চাই। একজন স্নেহময়ী মা যেমন কলিজার টুকরা সন্তানকে সফরে পাঠানোর সময় নিজের প্রিয় জিনিসত্র দিয়ে দেন।

জুলিয়ান : এটা সত্য, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা রয়েছে, অন্য কোনো জাতির মধ্যে তা নেই। দেখুন না, মুজাহিদদের বিদায় বেলায় তারা হৃদয়ের কি আকুতিই না প্রকাশ করেছে। আমার তো হিংসে হয়, আমাদের জাতি যদি এমন হতো!

মূসা : যে সব মুজাহিদ আপনার সাথে স্পেনে যাচ্ছেন, তাঁরা কোনো পার্থিব সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশী নন। তাঁরা লোভাতুর হয়েও মুসলমানদের উপহার গ্রহণ করছে এমন নয়। তাঁদের মধ্যে তো অনেক সম্পদশালী ব্যক্তিও আছেন। উপহার গ্রহণের কারণ, তা গ্রহণ না করলে আগত মুসলমানরা মনে হয়ত কষ্ট পাবে। কেবল তাদের মন রক্ষার্থেই তাঁরা উপহারসামগ্রী গ্রহণ করছেন। তাছাড়া উপহার প্রদানকারীদেরও ছওয়াবের অংশীদার করা যাবে।

স্ক্যাফ : হ্যাঁ, এটাই সত্যি কথা।

ইতোমধ্যে মুজাহিদরা উপকূলে পৌঁছে গেছেন। সামনে অপেক্ষমান চারটি জাহাজ। প্রতিটি জাহাজের সঙ্গে ছোট ছোট নৌকা বাঁধা। একদিকে জুলিয়ানের একটি ছোট জাহাজ দাঁড়ানো। মুজাহিদদের জাহাজগুলো অনেক বড়ো। তাই সেগুলোকে তীরে ভেড়ানো সম্ভব নয়, ছোট নৌকাগুলো দিয়ে মালামাল জাহাজে

তোলার ব্যবস্থা করা হলো। মালামাল তোলা শেষ হলে মুজাহিদরা কায়রো থেকে আগত মুসলমানের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে নৌকার সাহায্যে জাহাজে উঠতে আরম্ভ করলেন। তীরে দাঁড়ানো মুসলমানরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকল মুজাহিদ জাহাজে উঠে পড়লেন। সবশেষে তারিক ও মুগীছ আর-রূমী জাহাজে উঠে এলেন। জাহাজগুলোতে ইসলামি পতাকা উড়ানো হলো। পাল তুলে দিয়ে নোঙ্গর তোলা হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে পানির বুক চিরে জাহাজগুলো সামনে এগিয়ে চলল।

মুসলিম মুজাহিদরা হাত নেড়ে তীরে অপেক্ষমাণ মুসলমানদের সালাম জানালেন, মুসলমানরাও সমভাবে সালামের জবাব দিলেন। সে কি আবেগঘন পরিবেশ! সবার চোখ অশ্রুসিক্ত, মুসলমানরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে মুজাহিদদের সফলতার জন্য মুনাজাত করলেন।

যতক্ষণ জাহাজগুলো দেখা গেল মুসলমানরা সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। একসময় ধীরে ধীরে জাহাজগুলো চোখের আড়াল হয়ে গেল। মুসলমানরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কায়রো ফিরে গেলেন।

জাহাজে উঠতে উঠতে আসরের সময় হয়ে এসেছিল। জাহাজে উঠেই তাঁরা আসরের নামায আদায় করেন। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায আদায় করেন। জাহাজ এগিয়ে চলেছে, আকাশে তারার মেলা, রাতের আঁধারে সমুদ্রের পানি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। বিদায় জানাতে আগত মুসলমানরা এত বেশি পরিমাণে আপ্যায়ন করেছিল যে, রাতে আর খাবারের প্রয়োজন হলো না। তাই এশার নামায পড়ে সকলেই শুয়ে পড়লেন। শেষ রাতে তারিকের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তিনি উঠে বসে পড়লেন এবং দরুদ পড়তে থাকেন। মুগীছ আর-রূমী তাঁর পাশেই ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনিও জেগে উঠেন। কালেমা পাঠ করে উঠে বসলেন। অতঃপর তারিককে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভোর হয়ে গেছে নাকি?

তারিক বললেন না, এখনো হয়নি, আরো দেরি আছে।

মুগীছ আর-রূমী : আপনি যে উঠে দরুদ পাঠ করছেন যে!

তারিক : আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি।

মুগীছ : এ যে ভারী সৌভাগ্যের ব্যাপার!

তারিক : হ্যাঁ, আমি নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করছি।

মুগীছ : স্বপ্নে যিনি রাসূলুল্লাহর দীদার লাভ করেছেন, তাঁর চাইতে সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে।

তারিক : দেখলাম, রাসূল (সা.) চার খলিফাসহ একদল সাহাবী নিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এদিকেই আসছেন। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমার দিকে

তাকিয়ে বললেন, 'তারিক! সামনে এগিয়ে যাও।' তারপর দেখলাম তিনি সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে স্পেনে প্রবেশ করছেন।

এ অবস্থা দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। এর পরপরই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আফসোস, স্বপ্নটা যদি আরো দীর্ঘতর হতো! আমি যদি আরো দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে পারতাম!

মুগীছ : আপনার ভাগ্যে যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ সাক্ষাত পেয়েছেন। আল্লাহর দরবারে হাজার শুকরিয়া, তিনি প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে আমাদের কাছে সুসংবাদ পাঠিয়েছেন।

তারিক : আসলে আমি আমার ভাগ্যের জন্য যতই গর্ব করি না কেন তার উপযুক্ততার তুলনায় আমি একান্তই নগণ্য।

মুগীছ : নিশ্চয়ই।

ভোর হলে ফজরের আযান দেয়া হলো। সকলেই ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাযের জন্য জমায়েত হলেন। তারিক ও মুগীছ উভয়েই নামাযের জন্য চলে গেলেন।

পাঁচ. অপার এবং মজনুম

সাত হাজার মুসলিম মুজাহিদ ৪টি জাহাজে করে রওয়ানা দিয়েছিলেন। প্রত্যেক জাহাজে পৃথক পৃথক জামাতে নামায আদায় করা হলো। নামায শেষ করে মুজাহিদরা জাহাজের ডেকে উঠে সামুদ্রিক দৃশ্য উপভোগ করতে থাকেন। তাঁদের জাহাজ যে প্রণালী দিয়ে যাচ্ছে, তার প্রশস্ততা মাত্র চৌদ্দ মাইল। প্রকৃতপক্ষে স্পেন আফ্রিকা মহাদেশের সাথে মিশে ইউরোপকে এশিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। এর একদিকে ভূমধ্যসাগর এবং অপরদিকে আটলান্টিক মহাসাগর। এশিয়া ও ইউরোপের মাঝখানে একটি প্রণালী আছে। মুসলিম মুজাহিদরা জাহাজে করে যে প্রণালি অতিক্রম করছিলেন, তা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। সামনে সবুজ দ্বীপ। দূর থেকে দ্বীপের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। সমগ্র দ্বীপটিই সবুজের এক সমারোহ। মুজাহিদরা সে দৃশ্য দেখে আনন্দমুখর হয়ে উঠেন। কাউন্ট জুলিয়ান এমনি এক মুহূর্তে তারিকের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি তারিককে লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা স্পেনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্বীপের নিকটবর্তী হচ্ছেন। তারিক জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোন স্থানের কথা বলছেন?

জুলিয়ান : এই হচ্ছে 'সবুজ দ্বীপ'[৪], স্পেনের একটি বিখ্যাত স্থান।

তারিক : সামনে যে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে, এর নিকটবর্তী অঞ্চলের নাম কি?

জুলিয়ান : এর নাম *লনজেরাক*, একে 'ব্যাঘ্রের শৃঙ্গ' নামেও অভিহিত করা হয়।

তারিক : কেন, এখানে কি অনেক বাঘ থাকে?

জুলিয়ান : স্থানটি সুন্দর বলে এখানে মানুষ যেমন বাস করতে পছন্দ করে, তেমনি জীব-জন্তুরাও স্থানটিকে পছন্দ করে। এখানে অনেক বাঘও আছে।

জাহাজটি ধীরে ধীরে লনজেরাকের দিকে ঘুরে গেল। ক্রমে সবুজ দ্বীপও নিকটবর্তী হয়ে আসছে। সূর্যও তখন ঊর্ধ্বগগনে উঠে এসেছে। সমুদ্রের নীল পানিতে ভরদুপুরের সূর্যালোক এক অনুপম দৃশ্যের অবতারণা করেছে। তারিক, মুগীছ আর-রূমীসহ সকল মুজাহিদ নিবিষ্টচিত্তে এই মোহনীয় দৃশ্য উপভোগ করছেন।

জুলিয়ান : স্পেনের সকল স্থানই অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাছাড়া রৌপ্যের খনিসহ অন্যান্য খনিজ দ্রব্যও রয়েছে।

---

[৪] আরবীতে বলা হয় আল জাযীরাতুল খাদরা। স্পেনের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় শহর। এর বর্তমান নাম 'আলজেসিস'।

তারিক : আল্লাহর শুকরিয়া, আমরা নিরাপদে স্পেনের উপকূলে এসে পৌঁছতে পেরেছি।

তারপর জাহাজগুলো নোঙ্গর করা হলো। ছোট নৌকাগুলো দিয়ে প্রথমে সাজ-সরঞ্জাম নামানো শুরু হলো।

জুলিয়ান : পথ দেখানোর জন্য এতক্ষণ তো আমি আপনাদের সাথে ছিলাম। এবার আমি বিদায় গ্রহণ করতে চাই।

তারিক : কোথায় যাবেন?

জুলিয়ান : সিউটা।

তারিক : আমার একটি কথা ছিল।

জুলিয়ান : আচ্ছা, বলুন।

তারিক : আমরা তো এখানকার পথঘাট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। স্থানীয় একজন পথপ্রদর্শক দিলে ভালো হতো।

জুলিয়ান : আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাদের সাহায্য করতে পারবে এমন কোনো লোক আমার সাথে নেই।

তারিক : ঠিক আছে, আল্লাহই আমাদের সহায়।

জুলিয়ান : এই ছোট ছোট পাহাড়গুলো পার হলে আপনারা একটি মাঠ দেখতে পাবেন। সেই মাঠ দিয়ে সোজা এগুলেই স্পেনের রাজধানী টলেডোয় পৌঁছে যাবেন। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।

জুলিয়ান আরও বললেন, মাঠ দিয়ে যে পথটি স্পেনে গেছে এর শেষ প্রান্তে সম্রাট রডারিকের একজন বিখ্যাত সেনাপতি থিওডমির কিছু সৈন্য নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

তারিক : সে কি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত?

জুলিয়ান : জী হ্যাঁ।

তারিক : তার সাথে কী পরিমাণ সৈন্য রয়েছে বলতে পারবেন?

জুলিয়ান : তাদের সঠিক সংখ্যা আমি বলতে পারব না।

তারিক : ঠিক আছে, আমাদের জানার প্রয়োজনও নেই। আমরা যখন এদেশে আসতে পেরেছি, তখন যে পরিমাণ সৈন্যই আসুক না কেন, আমরা তাদের মোকাবিলা করবই। হয়তো বিজয় নয়তো মৃত্যু, এদুয়ের যে কোনো একটিই আমাদের কাম্য।

জুলিয়ান : ঈশ্বর অবশ্যই আপনাদের বিজয় দান করবেন। আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলে চলছে, আপনাদের বিজয় ও রডারিকের সমুচিত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তা নির্বাপিত হবে না।

তারিক : সবুর করুন! আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জালিমকেই সমুচিত শাস্তি দিয়ে থাকেন।

জুলিয়ান : আমারও বিশ্বাস, জালিম একদিন না একদিন শাস্তি পাবেই। তবে আমার কন্যা তার অসম্মানের কথা ভেবে দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে।

তারিক : তাকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করবেন।

জুলিয়ান : আপনাদের আগমনের কথা শুনে সে হয়তো মনে শান্তি পাবে। যা-হোক, আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।

তারিক : আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।

জুলিয়ান : আরেকটা কথা, থিওডমির কিন্তু অত্যন্ত ধূর্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তার সম্পর্কে আপনারা সতর্ক থাকবেন। ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য করুন।

তারপর জুলিয়ান নিজ জাহাজে চলে গেলেন।

ইতোমধ্যেই জাহাজ থেকে মালপত্র নামিয়ে ফেলা হয়েছে। মুজাহিদরাও একে একে উঠে এসেছেন। তারিক ও মুগীছ সবশেষে জাহাজ থেকে নেমে এলেন। তারিক সকলকে লক্ষ্য করে বললেন,

প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা, আল্লাহ হাজারো শুকরিয়া যে, আমরা নিরপদে স্পেনের উপকূলে এসে পৌঁছতে পেরেছি। আপনারা জানেন, আল্লাহ্ মুমিনদের সাহায্য করেন। আল্লাহ্ চাহেন তো, আমরা স্পেন জয়ে সক্ষম হবো। আজ রাতে আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দর্শন লাভ করেছি। তিনি আমাকে স্পেন জয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা অতি অবশ্যই জয়ী হবো। আপনাদের অজানা নয়, এই অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের আনাচে কানাচে আমাদের শত্রু বিরাজমান। এদেশের পথঘাট আমাদের অচেনা, আমরা নিরস্ত্র ও সরঞ্জামবিহীন। সংখ্যায়ও আমরা অতি নগণ্য। তদুপরি আমরা পায়ে হেঁটে যাত্রা করতে হবে। অতএব, আমাদেরকে অনেক কষ্ট হবে। যারা এসব কষ্টের জন্য প্রস্তুত নন, তারা দেশে ফিরে যেতে পারেন। আমি তাদের সানন্দে বিদায় দিচ্ছি।

মুজাহিদরা সবাই নিশ্চুপ-নির্বাক। কেউ কোনো কথা বলছেন না। তারিক আবার বললেন, আপনাদের কেউ কি ফিরে যেতে চান না? সকলেই এক বাক্যে আওয়াজ তুললেন, না-না, আমরা কেউই ফিরে যাব না। তারিক বললেন, আপনারা ভালো করে ভেবে দেখুন, এখনো সময় আছে। সবাই বললেন, আমরা অনেক ভেবেছি। আমরা মুসলমান, শাহাদাত আমাদের কাম্য। এর চাইতে বড় কৃতিত্ব আর কি হতে পারে?

তারিক : যদি তাই হয়, আমরা কেউই যখন ফিরে যেতে চাই না, তাহলে এসব জাহাজের কি প্রয়োজন?

একজন মুজাহিদ : না, এসবের কোনো প্রয়োজন নেই।

তারিক : তাহলে এই নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আমরা কেন ধরে রাখবো?

অপর এক মুজাহিদ : জাহাজগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হোক।

তারিক : না, তা বোধ হয় ঠিক হবে না।

মুগীছ : আপনার অভিমত কী?

তারিক : আমি জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলতে চাই।

সকলেই (সমস্বরে) : পুড়িয়ে ফেলা হোক, সে-ই ভালো।

তারিক : তা হলে তাই করা হোক।

কয়েকজন মুজাহিদ এগিয়ে গেলেন। তারা নৌকাগুলো জাহাজে তুলে তারপর জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। সকল মুজাহিদ পাড়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করলেন।

কেউ ভাবতে পারেন, জাহাজগুলো পুড়িয়ে দিয়ে তারিক হয়তো ভুল করেছিলেন। কারণ এগুলো দিয়ে তারা আবার দেশে ফিরে যেতে পারতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। তিনি চেয়েছিলেন, এর দ্বারা মুজাহিদদের মনোবল সুদৃঢ় করতে। আর হয়েছিলও তাই। মুজাহিদরা দীপ্ত শপথ নিয়েছিলেন, হয়তো তাঁরা যুদ্ধে জয়ী হবেন, নতুবা শাহাদাতবরণ করবেন। এই দৃঢ়তাই পরবর্তী অভিযানগুলোতে তাঁদের বিজয় এনে দিয়েছিল। মুসলিম মুজাহিদরা স্পেন উপকূলে অবতরণ করেছিলেন ৯২ হিজরি সালের ৮ই রজব মোতাবেক ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ শে এপ্রিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজগুলো পুড়ে গিয়ে সমুদ্রের অথৈ পানিতে তলিয়ে গেল। এবার তারিক সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন আমাদের ফিরে যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। আমাদের পেছনে সমুদ্র আর সামনে শত্রু। এখন কেবল দুটি পথই খোলা; হয় বিজয় নাহয় মৃত্যু।

সবাই : আমরা সে দুটির যে কোনো একটির প্রত্যাশী।

তারিক : মানুষ যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করার ইচ্ছে করে, তখন আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেন। আমরাও আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

সকলেই সমস্বরে বললেন, নিশ্চয়ই।

তারিক : তাহলে চলুন, আল্লাহর নাম নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি।

সকলে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। সে ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র উপকূলে, আকাশে-বাতাসে তা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সে সময় থেকে সে পাহাড়টির নামকরণ করা হয় 'জাবালুত তারিক'।[৫] আজো স্থানটি সে নামেই পরিচিত। মুজাহিদরা সামনে এগিয়ে চললেন। গোটা পাহাড়জুড়ে সবুজের সমারোহ, নানা ফল-ফুল ও সবুজ ঘাসে সুশোভিত। তাঁরা ধীরে ধীরে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এলেন। অনেক দূর এসে হলুদ রঙের রেশমী পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। লোকটিকে খুবই চিন্তিত আর অস্থির মনে হচ্ছে। তারিক লোকটিকে দেখে মুগীছকে বললেন, লোকটিকে দেখে তো খ্রিষ্টান বলে মনে হচ্ছে না।

মুগীছ : আমারও তাই মনে হচ্ছে।

তারিক : তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন না, সে কে? কেনইবা এখানে ঘুরাঘুরি করছে?

মুগীছ একজন সিপাহিকে পাঠালেন লোকটিকে ডেকে আনতে। সিপাহি তাকে ডেকে নিয়ে এলো। লোকটি এসে তারিককে সালাম দিলো। তারিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একা একা এখানে কী করছ?

লোকটি : আমি আপনাদের তালাশ করছিলাম।

তারিক (বিস্মিত হয়ে) : আমাদের?

লোকটি : জী হ্যাঁ।

তারিক : তুমি কি আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়েছিলে?

লোকটি : আমাকে বলা হয়েছিল।

তারিক : কে বলেছিল?

লোকটি : আমি সবকিছুই আপনাকে বলব। আমি একজন মজলুম। খ্রিষ্টানরা আমাকে বহু অত্যাচার করেছে, আপনি আমার কাহিনি শুনবেন কি?

তারিক : নিশ্চয়ই শুনব। আমরা নিপীড়িতদের সাহায্য করি।

লোকটি : কেবল আপনারাই আমার ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারেন।

তারিক : তোমার কাহিনি আমাদের শোনাও।

লোকটি : ধন্যবাদ, আমি বলছি।

---

[৫] এ জায়গাটি স্পেনের দক্ষিণে ও মরক্কোর উত্তরে অবস্থিত। পশ্চিমা বিশ্বের চিরাচরিত প্রথা হলো মুসলমানদের স্মৃতিবাহী স্থানের নাম পরিবর্তন করে ইতিহাস চেপে রাখা। এ ক্ষেত্রেও তারা 'জাবালুত তারিক' নাম পাল্টে 'জিব্রাল্টার' রেখেছে। এটি দৈর্ঘ্যে ৫০ কিলোমিটার ও প্রস্থে ১৪ কিলোমিটার।

তারিক, মুগীছ ও সকল মুজাহিদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটিকে দেখতে লাগলেন।

লোকটি মধ্যবয়সী। পরনে সুন্দর বর্ণের দামী রেশমী পোশাক। গলায় হীরার মালা। সে খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলতে লাগল, 'আমি একজন দুর্ভাগা ইহুদি, নাম আমামন। আমি কর্ডোভার বাসিন্দা। আমার ছিল হীরার ব্যবসা। কয়েক যুগ ধরে আমি এখান বসবাস করছি। সারা দেশে আমার সুখ্যাতি রয়েছে। ঈশ্বর আমাকে অগাধ ধনসম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু এদেশের নিয়মনীতি অত্যন্ত অমানবিক। আইন কানুনের কোনো বালাই নেই। শাসক শ্রেণী সম্পদশালীদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।'

লোকটির কথায় ছেদ টেনে তারিক বললেন, বোধহয় তোমারও ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে।

আমামন : জী না, তা নিলে এত দুঃখিত হতাম না।

তারিক : তবে কি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে?

আমামন : জী না, এক যুগ আগে আমার স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে।

তারিক : তবে কি তোমার কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়েছে?

আমামন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জী হ্যাঁ। আমার মৃত স্ত্রীর একমাত্র স্মৃতি আমার নয়নের আলো, হৃদয়ের টুকরো একমাত্র কন্যাকে জালিমরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

একথা বলতে বলতে আমামনের হৃদয় আবেগের ঝড় ওঠে। চোখ হয়ে যায় অশ্রুসিক্ত। মুখমণ্ডল লাল হয়ে যায়। তারিক, মুগীছসহ অন্য সকল মুজাহিদও তার ব্যথায় ব্যথিত হলেন। তারিক তাকে বললেন, দুঃখ করো না। আল্লাহ চাহেন তো আমরা তোমার কন্যকে উদ্ধারের চেষ্টা করব।

আমামন : আপনার কাছে আমার এটাই প্রত্যাশা।

তারিক : তোমার কন্যাকে কে নিয়েছে?

আমামন : সম্রাট রডারিক অত্যন্ত লম্পট। সে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে রানির সান্নিধ্যে রাজপ্রাসাদে আগত মেয়েদের সতীত্ব হরণ করে। তার ক্ষমতা লাভের পর থেকে জনগণের জানমাল ও মান ইজ্জতের নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। সে জোরপূর্বক কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিন্ডার সতীত্বও হরণ করেছে।

তারিক : হুম, আমরা তা জানি।

আমামন : সে সারাদেশে কিছু পুরুষ ও মহিলা ছড়িয়ে দিয়েছে। যাদের কাজই হলো সুন্দরী নারী ও বালিকাদের ফুসলিয়ে, লোভ দেখিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে নিয়ে আসা।

তারিক : রডারিকের বয়স কত?

আমামন : জনাব, সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। এ বয়সেও তার লাম্পট্যের নেশা কাটেনি।

তারিক : লোকেরা তাকে বুঝানোর চেষ্টা করে না কেন?

আমামন : কে বুঝাবে, হুজুর। সকলেই তো রিপুর দাসে পরিণত হয়ে ভোগ বিলাসময় জীবনের অপবিত্র গর্তে ডুবে আছে।

তারিক : তাহলে তো দেখছি সবার অবস্থায়ই দুঃখজনক।

আমামন : জনাব, আমরা ইহুদিদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। আমাদের ধনসম্পদ লুট করা হচ্ছে এবং আমাদের কন্যাদের ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে।

তারিক : তারা তো দেখছি ধ্বংসের খেলায় মেতেছে।

আমামন : হুজুর, ঈশ্বর কি তাদের পতন ঘটাবেন না?

তারিক : নিশ্চয়ই! আল্লাহর বিচার খুবই কঠিন, তিনি সকল অত্যাচারীদের পতন ঘটান।

আমামন : আমরা ইহুদিদের বিশ্বাসও তাই।

তারিক : তোমার কন্যাকে কে নিয়েছে, তা তো বললে না?

আমামন : রডারিকের এক অনুচর, তার নাম আমার জানা নেই।

তারিক : তোমার কন্যাকে কি প্রলুব্ধ করে নেয়া হয়েছে?

আমামন : জী না হুজুর, আমার সামনেই তারা আমার কন্যাকে জোর করে নিয়ে গেছে। যখন নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কন্যা আমার করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার নিষ্পাপ দৃষ্টি বলছিল, আমি যেন তাকে সাহায্য করি এবং এই জানোয়ারদের হাত থেকে তাকে মুক্ত করি।

এ কথা বলতে বলতে আমামনের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। তার চোখে অশ্রু দেখা দিল। তারিক সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ করো না। মানুষ যখন অত্যন্ত ব্যথিত হয়, তখন তার আর কোনো কিছু করার শক্তি থাকে না। তুমি ধৈর্যধারণ করো, এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

আমামন : নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেব। আমি সে মুহূর্তেরই অপেক্ষায় রয়েছি।

তারিক : তোমার কন্যার বেদনাবিধুর কাহিনি শুনতে চেয়ে আমি তোমাকে আরো ব্যথিত করে তুললাম, এজন্য আমি দুঃখিত।

আমামন : কাহিনি বর্ণনায় আমি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেও এর দ্বারা হৃদয়ের ব্যথা অনেকটা লাঘব হলো। আমি নিজেই আমার দুঃখের কাহিনি বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম, যাতে আপনি আমাদের সঠিক অবস্থা বুঝতে পারেন।

তারিক : তোমার কাহিনি শুনে আমার শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

আমামন : যার মধ্যে মনুষ্যত্ব রয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। জানোয়ারেরা যখন তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ছাড়ানোর জন্য আমি এগিয়ে যাই। তাদের দুজন নরঘাতক আমার মাথায় সজোরে আঘাত করে। আমি একটি শক্ত পাথরের ওপর পড়ে যাই এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।

তারিক (দাঁতে দাঁত কটমটিয়ে) : এ তো দেখছি হৃদয়হীন মানুষ।

আমামন : তারা নির্দয় নরপিশাচ, মনুষ্যত্বের কলঙ্ক।

তারিক : আল্লাহ নিশ্চয়ই এর প্রতিফল দেখাবেন।

আমামন : হাজার হাজার নিপীড়িত মানুষ হাত তুলে তাদের অভিশাপ দিচ্ছে।

তারিক : তারপর, সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর তুমি কি করলে?

আমামন : দেখলাম, ওরা আমার কন্যাকে নিয়ে চলে গেছে। আমার সব ধন-সম্পদও লুট হয়ে গেছে। সম্পদের প্রতি আমার কোনো প্রকার আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু কন্যার অনুপস্থিতি আমাকে পাগল করে তুললো। আমি এক কামরা থেকে অপর কামরায় দৌড়াদৌড়ি করতে থাকি। বেশ কিছুক্ষণ আমার এ অবস্থা থাকে। রাতের আমানিশা নেমে আসে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেলাম। ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ি। কখন যেন তন্দ্রায় চোখ বুজে আসে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমন্ত অবস্থায়ই আমি সাদা পোশাক পরিহিত একজন বুজুর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কোনো চিন্তা করো না। তোমার কন্যা নিরাপদেই আছে। তাকে উদ্ধারকারী দলও ইতিমধ্যে এসে গেছে। তুমি সবুজ দ্বীপে যাও। সেখানে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করো।' আমি শুধালাম, তাঁদের আমি কিভাবে চিনতে পারবো? জবাব দিলেন, 'সাদা পোশাক দেখেই তাদের চিনতে পারবে। তাঁদের মাথায় বাঁধা লম্বা পাগড়ি। জাতিতে তাঁরা মুসলমান।' এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ি। তখন ভোর হয়ে আসছিল। আমি আমার ঘর বন্ধ করে আপনাদের তালাশে বেরিয়ে পড়ি। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, আপনাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে।

আমামনের বর্ণনা শুনে মুসলমানরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। তারিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কবের ঘটনা?

আমামন : তা প্রায় এক মাস আগের ঘটনা।

তারিক : তোমার কন্যার নাম কি?

আমামন : তার নাম বিলকিস।

তারিক : ইহুদিদের মধ্যে তো সাধারণত এরূপ নাম রাখা হয় না।

আমামন : নবী সুলায়মানের এক কন্যার নাম ছিল বিলকিস। তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন। আমার কন্যাও পরমা সুন্দরী। তাই তার নামে নাম রেখেছি।

তারিক : বিলকিসকে কোথায় নেয়া হয়েছে, তা কি তোমার জানা আছে?

আমামন : লুণ্ঠনকারী সে দলের একজন আরোহীর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে জানিয়েছে, বিলকিস থিওডমিরেরর দলের হেফাজতে রয়েছে।

তারিক : থিওডমিরের সৈন্য দলের অবস্থান এখান থেকে কতদূর?

আমামন : খুব বেশি দুরে নয়। এখান থেকে ৪/৫ মাইল হতে পারে।

তারিক : তাহলে এর মধ্যে আমরা আর বসছি না। ভোর হলেই আমরা থিওডমিরের ওপর হামলা চালাবো।

আমামন : তাই হোক হুজুর! সে নরপিশাচদের প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত আমিও শান্তি পাচ্ছি না।

মুগীছসহ অন্যান্য মুজাহিদরা পরামর্শ দিলেন, আজ এখানেই রাত যাপন করা হোক। সে মতানুযায়ী সেখানেই অবস্থান করা হলো। মুজাহিদদের কাছে কোনো তাঁবু ছিল না। এজন্য খোলা আকাশের নিচেই তাঁরা অবস্থান গ্রহণ করেন।

রাতে মুজাহিদরা মিলে খাবার তৈরি করলেন। আমামনকেও খেতে দেয়া হলো। তারপর এশার নামায পড়ে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে অযু সেরে সকলেই ফজরের নামাযে শরীক হলেন। মুসলমানরা নামায পড়ছিলেন। আমামন এক দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুসলমানদের ইবাদত পদ্ধতি তার মনে গভীর প্রভাব ফেলছিল।

একরাত মুসলমানদের সাথে কাটিয়েই আমামনের মনে গভীর ভাবোদয় হলো। সে বুঝতে পারল যে, মুসলমানদের আচার আচরণ সকল প্রকার কৃত্রিমতার উর্ধ্বে। তাঁদের সকল প্রয়াস কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। আমামন এমনটি আর কখনো দেখেনি।

নামায শেষ করেই মুজাহিদরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জিনিসপত্র কোমরে বেঁধে নিলেন এবং সারিবদ্ধভাবে সামনে এগুতে লাগলেন।

তারিক যদিও এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য একজন গোলাম নির্ধারিত ছিল, তথাপি তিনি নিজেই নিজের জিনিসপত্র কোমরে বেঁধে নিলেন। মুসলমানদের এইরূপ সহমর্মিতা দেখে আমামন অভিভূত হয়ে পড়ে।

মুজাহিদরা জানতে পেরেছিল, সবুজ দ্বীপের শেষ প্রান্তে থিওডমিরের অবস্থান। অতএব সেখানেই শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা হবে। তাঁরা এজন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে সামনে এগুচ্ছিলেন।

বেলা বাড়ার আগেই মুজাহিদরা সবুজ দ্বীপের বাইরে চলে এলেন। কিছুদূর এগিয়ে খ্রিষ্টানদের তাঁবু দেখতে পেলেন। তারা তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আরো নিকটে গিয়ে মুজাহিদরা জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। হঠাৎ আওয়াজ শুনে খ্রিষ্টানরা হতভম্ব হয়ে গেল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে বিস্মিত হয়ে তারা মুসলমানদের দেখতে লাগল।

এটা ছিল থিওডমিরের সৈন্যদল। যতদূর চোখ যায় শুধু তাঁবুর সারি। কোনো কোনো তাঁবুর সামনে পর্দা ঝুলছিল। তাঁবুর পেছন দিকে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। খ্রিষ্টানরা বিস্মিত চোখে মুসলমানের দিকে তাকিয়ে ছিল। থিওডমির বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও চতুর, বিচক্ষণ এবং সাহসী ছিল। থিওডমির সৈন্যদলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিল। স্পেনের খ্রিষ্টানরা ইতোপূর্বে কখনো মুসলমানদের দেখেনি। তারা হতবাক হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, এরা কারা? কোত্থেকে এসেছে? থিওডমির সবাইকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলো। নির্দেশ পেয়েই তারা শিবিরে চলে গেল এবং দ্রুত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের ময়দানে এসে জমায়েত হতে লাগলো।

তারিক মুজাহিদদের সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম মুজাহিদরা ছিলেন পদাতিক। তাঁদের কারো অশ্ব ছিল না, এমনকি তাঁদের সবার নিকট প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। কারো ছিল তলোয়ার, কারো বর্শা, আবার কারো ছিল তীর ধনুক। অনেকে কেবলমাত্র লাঠিকেই অস্ত্ররূপে নিয়ে এসেছিল, আর বর্মের তো প্রশ্নই আসে না।

তারিক সামনের সারিতে বর্শা ও তলোয়ারধারী চারজন করে মুজাহিদকে দাঁড় করালেন এবং একজন ধনুকধারীকে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সারিতে তলোয়ার ও বর্শাধারীদের দাঁড় করান। পঞ্চম সারিতে তীরন্দাজ এবং সবশেষে লাঠিয়ালদের সারিবদ্ধ করেন।

তারিক মুসলমানদের সারিবদ্ধ করার সময় থিওডমিরও তার সৈন্যদলকে বিন্যস্ত করছিল। খ্রিষ্টান সৈন্যরা সকলেই লৌহবর্ম পরিহিত ও সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। তা ছাড়া তারা সবাই ছিল অশ্বারোহী। তাদের প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছিল, তারা মুসলমানদেরকে এক নিমিষেই ধুলিস্মাৎ করে দেবে।

থিওডমির সারি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে উচ্চস্বরে বললো,

-হে লোকেরা, বলতে পারো, তোমরা কে, কোত্থেকে এসেছ?

থিওডমি র তাদের ভাষায় কথা বলায় মুসলমানরা তাদের কথা বুঝতে পারলো না। তারিক আমামনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

-ইনি কে, তাকে কি আপনি চিনেন?

আমামন : হ্যাঁ, তার নামই থিওডমির, খ্রিষ্টান সৈন্যদলের সেনাপতি।

তারিক : তাকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি বলতে চাচ্ছেন।

আমামন সারির পেছন থেকে এগিয়ে গেলেন। তাকে দেখামাত্রই থিওডমির ক্ষেপে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, রে দুষ্ট ইহুদি, তবে কি তুমিই তাদের ডেকে এনেছ? তোমার সমস্ত জাতির ওপর এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেব। আমার সন্দেহ, তোমরা ইহুদিরা তাদের সাথে হাত মিলিয়েছ।

আমামন অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, আমরা ডেকে আনিনি। তোমার জাতিই তাদের ডেকে এনেছে।

থিওডমির রাগে কটমট করতে করতে জিজ্ঞেস করল, কে সেই বিশ্বাসঘাতক?

আমামন : সিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান। তার কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে-ই তাদের নিয়ে এসেছে।

আমামনের কথা শুনে থিওডমির কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে কী যেন ভাবতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বললো, তুমি আমার সাথে প্রতারণা করছ। সৈন্যদলের সাথে আছো তুমি; অথচ বলছ জুলিয়ানের কথা। আসলে তুমিই তাদের ডেকে এনেছ। এতদিন তোমরা ইহুদিরা এদেশে সুখেই বসবাস করছিলে। তোমরা হয়েছিলে অগাধ ধনসম্পদের অধিকারী। কিন্তু এখন থেকে কোনো ইহুদিকে আর স্পেনে জীবিত থাকতে দেয়া হবে না। তোমাদের সমূলে উৎখাত করা হবে।

আমামন কিছুটা রাগত কণ্ঠে বললেন, ওরে শয়তান! সুযোগ পেলে তো তা নিশ্চয়ই করবে। আমরাও এ জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তবে জেনে রেখ, ঈশ্বর মজলুমদের সাথেই থাকেন। তিনিই মজলুমদের সাহায্যার্থে এসব ধর্মপ্রাণ লোকদের পাঠিয়েছেন।

থিওডমির কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আমামনের দিকে তাকিয়ে বলল, এখনই তুমি তোমার সাহায্যকারীদের করুণ পরিণতি দেখতে পাবে।

আমামন কিছুটা চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কন্যাকে তোমরা কোথায় রেখেছ? থিওডমির বলল, সে আমার বিশেষ তাঁবুতে অবস্থান করছে। এখন পর্যন্ত আমরা তার কোনোরকম অসম্মান করিনি; বরং তাকে আরামেই রেখেছিলাম। এবার অবশ্য তাকে চরমভাবে অসম্মান করা হবে।

আমামন : হ্যাঁ, তুমি জীবিত থাকলে তো করবে।

থিওডমির তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেল। আমামনের কথার কোনো উত্তর দিলো না। তারিক তাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি জানার জন্য আরো আগ্রহী হয়ে উঠলেন। আমামন ফিরে এলে তারিক তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছে?

আমামন সমস্ত বিষয় তারিককে অবহিত করেন। তারিক বললেন, থিওডমির তার সৈন্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য গর্ববোধ করছে। কিন্তু সে জানে না, মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্ আছেন। তিনি অহংকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ চাহেন তো সে তার নিজের পরিণতি নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

আমামন : সবচেয়ে আনন্দের কথা, বিলকিস থিওডমিরের সাথেই আছে। সম্ভবত ঈশ্বর তাকে মুক্তি দেবেন।

তারিক : আল্লাহর কাছে দুআ করো। তিনিই সকল শক্তির উৎস।

এমন সময় খ্রিষ্টান সৈন্যদের মধ্যে রণবাদ্য বেজে উঠল। তারিক বুঝে ফেললেন, খ্রিষ্টান সৈন্যরা এখনই হামলা চালাবে। তিনি মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বললেন, হে মুসলিমগণ! শত্রুরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রয়াসী। আমাদের জন্য স্পেনে এটাই প্রথম আক্রমণ। তোমরা যদি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে এ আক্রমণে সফলতা লাভ করতে পার, তবে গোটা স্পেনেই তোমাদের জয়জয়কার পড়ে যাবে। ভেবে দেখো, তোমাদের সামনে উপস্থিত বিরাট সৈন্যদল, পশ্চাতে আছে সমুদ্র। পালিয়ে জীবন রক্ষা করার কোনো উপায় নেই। যুদ্ধ করো। জীবনপণ যুদ্ধ করো। নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যুদ্ধ করো। শত্রু বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলো। তাদের মৃতদেহ দ্বারা সমগ্র রণাঙ্গন একাকার করে ফেলো।

সেনাপতির এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ শোনার পর মুসলিম বাহিনীর মধ্যে প্রবল উদ্যম ও প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। তাঁরা মরা ও মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

অপরদিকে খ্রিষ্টান সৈন্যদল অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে মুসলমানদের দিকে এগিয়ে আসছিল। তাদের ধারণা ছিল, তারা ঘোড়ার খুরের মাধ্যমে মুসলমানদের দলিত মথিত করে ফেলবে। খ্রিষ্টান বাহিনীর এগিয়ে আসার ধরন দেখে মুসলমানরাও তাই মনে করছিল। কিন্তু তাতে মুসলমানদের মধ্যে এতটুকু ভয়ের সঞ্চার হয়নি। তারা অত্যন্ত নির্ভীকচিত্তে দাঁড়িয়ে খ্রিষ্টানদের এগিয়ে আসা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা বেশ নিকটে এসে পড়ে। তারিক থেমে থেমে তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিলেন। তৃতীয়বারের পর মুসলমানরা সমবেত কণ্ঠে সজোরে আল্লাহু আকবর উচ্চারণ করেন। এই তাকবীরের ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে পুরো রণাঙ্গন কেঁপে উঠে। খ্রিষ্টানরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু না থেমে, সামনে এগুতে থাকে। মুসলমানদের কাছে পৌঁছে আক্রমণ করে বসে। তারা নিজেদের সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মুসলমানরাও সিসাঢালা প্রাচীরের মতো এক জায়গায় অবিচল থেকে খ্রিষ্টান বাহিনীর মোকাবিলা করে।

খ্রিষ্টানরা তরবারি দ্বারা আক্রমণ করছিল। তাদের শ্বেতশুভ্র তরবারিগুলো প্রখর রোদের আলোয় ঝলমল করছিল। মুসলমানরা বর্শার সাহায্যে প্রতি আক্রমণ করে। তাদের বর্শার অগ্রভাগও চিকচিক করছিলো। উভয় পক্ষ ক্রুদ্ধ ও তেজোদ্দীপ্ত হয়ে পরস্পরের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছিলো।

রণাঙ্গনে খ্রিষ্টান বাহিনী শোরগোল শুরু করে। তাদের হাঙ্গামায় সারা যুদ্ধক্ষেত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা নীরবে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা ক্রোধ ও উদ্যমের সাথে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। প্রতিটি মুসলমান অগ্নিশর্মা হয়ে সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে বর্শা নিক্ষেপ করছিলেন। তাঁদের বেশিরভাগ বর্শার লক্ষ্য ছিল শত্রুপক্ষের ঘোড়াগুলো। বর্শার আঘাতবিদ্ধ প্রতিটি ঘোড়া লাফিয়ে উঠতো এবং পিঠের আরোহীকে মাটিতে ফেলে দিত। যে সৈন্য একবার মাটিতে পড়ে যেতো তার আর ওঠার সৌভাগ্য হতো না। প্রথমে ঘোড়ার খুরের নিচে পড়ে সে পিষে যেতো। গুরুতর আহত অবস্থায় দু-একজন দাঁড়াতে সক্ষম হলেও মুজাহিদদের বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে যেতো। মুসলিম বাহিনী খ্রিষ্টানদের প্রথম সারি প্রায় শেষ করে ফেলে। তারা দ্বিতীয় সারি লণ্ডভণ্ড করার জোর প্রচেষ্টা চালায়। খ্রিষ্টানরাও মুজাহিদদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণে চালায়। তারাও ক্রুদ্ধ হয়ে হামলা করছিল। কিন্তু তাদের আক্রমণ কার্যকর হচ্ছিল না। আঘাত হানতে গিয়ে নিজেরাই নিহত হচ্ছিল। মুসলমানরা তাদের হত্যা করছিল। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে উভয়পক্ষ এলোমেলো হয়ে পড়ে। মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের ভিতর এবং খ্রিষ্টানরা মুসলিমবাহিনীতে ঢুকে পড়ে। যেখানে যে ঢুকেছে সে সেখানেই যুদ্ধ করতে থাকে। এ সময় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুসলমানরা নতুন নতুন উদ্যম নিয়ে হামলা শুরু করে। তাঁদের রক্তমাখা তরবারি বহু দূর পর্যন্ত সঞ্চালিত হতে থাকে।

রণাঙ্গনে রক্তের স্রোত বয়ে চলে। মানুষের দেহ, হাত, পা, মাথা কেটে মাটিতে পড়তে থাকে। আহতদের আর্ত চিৎকার, ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি ও খ্রিষ্টান সৈন্যদের হইচই আর হাঙ্গামায় সারা রণাঙ্গন জুড়ে তোলপাড়। কানের কাছে কথা বললেও শোনা যায় না এমন দশা। যুদ্ধের দাবানল প্রচণ্ডভাবে প্রজ্বলিত। আর মানুষ এই অনলে জ্বলেপুড়ে মরছিল। খ্রিষ্টানরা মুসলিম বীরদের শেষ করে দিতে চাচ্ছিল। এই সংকল্পে নিয়ে সবাই শিবির ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সবাই এক সাথে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের শিবির একেবারে জনশূন্য হয়ে যায়।

আমামন এরূপ একটি সুযোগের সন্ধানে ছিল। সে খ্রিষ্টানদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাদের শিবিরের দিকে এগিয়ে যায়। তার উদ্দেশ্যে, কন্যা বিলকিসকে খ্রিষ্টান শিবির থেকে বের করে আনা। রণাঙ্গনের শেষ প্রান্তে একজন মুসলিম মুজাহিদের

সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি দাঁড়িয়ে কাপড় নিংড়াচ্ছিলেন। তাঁর নাম ইসমাঈল। তিনি অনেক খ্রিষ্টান সৈন্য হত্যা করেছিলেন। তাঁর কাপড় রক্তে ভিজে গিয়েছিল।

ইসমাঈল ছিলেন একজন যুবক ও সিংহহৃদয় বীরসৈনিক। আমামন তাঁর কাছে গিয়ে বললো, বীর যুবক! তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?

ইসমাঈল বললেন, অবশ্যই। তবে এখন যুদ্ধ চলছে তো! একটু দাঁড়াও আমি অমানুষগুলোকে শেষ করে নিই।

আমামন : কিন্তু আমাকে সাহায্য করার যে এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

ইসমাঈল : কী সাহায্য চাও তুমি?

আমামন : আমার কন্যা থিওডমিরের শিবিরে আছে। তাকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি তাকে মুক্ত করতে চাই।

ইসমাঈল : এখন একটু ধৈর্যধারণ করো। যুদ্ধ করতে দাও।

আমামন অত্যন্ত মিনতি স্বরে বললো, এটাই সুবর্ণ সময়। ঈশ্বরের দোহাই! আমাকে সাহায্য করো। অবশ্য তোমার সন্তান নেই। তাই পিতৃস্নেহ কী সেটা তুমি বুঝবে না।

এ কথা শুনে আমামনের প্রতি ইসমাঈলের দয়া হলো। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে চলো।' তাঁরা উভয়ে দ্রুতপদে খ্রিষ্টান শিবিরে গিয়ে পৌঁছলেন। সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শিবিরটিতে তাঁরা ঢুকে পড়লেন। তাঁরা দেখলেন, বিলকিস রেশমের মজবুত রশি দ্বারা বাঁধা অবস্থায় শিবিরের এক কোণে পড়ে আছে। দেখেই আমামন সে দিকে দৌড়ে গেল। বলে উঠল, হায় আমার নয়নের পুতুল! তোমার এ কি অবস্থা! বিলকিস উঠার চেষ্টা করলো কিন্তু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকায় পারলো না।

আমামন বিলকিসের কাছে গিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়লো। পিতৃস্নেহে আত্মহারা হয়ে তাকে চুমু খেতে লাগলো। বিলকিস সত্যি সুন্দরী ছিল। অপরূপা সুন্দরী। তার চেহারা থেকে সৌন্দর্যের শিখা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ডাগর ডাগর চোখ। লাবণ্যময় গোলগাল চেহারা। গণ্ডদেশ ছিল গোলাপের পাপড়ির মতো লাল ও সাদা। সে ছিল সৌন্দর্যের এক বিরল প্রতিচ্ছবি। ইসমাঈল তাকে দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েন। বিলকিস বললো, আমার বাঁধন খুলে দাও। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমামনের কাছে বাঁধন কাটার মতো কোনো হাতিয়ার না থাকায় সে ইসমাঈলের দিকে তাকালো। এদিকে ইসমাঈল পরীতুল্য বিলকিসের রূপ-লাবণ্যে বিভোর হয়ে পড়ছিলেন। আমামন তাঁকে ডেকে বলল, হে দয়ালু যুবক! আমার মেয়েটার বাঁধনগুলো কেটে দাও দেখি।

আমামনের কথায় ইসমাঈল চমকে উঠলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন। তরবারি দিয়ে বাঁধনগুলো কেটে দিলেন। বিলকিস এ পর্যন্ত ইসমাঈলকে দেখেনি। তাঁর ওপর চোখ পড়তেই কিছুটা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগল। সবগুলো বাঁধন খুলে যাওয়ার পর বিলকিস উঠে দাঁড়ালো। সে আকর্ষণীয় দৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

বিলকিসের এই মনোহরভঙ্গিও ইসমাঈলের অন্তরে রেখাপাত করলো। তিনি এতই বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে বিলকিসের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জবাব পর্যন্ত দিতে পারলেন না।

আমামন বলল, এখানে বিলম্ব করা বিপদ হতে পারে। চলুন, আমরা এখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ি। বিলকিসও বলল, চলুন আব্বাজান!

তাঁরা শিবিরের বাইরে পা রাখতেই থিওডমিরসহ ৫০-৬০ জন খ্রিষ্টান সৈন্যের সাথে দেখা হয়ে গেল। থিওডমির তাদের দেখেই বলল, 'ও, তোমরা সুন্দরীকে নিয়ে যেতে চাচ্ছো!'

তারা এতগুলো খ্রিষ্টান দেখে থমকে গেলেন। নির্বাক হয়ে তাদের দেখতে লাগলেন।

সাত. পর্যায়

আমামন ও ইসমাঈল যখন খ্রিষ্টানদের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল। চারিদিকে তলোয়ারের দ্রুত উঠানামার দৃশ্য। রণাঙ্গনজুড়ে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফুটবলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল। উভয় পক্ষই তাদের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল। সমস্ত ময়দানে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছিল। খ্রিষ্টানদের ধারণা ছিল তারা সহজেই মুসলমানদের পরাস্ত করবে অথবা পিছু হটতে বাধ্য করবে। কারণ তারা ইতোপূর্বে আর কখনো মুসলমানদের মোকাবিলা করেনি। তাই মুসলমানদের শক্তি ও সাহস সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। খ্রিষ্টানরা লক্ষ্য করল, শত বাধা সত্ত্বেও মুসলমানরা পিছপা হচ্ছে না; বরং তারা নিজেরাই ক্রমাগত নিহত হচ্ছে, তখন তারা হতভম্ব হয়ে পড়ল। তারা দেখতে পেলো, তারা যতই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা মুসলমানদের ওপর হামলা করছে, ততই তারা মুসলমানদের হাতে মার খাচ্ছে।

মুসলমানরা এক আদম্য উৎসাহ নিয়ে যুদ্ধ করছিল। তাঁরা খ্রিষ্টানদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এমন ক্ষিপ্রগতিতে পাল্টা আক্রমণ চালাতো যে, আক্রমণকারীকে হত্যা না করা পর্যন্ত ফিরে আসতো না। এই বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রকে তলোয়ারের কৌশল প্রদর্শনের এক রঙ্গমঞ্চ মনে হচ্ছিল। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে, কিন্তু কোনো পক্ষেরই উৎসাহে সামান্য ভাটা পড়েনি। মুসলমানরা চাচ্ছিলেন, দুপুরের মধ্যেই যুদ্ধের শেষ ফায়সালা করে ফেলবেন। কিন্তু খ্রিষ্টানরাও এমন নাছোড় বান্দা ছিল যে, ক্রমাগত মৃত্যুবরণেও তারা পিছপা হলো না; বরং মরণপণ যুদ্ধ করছিল। মুগীছ আর-রূমী ছিলেন ডান দিকের দলের অধিনায়ক। তিনি এত উদ্যম ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন যে, শত্রুপক্ষের যেই তার তলোয়ারের নাগালে আসতো তাঁর রক্তপিয়াসী তলোয়ার তারই প্রাণসংহার করে ছাড়তো। তাঁর এক হাতে ছিল ঢাল অপর হাতে তলোয়ার। ঢাল দ্বারা শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার সঙ্গে সঙ্গেই তলোয়ার দ্বারা এমন পাল্টা আঘাত হানতেন যে, শত্রুরা কোনোভাবেই তা প্রতিরোধ করতে পারতো না। খ্রিষ্টানরা তাঁর সম্পর্কে এত ভীত হয়ে পড়েছিল যে, কেউই তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস করছিল না; বরং পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। তারিক মুসলিম বাহিনীর মধ্যস্থলে থেকে ক্ষুধার্ত সিংহের মতো শত্রুদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। তিনি যেদিকেই অগ্রসর হতেন, একাধিক সৈন্য হত্যা করে ফিরে আসতেন।

তখনও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যথেষ্ট মনোবল ছিল। থিওডমিরও তাদের সঙ্গে থেকে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে চলছিল। প্রকৃতপক্ষে থিওডমিরের উপস্থিতিই তাদের উৎসাহিত করছিল। অপরপক্ষে মুজাহিদরা ছিলেন সম্পূর্ণ বেপরোয়া। সেনাপতি তারিকও এত গভীরভাবে যুদ্ধে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি যেন নিজের অস্তিত্বের কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে আরো সৈন্য রয়েছে এ সম্পর্কে তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না। তাই দেখা যাচ্ছিল, তিনি একাই কোনো শত্রু সৈন্যের সারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং বিশজন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেছেন ও দশটি ঘোড়াকে আহত করেছেন। খ্রিষ্টানরা তাঁর সাহসিকতা দেখে অবাক হয়ে পড়েছিল। তারা জানতো না, মুসলমানরা কেমন জাতি এবং তাদের শক্তি ও দৃঢ়তা কতটুকু। তারিক যার ওপর তলোয়ারের আঘাত হানতেন তার ঢাল দ্বি-খণ্ডিত হয়ে তলোয়ার মস্তক ভেদ করে গলদেশে দিয়ে পৌঁছতো।

একবার তিনি অপর একটি খ্রিষ্টান দলের ওপর আক্রমণ চালালেন। সে দলের সৈন্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ-ষাটের মতো। প্রথম আক্রমণেই তিনি দুজন খ্রিষ্টানকে হত্যা করেন, দ্বিতীয় আক্রমণে আরো একজন নিহত হয়। একজন মুসলমান একাকী এভাবে খ্রিষ্টানদের কচুকাটা করছে দেখে খ্রিষ্টানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা তারিককে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বৃষ্টির মতো তলোয়ারের আঘাত হানতে থাকে; কিন্তু তাতে তারিক একটুও ঘাবড়ে গেলেন না। তিনি লৌহ প্রাচীরের মতো সুদৃঢ় থেকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন।

তারিক যার উপরই আঘাত হানতেন, তারই করুণ পরিণতি ঘটতো। এভাবে অল্প সময়ে দশ/পনের জন খ্রিষ্টান নিহত হলো। তা দেখে খ্রিষ্টানরা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল এবং কোনোমতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলো। কিন্তু তারিকের তলোয়ার তখন এতই উদ্যত হয়ে পড়েছিল যে, খ্রিষ্টানরা কোনো মতেই তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছিলো না। অবস্থা এই দাঁড়ালো, তারিককে ঘিরে থাকা অর্ধেক খ্রিষ্টান নিহত হলো, বাকীরা কোনো মতে পালিয়ে বাঁচল। তারিক এই যুদ্ধে এত পরিশ্রম করেছিলেন যে, তিনি রক্তে আর ঘামে মাখামখি হয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর মুখমণ্ডল থেকে এমনভাবে ঘাম বেরুচ্ছিল যে, দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন অযু করে এসেছেন, কিন্তু মুখ মুছেননি। এতক্ষণে তিনি দাঁড়িয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন, সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকটা হেলে পড়েছে। জোহরের সময় প্রায় শেষ দিকে; কিন্তু মুসলমানরা খ্রিষ্টান সৈন্যদলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় তাদের পক্ষে নামায আদায় করা অসম্ভব হচ্ছে না।

তারিক অনুতাপ করে বললেন, হায়! আজকে হয়তো মাগরিবের নামাযও আমাদের কাযা হয়ে যাবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আয় আল্লাহ! জিহাদের ব্যস্ততার জন্য তোমার বান্দারা আজ জোহরের নামায সময়মত আদায় করতে পারছে না। তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও।

কয়েক মুহূর্ত স্বস্তির পর তিনি আবার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নেন। তিনি মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বললেন, হে মুসলিম মুজাহিদগণ! কেন যুদ্ধ এত দীর্ঘতর হচ্ছে! আমরা কেন এখনো খ্রিষ্টানদের পরাস্ত করতে পারছি না! এ কিসের ভীরুতা? কথা শেষ করেই তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা নব উদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। খ্রিষ্টানরা তখন পর্যন্ত একই গতিতে যুদ্ধ করছিল, কিন্তু মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনিতে তাদের উদ্যম অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

মুসলমানরা এবার এত তীব্র আক্রমণ করে চলছিলেন যে, খ্রিষ্টানরা সামনে আগাতেই পারছিল না। একের পর এক শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে তাঁরা সামনে এগুচ্ছিলেন। তারিক লক্ষ্য করছিলেন, থিওডমির দূর থেকে তার সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করছে। এবার তিনি থিওডমিরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। যাতে থিওডমির বাধ্য হয়ে তাঁর মোকাবিলায় এগিয়ে আসে।

থিওডমির তৎক্ষণাৎ আক্রমণ চালায়; কিন্তু তারিক তার আক্রমণ প্রতিহত করে এমন জোরে পাল্টা হামলা করেন, তা প্রতিরোধ করতে গিয়ে থিওডমিরের ঢালটি দুই টুকরা হয়ে যায়। থিওডমির ঘাবড়ে গিয়ে তারিকের মাথা লক্ষ্য করে ঢালটি ছুড়ে মারে। তারিক তা প্রতিহত করে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন।

থিওডমির বুঝতে পারে, আরেকটু বিলম্ব করলেই সে নিশ্চিত মারা পড়বে। তাই সে তড়িৎ গতিতে ঘোড়ায় চড়ে উল্টো দিকে পালিয়ে গেল। তারিক কিছুদূর পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করলেন। কিন্তু তিনি পদাতিক হওয়ায় থিওডমিরকে অনুসরণ করতে পারলেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে ফিরে এসে যুদ্ধরত অন্য খ্রিষ্টানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। খ্রিষ্টান সৈন্যরা সেনাপতি থিওডমিরকে পালিয়ে যেতে দেখে তারাও হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করে। মুজাহিদরা তাদের পিছে ধাওয়া করেন এবং যাকে যেখানে পেলেন, সেখানেই হত্যা করলেন। খ্রিষ্টানদের দূরে চলে যেতে দেখে তারিক মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বললেন, মুসলিম ভাইয়েরা! দ্রুত ফিরে এসো। আমাদের জোহরের নামায পড়া হয়নি। এখনো সময় আছে, চলো আমরা নামায সেরে নেই। তাঁর আহ্বান শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা সবাই ফিরে এসে এক জায়গায় জড়ো হলেন। তারপর অযু করে জোহরের নামায আদায় করলেন।

আট. বন্দীকরণ

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থিওডমির নিজের ক্যাম্পে গিয়ে পৌছল। আমামন ও ইসমাঈল বিলকিসকে নিয়ে থিওডমিরের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তাদের দেখে থিওডমির বিস্মিত হয়ে যায়। আমামনকে লক্ষ্য করে সে বললো, তবে কি তোমরা বিলকিসকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ!

আমামন, ইসমাঈল ও বিলকিস ঠিক এ মুহূর্তে থিওডমিরকে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে কিছুটা থমকে গেলেন। তারা একদৃষ্টিতে থিওডমিরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারা নির্বাক নিশ্চুপ। থিওডমির আবার বলে, তাহলে আমামন! তুমি তোমার কন্যাকে নিয়ে যেতে যাও?

আমামন : হ্যাঁ, আমার আদরের ধন নয়নের মণি কন্যাকে আমার কাছে নিয়ে যেতে চাই।

থিওডমির : তুমি কি জানো না, তাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

আমামন : সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ কতটুকু, তা কি তুমি জানো না?

থিওডমির : সন্তানের প্রতি যদি তোমার স্নেহ থেকে থাকে, তবে তোমারও তার মঙ্গলের কথা ভেবে তাকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে দাও। তাহলে তোমার কন্যা সম্রাটের কৃপা দৃষ্টি লাভ করবে। তাতে তারও মঙ্গল হবে। তুমিও বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবে।

আমামন : না, আমার কাছে থাকাতেই তার ও আমার প্রশান্তি।

থিওডমির : তুমি তো জানো, স্পেনে থাকলে তুমি তোমার কন্যাকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

আমামন : হ্যাঁ, আমি তা জানি।

থিওডমির : এরপরও এরকম নির্বুদ্ধিতা কেন করতে চাইছ?

আমামন : আমি মিনতি করছি, তুমি আমার ও আমার কন্যার ওপর দয়া করো।

থিওডমির : রে ইহুদি কুকুর! এটা কি তোর প্রতি আমাদের দয়া নয় যে, এখনো তোকে বাঁচিয়ে রেখেছি? অন্যথায় তুই যখন সরকারী বাহিনীকে তোর কন্যাকে আনার সময় বাধা দিয়েছিলি, তখনই তোকে শেষ করে দেয়া হতো।

আমামন : এ অপমান থেকে মৃত্যুই আমার জন্য শ্রেয় ছিল।

থিওডমির : তাহলে কি তুই মরতে প্রস্তুত?

আমামন : হ্যাঁ, আমার কন্যাকে নিয়ে যাবার আগে আমাকেই হত্যা করে ফেলো।

আমমনের কথা শুনে থিওডমির সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলল, তোমরা এ কুকুরটাকে শেষ করে দাও।

ইসমাঈল তাদের কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তিনি নিঃশব্দে শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ইতোমধ্যে একজন খ্রিষ্টান সৈন্য তলোয়ার উচিয়ে আমামনের দিকে এগিয়ে এলো। তা দেখে বিলকিস এসে তাকে বাধা দান করে এবং বিনয়ের সুরে বলতে থাকে, তোমরা আমার বাবার প্রতি সদয় হও; তাকে দয়া করো।

এসব হাবভাব দেখে ইসমাঈল বুঝতে পারেন, খ্রিষ্টানরা আমামনকে মেরে ফেলতে চায়। তাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন। এদিকে থিওডমির এসে বিলকিসের হাত ধরে টানতে টানতে বলতে থাকে, নির্বোধ মেয়ে! সরে দাঁড়াও।

থিওডমিরের টানাটানি সামলাতে না পেরে বিলকিস পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সে করুণ দৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইসমাঈল বুঝতে পারেন, বিলকিস তাঁর সাহায্য চাচ্ছে। তিনি দ্রুত তলোয়ার বের করে থিওডমিরকে লক্ষ্য করে বললেন, রে দুর্ভাগা, ভালো চাস তো সরে দাঁড়া। কিন্তু কোনো খ্রিষ্টান আরবি বুঝতো না বলে তাঁর কথা তারা বুঝতে পারলো না। তবে ইসমাঈলের উদ্যত ভাব দেখে তারা বুঝতে পারলো, তিনি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত আছেন।

থিওডমিরের মনে মুসলমানদের প্রতি রাগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কারণ তাঁরা তার বহু সৈন্যকে হত্যা করেছে, তাকে পালাতে বাধ্য করেছে। এসময় একজন মুসলমানের এরূপ ঔদ্ধত্যভাব দেখে সে আরো ক্ষেপে যায়। এ সময় তার সঙ্গে ৫০-৬০ জনের মতো সৈন্য আছে। সে একাকী সেই মুসলমানটিকে সমুচিত জবাব দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

থিওডমির সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলল, ওহে খ্রিষ্টানগণ! তোমরা এ ব্যক্তির স্পর্ধা দেখেছ? তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করো। সকল খ্রিষ্টান সৈন্য তলোয়ার উচিয়ে এগিয়ে এলো। ইসমাঈল বুঝতে পারলেন, হয়তো এখনই খ্রিষ্টানরা তাঁর ওপর আক্রমণ চালাবে। তিনি একটুও ঘাবড়ালেন না। তাঁর এক হাতে ছিল ঢাল, অপর হাতে তলোয়ার। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে তাকালেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, যেদিক থেকেই আক্রমণ চালানো হবে তিনি সেদিকেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এ অবস্থা দেখে বিলকিসের আশঙ্কা হলো, ইসমাঈল সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থায় যুদ্ধ হলে ইসমাঈলের মৃত্যু অবধারিত। বিলকিস থিওডমিরের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে বললেন, সর্দার! অযথা রক্তপাত

কি উচিত হবে? এ কথা শুনে থিওডমির তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, তুমি কি স্বেচ্ছায় আমার সাথে যেতে প্রস্তুত?

বিলকিস : হ্যাঁ, শর্তসাপেক্ষে আমি যেতে প্রস্তুত।

থিওডমির : কী সেই শর্ত?

বিলকিস : যুবকটিকে (ইসমাঈলের দিকে ইঙ্গিত করে) ছেড়ে দিতে হবে।

থিওডমির : তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো, সে যদি কোনোরূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেয়, তবে আমরা তাকে ছেড়ে দেবো।

এবার বিলকিস ইসমাঈলের কাছে গিয়ে বলল, হে সাহসী যুবক! আপনি তলোয়ারটি খাপে পুরে রাখুন। ইসমাঈল বিলকিসকে খুব কাছে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন এবং একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, কেন, খ্রিষ্টানরা কি যুদ্ধ করবে না?

বিলকিস : না, তারা আর এখন লড়তে প্রস্তুত নয়।

ইসমাঈল : তাহলে তাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে বলো।

বিলকিস : না, ওরা এখান থেকে যাবে না। আপনিই বরং এখান থেকে চলে যান।

ইসমাঈল : তাহলে তুমি আর তোমার পিতা...?

বিলকিস : আমার পিতাও চলে যাবেন, কিন্তু আমি...

ইসমাঈল : কেন, তুমি যাবে না?

বিলকিস : খ্রিষ্টানরা আমাকে তাদের সাথে নিয়ে যেতে চায়।

ইসমাঈল : তুমি কি সানন্দেই যেতে চাও।

বিলকিস : না।

ইসমাঈল : তাহলে?

বিলকিস : আমি তাদের সাথে না গেলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না।

এ কথা শুনে ইসমাঈল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তিনি বললেন, ওরা কি চায়, আমি তাদের হাতে বন্দী হয়ে থাকবো?

বিলকিস : আপনি তো একা, আর তারা সংখ্যায় অনেক।

ইসমাঈল : এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা নেই। আল্লাহ চাহেন তো আমি একাই তাদের জন্য যথেষ্ট।

বিলকিস : আমার যে ভয় হচ্ছে।

ইসমাঈল : সুন্দরী যুবতী, আমার জন্য কি তুমি তোমার নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনবে?

বিলকিস অনেকটা আনমনাভাবে বললেন, হ্যাঁ।

ইসমাঈল : এ উদারতার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু ...।

বিলকিস একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বলল, কিসের কিন্তু?

ইসমাঈল : আমি আমার জীবন থাকতে তোমাকে তাদের সাথে যেতে দেবো না।

বিলকিস : কিন্তু ওরা যে সংখ্যায় অনেক।

ইসমাঈল : এ ব্যাপারে চিন্তা নেই। সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে ওদের অহংকার রয়েছে। কিন্তু আমরা একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করি।

থিওডমির যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়েছিল। সে দেখতে পেল, মুসলমানরা সমবেত হয়ে নামায পড়ছে। তার আশঙ্কা হলো, হয়তো নামায শেষ করে আবার তাদের পিছু ধাওয়া করবে। এ জন্য যত দ্রুত সম্ভব, তারা সে স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা করছিল। ইসমাঈল ও বিলকিসের কথাবার্তার বিলম্ব দেখে থিওডমির বিলকিসের কাছে এসে বলল, যুবকটি কী বলছে?

বিলকিস : আমাকে একা ফেলে সে ফিরে যেতে রাজী হচ্ছে না।

থিওডমির : যুদ্ধ যখন হবেই, তাহলে আর দেরি করে কী লাভ? তুমি একদিকে সরে দাঁড়াও, এখন আমরা তাকে খতম করে ফেলব।

থিওডমির বিলকিসকে ধরে এক পাশে সরিয়ে দিল। থিওডমিরের এ কাজটি ইসমাঈলকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে থিওডমিরকে বললেন, রে পাপিষ্ঠ! কুমারীর গায়ে হাত দিলে ভালো হবে না কিন্তু!

খ্রিষ্টানরা তাঁর কথার কিছুই বুঝতে পারলো না। তবে যুবকটির উদ্ধতভাবে দেখে থিওডমির সৈন্যদের বললেন, তোমরা এ যুবককে এক্ষুণি শেষ করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টানরা তাঁর ওপর হামলা চালালো। ইসমাঈলও আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি দ্রুত পাশ কেটে পাল্টা আক্রমণ চালালেন। প্রথম আক্রমণেই তিনি একজন খ্রিষ্টানকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় আক্রমণে আরেকজন নিহত হলো। এভাবে ক্রমগত আক্রমণে একের পর এক খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হতে থাকল। তিনি এত তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছিলেন যে তা দেখে খ্রিষ্টানরা হতবাতক হয়ে পড়ে। বিলকিস অবাক বিস্ময়ে তাঁর যুদ্ধ দেখছিল এবং মনে মনে তাঁর নিরাপত্তা কামনা করে প্রার্থনা করছিল। আমামন বুঝতে পারে, ইসমাঈল একা এতগুলো খ্রিষ্টানদের মোকাবিলা করতে পারবেন না। তাই তিনি খ্রিষ্টানদের পাশ কাটিয়ে এ সম্পর্কে মুসলমানদের সংবাদ দেয়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে গেলেন। থিওডমির মনে করেছিল, খ্রিষ্টানরা সহজেই ইসমাঈলকে হত্যা করে ফেলবে; কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা দেখে সে বিস্মিত হয়ে গেল। সে বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, ঈশ্বরই জানেন, এটা কে, কোত্থেকেই বা এসেছে। কী দিয়েই বা তাকে তৈরি করা হয়েছে। মরতে তো জানেই না বরং সে একাই আমাদের

পঞ্চাশ/ষাটজনকে হয়রান করে ফেলেছে। খ্রিষ্টানরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাকে কাবু করতে পারছে না।

ইসমাঈল যার উপরই আক্রমণ চালাচ্ছিলেন, সেই প্রাণ দিচ্ছিল। তিনি এমনভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন, একবার আক্রমণের পর আবার সে আক্রমণের পরিণতির দিকে তাকাবার মতো তাঁর অবকাশ ছিল না; বরং আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। কখনো ডানে তো কখনো বাঁয়ে, কখনো সামনে আবার কখনো পেছনে। এভাবে ঘুরে ঘুরে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন এবং প্রত্যেক আক্রমণে একজন করে খ্রিষ্টান জাহান্নামে পৌঁছে যাচ্ছিল।

এভাবে তিনি প্রায় সতের/আঠারজন খ্রিষ্টানকে হত্যা করলেন। কিন্তু তখনো তিনি কিঞ্চিত ক্লান্ত হননি। থিওডমির পাশে দাঁড়িয়ে রাগে দাঁত কটমট করছিল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, তিনি ইসমাঈলকে টুকরা টুকরা করে ফেলতে; কিন্তু সামনে যাওয়ার মতো সাহস ছিল না। বিলকিস দুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের তামাশা দেখছিল, তার চোখে ছিল বিস্ময়ের চমক, মুখে আনন্দের রক্তিম আভা। ইতোমধ্যে আরো তিনজন খ্রিষ্টান সৈন্য ধরাশায়ী হলো। এমন সময় থিওডমির কী ভেবে হঠাৎ বিলকিসকে জাপটে ধরল। বিলকিস চিৎকার করে উঠলেন, জালেম নিষ্ঠুর! দূরে সরে যা।

ইসমাঈল বিলকিসের শব্দ শুনে তার দিকে ফিরে তাকালেন। তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। সামনে থাকা খ্রিষ্টানদের খতম করে তিনি থিওডমিরের দিকে এগুতে থাকলেন। কিন্তু কয়েক পা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টানদের অসংখ্য তলোয়ার এসে তাঁর ওপর আঘাত হানলেন। তিনিও পাল্টা আক্রমণ করে খ্রিষ্টানদের সব অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। আরো একজন খ্রিষ্টান সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠালেন। এ অবস্থা দেখে থিওডমির বিলকিসকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে সোজা ইসমাঈলের ওপর আক্রমণ চালালো। তা প্রতিহত করতে গিয়ে ইসমাঈলের তলোয়ারটি হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। ফলে তিনি অস্ত্রহীন হয়ে পড়লেন। বিলকিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের যুদ্ধ দেখছিল। ইসমাঈলের এ অবস্থা দেখে সে অস্থির হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। খ্রিষ্টানরা এ অবস্থার সুযোগে একযোগে ইসমাঈলের ওপর আক্রমণ চালাতে উদ্যত হলো। কিন্তু থিওডমির তাদের বাধা দিয়ে তাঁকে বন্দী করতে নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য, সম্রাট রডারিকের কাছে তাঁকে হাজির করা। থিওডমিরের নির্দেশে সবাই মিলে ইসমাঈলকে ঘেরাও করে রেশমী দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো। তারপর বিলকিসকেও ধরে বেঁধে ফেললো। তাদের দুজনকে ঘোড়ায় তুলে দিয়ে থিওডমির নিজেও ঘোড়ায় চড়ে বসলো। অতঃপর সৈন্যদের নিয়ে সমভিব্যাহারে যাত্রা করল।

নয়. পশ্চাদ্ধাবন

নামায শেষ করে তারিক মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বললেন, খ্রিষ্টানদের যেই ঘোড়াগুলি আরোহীবিহীন অবস্থায় মাঠে ছোটাছুটি করছে, তোমরা সেগুলো ধরে ফেলো। তিনি আরো বললেন, যে ঘোড়া যার হাতে ধরা পড়বে, সেটি তার কাছেই থাকবে। তবে কেউ একাধিক ঘোড়া ধরতে সক্ষম হলে বাড়তিটি অপর মুজাহিদ ভাইকে দিয়ে দিতে হবে। ফলশ্রুতিতে তাঁর নির্দেশে প্রায় আড়াইশ মুজাহিদ মাঠে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর কিছু সংখ্যক মুজাহিদকে শহীদ মুজাহিদদের একত্রিত করতে এবং কয়েকজনকে মৃত খ্রিষ্টানদের একত্রিত করতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আবার কিছু সংখ্যককে খ্রিষ্টানদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে নিয়োজিত করা হলো। ইসমাঈল যে আমামনের সঙ্গে খ্রিষ্টানদের তাঁবুতে চলে গেছেন এবং খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন তা তারিক বা কোনো মুজাহিদেরই জানা ছিল না। তদুপরি তাঁবুর আড়ালে যুদ্ধ হওয়ায় মুজাহিদরা ইসমাঈল বা কোনো খ্রিষ্টানের গতিবিধিও দেখতে পাননি।

তারিক মুজাহিদদের কাজকর্ম দেখছিলেন এমন সময় আমামন সেখানে উপস্থিত হলো। তারিক তাকে দেখেই বললেন, ‘চলুন আমরা আপনার কন্যাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। হয়তো সে এখনো তাঁবুতেই আছে।’ আমামন কম্পিত স্বরে বললেন, দ্রুত চলুন।

তারিক তার দিকে তাকিয়ে অনেকটা বিস্ময়ের সুরে বললেন, দ্রুত কেন? থিওডমির কি তাঁবুতে চলে গেছে?

আমামন : জী হ্যাঁ।

তারিক : আপনার কন্যাকে কি তারা সাথে নিয়ে গেছে?

আমামন : আমি তাদের তাঁবু থেকেই এসেছি।

তারিক : আপনার কন্যা কি নিরাপদে রয়েছে?

আমামন : আমি আসা পর্যন্ত নিরাপদেই ছিল।

তারিক : চিন্তা করবেন না, নিয়ে যাওয়ার মতো সাহস তাদের নেই।

আমামন : কিন্তু ...।

তারিক : কিসের কিন্তু? কী হয়েছে?

আমামন : সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে।

তারিক (বিস্মিত হয়ে) : কার সাথে?

আমামন : আপনাদের একজন সঙ্গীর সাথে।

তারিক : কোনো মুসলমান কি সেখানে গিয়েছিল?

আমামন : জী হ্যাঁ, একজন গিয়েছিল।

তারিক : কীভাবে সেখানে গেল?

আমামন : আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম।

তারিক : কেন?

আমামন : আমার কন্যাকে ছাড়াতে।

তারিক : আপনি তো তাকে ছাড়াতে পারবেন না।

আমামন : ছাড়িয়ে তো নিয়েই এসেছিলাম; কিন্তু এমনি মুহূর্তে ৫০/৬০ জন সৈন্যসহ থিওডমির সেখানে উপস্থিত হয়ে গেল এবং আমার সাথে থাকা মুসলমানটির সাথে তাদের যুদ্ধ বেঁধে গেল।

এ কথা শুনে তারিক চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি বলে উঠলেন, 'আহা! একজন মুসলমান ৫০/৬০ জন শত্রু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আল্লাহ্ তাঁকে হেফাজত করুন।' তিনি আশপাশের মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন, 'ভাইয়েরা! তোমরা কে কোথায় আছো, শীঘ্র চলো, তোমাদের এক ভাইকে সাহায্য করতে হবে।' কথা শেষ করেই তিনি খ্রিষ্টানদের তাঁবুর দিকে ছুটে চললেন। আমামনও তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলেন। কিন্তু তিনি বয়সের ভারে দ্রুত দৌড়াতে না পারায় কিছুটা পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে ৪০০/৫০০ মুজাহিদও খ্রিষ্টানদের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।

তারিক সবাইকে তাঁবুগুলো ঘিরে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। সে মতে তাই করা হলো। একের পর এক তাঁবুগুলোতে তল্লাশি চললো। কিন্তু কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না। ইতোমধ্যে আমামনও এসে পৌঁছলেন এবং তারিককে সঙ্গে নিয়ে থিওডমিরের তাঁবুতে গেলেন। দেখা গেল, তাঁবুটি জনশূন্য। তাঁবুর পাশে খ্রিষ্টানদের অনেক মরদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, কিন্তু কোথাও কোনো মুসলমানের মৃতদেহ পাওয়া গেল না।

তারিক প্রত্যেকটি মরদেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, বীর মুসলিম যুবকটি একুশজন খ্রিষ্টানকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। সম্ভবত তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এমনি মুহূর্তে খ্রিষ্টানরা তাকে বন্দী করে ফেলেছে।

তারিক আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওগো করুণাময় আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও। আমরা তোমার সৈনিকটির খবর নিতে পারিনি। হয়তো সে শত্রুদের দ্বারা আটকা পড়েছে। কিয়ামতের দিন তাঁর কথা জিজ্ঞেস করে আমাকে

লজ্জা দিয়ো না। আমি মানুষ, তাই আমার দ্বারা এরূপ ভুল সংঘটিত হয়ে গেছে।' তার চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছিল। অতঃপর তিনি দুজন মুজাহিদকে লক্ষ্য করে বললেন, শীঘ্রই ময়দানে চলো এবং ২০/৩০ জন অশ্বারোহী মুজাহিদকে ডেকে আনো। তাঁর কথা শোনামাত্রই মুজাহিদ দুজন দ্রুত দৌড়ে গেলেন।

এদিকে তাঁবু অবরোধকারী অন্য মুজাহিদরাও সেখানে এসে সমবেত হলেন। সকলেই বলতে লাগলেন, কোন তাঁবুতেই লোকজন নেই। তারিক তাঁদের কয়েকজনকে খ্রিষ্টানদের মরদেহগুলো ময়দানে রেখে আসার নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ দুজন দুজন করে একেক খ্রিষ্টানদের মরদেহ ময়দানে নিয়ে তাদের বর্শা ও বর্ম খুলে রাখা হলো।

ইতোমধ্যে ২৫/৩০ জন অশ্বারোহী মুজাহিদ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তারিক তাদের লক্ষ্য করে বললেন, থিওডমির একজন মুসলমানকে ধরে নিয়ে গেছে। তোমরা আমামনকে সাথে নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করো। কিন্তু বেশিদূর এগুবে না। তাদের সন্ধান পাওয়া যাক বা না যাক, রাতের আগেই ফিরে আসবে।

তখন সে নির্দেশমতো ২৫জন মুজাহিদের একটি সৈন্যদল খ্রিষ্টানদের পিছু ধাওয়া করল। আমামন একটি ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

তাঁদের বিদায় দিয়ে তারিক অবশিষ্ট মুজাহিদদের নিয়ে রণাঙ্গনে ফিরে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন খ্রিষ্টানদের প্রায় সব ঘোড়াই মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছে। মুজাহিদরা মুসলিম শহীদদের ও খ্রিষ্টানদের মরদেহগুলো একত্রিত করছিল। শহীদ মুজাহিদের সংখ্যা ১৯ জন এবং খ্রিষ্টান মৃতের সংখ্যা ১১০০জন। জানাযা পড়ে শহীদদের দাফন করা হলো। তারপর মুজাহিদগণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলেন। সুস্থরা আহত মুজাহিদদের সেবায় লেগে গেলেন। রাতে সবাই মিলে খাবার তৈরি করলেন এবং এশার নামায সেরে সকলে আহার করলেন। সে সময়ই জানা গেল, শত্রুদের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ কথা শুনে তারিকসহ অন্য মুজাহিদরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু রাতের বেলায় কিছু করা সম্ভব নয় বলে অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে ভোরের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দশ. [illegible]

খ্রিষ্টানরা মুজাহিদদের মোকাবিলা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। অনেকেই মারা গেল। যারা বেঁচে ছিল, তারা হতোদ্যম হয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে গেল। অথচ খ্রিষ্টানরা ছিল অশ্বারোহী এবং মুসলিমরা ছিলেন পদাতিক। দু'চারজন ছাড়া মুসলমানদের কারো কাছেই বর্ম ছিল না। এমনকি অনেকের কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্র পর্যন্ত ছিল না; পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানরা ছিল সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের বীরত্বের কাছে তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। এমনকি পদাতিক মুজাহিদরা বহুদূর পর্যন্ত অশ্বারোহী খ্রিষ্টানদের পিছু ধাওয়া করেছিল। এজন্য খ্রিষ্টানদের মনে এমন ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা পিছনে তাকাবার সাহস করেনি। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল, মুসলমানরা অবশ্যই তাদের পিছু ধাওয়া করে আসছে। ফলে তারা তীব্র বেগে ঘোড়া ছোটালো এবং অর্ধ রাত পর্যন্ত এভাবে ছুটে চললো।

দীর্ঘপথ চলার ফলে ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়লো। থিওডমিরের সঙ্গী সৈন্যরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা এক স্থানে নেমে পড়ল; কিন্তু সেখানে খাবার মতো কিছু না পাওয়ায় ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই শুয়ে পড়ল।

ইসমাঈলও তাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি ছিলেন আরব। তাই মাটিতে শোয়া তাঁর অভ্যাস ছিল, ফলে তাঁর কোনো অসুবিধে হলো না; কিন্তু খ্রিষ্টানরা ছিল নরম বিছানায় শোয়ায় অভ্যস্ত। তাই মাটিতে শুতে তাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল। সর্বাধিক কষ্ট অনুভব করছিল বিলকিস। শোয়ার ইচ্ছে তো তার ছিলই না; এমন কি সে বসতে পর্যন্ত রাজী ছিল না। তাই তিনি বারবার এপাশ ওপাশ করছিলেন। ইসমাঈল তার পাশেই ছিলেন। তিনি বিলকিসের অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেও মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। বিলকিসের জন্য কিছু করতে তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু শৃঙ্খলিত হওয়ায় কিছু করতে পারছিলেন না। চাঁদনী রাত। জোসনায় চতুর্দিক ঝলমল করছে। প্রকৃতি এক অপরূপ সাজে সেজেছে।

বিলকিসের উপরে চাঁদের আলো পড়েছে। চাঁদ যেন আলোর সমস্ত উজ্জ্বলতা বিলকিসের চেহারায় ঢেলে দিয়েছে। ফলে তার চেহারা এত দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে যে, সেদিকে চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না।

বিলকিস বারবার এপাশ ওপাশ করছিলেন এবং কষ্ট লাঘবের জন্য কখনো কখনো দাঁত কামড়ে ধরছিলেন। তা দেখে ইসমাঈল আস্তে আস্তে বললেন : আহা, তোমার তো বড্ড কষ্ট হচ্ছে!

বিলকিস : না, তেমন কষ্ট তো হচ্ছে না। তবে...

ইসমাঈল : তবে, কি?

বিলকিস : আপনি কি আমার কষ্ট অনুভব করছেন?

ইসমাঈল : হ্যাঁ, তা তো করছি।

বিলকিস (স্মিত হেসে) : আপনি কেমন করে বুঝলেন?

ইসমাঈল : আমি নিজেও যে অত্যন্ত অস্থির।

বিলকিস : আচ্ছা, আপনার নাম কি?

ইসমাঈল : আমার নাম ইসমাঈল।

বিলকিস : আপনি তো একজন সামরিক অফিসার।

ইসমাঈল : হ্যাঁ, আমার অধীনে পাঁচশ সৈন্য রয়েছে।

বিলকিস : আমাকে মুক্ত করতে এসেছিলেন কেন?

ইসমাঈল : আমি কি জবাব দেব?

বিলকিস : মনে হয় হঠাৎ এসে পডেছিলেন, তাই না?

ইসমাঈল : সম্ভবত তা সঠিক করে এখন বলা যাবে না।

বিলকিস : তা ছাড়া আর কি হতে পারে?

ইসমাঈল : কোনো অজ্ঞাত শক্তি হয়ত আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে!

বিলকিস : সে অজ্ঞাত শক্তিটি কী হতে পারে?

ইসমাঈল : এতটুকু বলা যায় ...

বিলকিস : থামলেন কেন?

ইসমাঈল : পাছে আপনি বিরক্তবোধ করেন।

বিলকিস : আমার বিরক্ত হওয়ার কি আছে?

ইসমাঈল : সত্যি কথা বলতে কি, তোমার প্রতি এক অজানা আকর্ষণই আমাকে টেনে এনেছে।

বিলকিসের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আপনি না একজন মুসলমান?

ইসমাঈল : হ্যাঁ, আমি একজন মুসলমান।

বিলকিস : কিন্তু আমি যে এক ইহুদি কন্যা।

ইসমাঈল : তোমার পিতাকে দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। আচ্ছা তোমার নামটা যেন কি?

বিলকিস (স্মিত হেসে) : আমার নাম বিলকিস।

ইসমাঈল : সম্ভবত তুমি সুন্দরী বলে এ নাম রাখা হয়েছে।

বিলকিস : আপনার যা ইচ্ছা ভাবতে পারেন।

ইসমাঈল : এই খ্রিষ্টানরা বড়ই নির্মম।

বিলকিস : কেন?

ইসমাঈল : ওরা তোমার আরামের কোনো ব্যবস্থাই করল না।

বিলকিস : তাদের মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব নেই।

ইসমাঈল : তুমি ঠিকই বলেছ। ওরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে বন্দী করেছে। অন্যথায় ওদের কাউকেই আমি জীবিত ছাড়তাম না।

বিলকিস : আপনার সাহসিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ইসমাঈল মায়াবী দৃষ্টিতে বিলকিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য, আমি তোমার সাক্ষাত পেয়েছি।

একজন খ্রিষ্টান সৈন্য রাগত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা মুখ বন্ধ করো। নিজেরা তো ঘুমাচ্ছই না, আমাদেরও ঘুমাতে দিচ্ছ না।

এ কথা শুনে ইসমাঈল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, তিনি শৃঙ্খলিত। সুতরাং চুপ থাকা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না। তথাপি তিনি উচ্চারণ করলেন, অসভ্য, বর্বর!

বিলকিস অনুরোধের সুরে তাঁকে বললেন, দয়া করে চুপ করুন। ওরা যা বর্বর চুপ না করলে হয়ত নতুন কোনো বিবাদ বাধিয়ে দিতে পারে। ইসমাঈল চুপ হয়ে গেলেন। বিলকিসও নীরব, নিশ্চুপ। ওরা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। এক সময় তাঁদের চোখ বন্ধ হয়ে এলো। উভয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে দেখেন, পূর্বগগনে সূর্য বেরিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে অন্য খ্রিষ্টানরাও জেগে উঠে এবং নিজ নিজ কাজ সেরে নিয়ে আবার যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে।

ইসমাঈল অযু করে নামায পড়েন। থিওডমির এবং অন্য খ্রিষ্টানরা রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাঁর নামায দেখছিল। থিওডমির সঙ্গীদের বলল, লোকটা মনে হয় আরব মুসলমান।

জনৈক খ্রিষ্টান সৈন্য : তাই তো মনে হচ্ছে স্যার!

থিওডমির : তার সঙ্গীরাও বোধ হয় আরব মুসলমানই হবে।

জনৈক খ্রিষ্টান : তাই বুঝা যায় স্যার।

থিওডমির : তাহলে তো খুবই ভয়ের ব্যাপার! কারণ, ওরা তো যে দেশই আক্রমণ করেছে সেটাই জয় না করে ছাড়েনি।

আরেক খ্রিষ্টান : শুনেছি, মুসলমানরা বিনা কারণে কোনো দেশ আক্রমণ করে না।

থিওডমির : ঠিক বলেছ। সম্ভবত ওরা কোনো বিশেষ ঘটনা জানতে পেরেছে। আমি সম্রাট রডারিককে এ ব্যাপারে অবহিত করব।

আরেক খ্রিষ্টান : অবশ্যই অবহিত করতে হবে স্যার! যদি তাদের বাধা দেয়া না যায় আর তারা দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে তবে তাদের বের করে দেয়া খুবই কঠিন হয়ে যাবে।

থিওডমির : হুম্ম, তা তো ঠিক; কিন্তু লিখব কি দিয়ে। এখানে তো কাগজ-কলম কিছুই নেই।

জনৈক খ্রিষ্টান : এখানে এমন অনেক তৃণলতা রয়েছে, যার রস কালির কাজে আসবে। কোনো গাছের টুকরার ওপর লেখা যেতে পারে।

থিওডমির : তাহলে তোমরা এসব যোগাড় করো।

কয়েকজন খ্রিষ্টান দ্রুত দৌড়ে গিয়ে এসব সরঞ্জাম নিয়ে এলো। থিওডমির সম্রাট রডারিকের কাছে চিঠি লিখতে বসল। চিঠি লেখা শেষ হলে থিওডমির বলল, আমার ইচ্ছা ছিল বন্দীকে সম্রাটের দরবারে পাঠাবো। কিন্তু একজন পাঠিয়ে কী লাভ! সম্রাট আমাদের সাহায্যে সৈন্য পাঠালে সবাইকেই বন্দী করে নিয়ে যেতে পারব।

জনৈক খ্রিষ্টান : তাই তো উচিত স্যার!

থিওডমির একজন অশ্বারোহীকে চিঠিটি দিয়ে বললেন, 'এটি তুমি যথাশীঘ্র সম্ভব সম্রাটের কাছে পৌছাবে।' অশ্বারোহী এগিয়ে এসে সেটি হাতে নিয়ে দ্রুত যাত্রা করল। অশ্বারোহী চলে গেলে অন্যরাও অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করে সেডোনার দিকে যাত্রা করে।

[illegible]

থিওডমিরের প্রেরিত দূত দ্রুত রাজধানী টলেডোতে যাচ্ছিল। টলেডোর সমস্ত পথঘাট তার জানা ছিল। তাই বড় পথে না গিয়ে ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত পাহাড়ী পথ ধরে যেতে লাগল।

তাকে দ্রুত সম্রাট রডারিকের কাছে পৌছার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই পথিমধ্যে খুব সামান্য বিশ্রাম নিয়ে দিনরাত পথ চলে টলেডো পাহাড়ে গিয়ে পৌছল। সে টেগাস নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখান থেকে টলেডোর আকাশচুম্বী প্রাসাদ দেখা যাচ্ছিল। টলেডোয় ছিল একটি প্রশস্ত দুর্গ। দীর্ঘ পর্বত চূড়া কেটে দুর্গটি নির্মিত হয়েছে। দুর্গের চতুর্পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে টেগাস নদী। নদীর ওপর নির্মাণ করা হয়েছে একটি উঁচু সেতু। সেতুটি খুবই মজবুত ও আকর্ষণীয়। স্পেনবাসীরা তাদের জানা নির্মাণ কৌশল উজাড় করে সেতুটি নির্মাণ করেছে।

থিওডমিরের প্রেরিত দূত সেতু অতিক্রম করে দুর্গ-প্রাচীরের কাছে গিয়ে পৌছল। দুর্গের চারদিকে চারটি বৃহৎ দ্বার, সামনে উন্মুক্ত বিরাট প্রান্তর। দ্বারগুলো খুবই উঁচু ও শিল্পমণ্ডিত। প্রতিটি দ্বারে অনেক দ্বাররক্ষী নিয়োজিত। আগত দূত দ্বার অতিক্রম করে দুর্গের ভেতরে গিয়ে পৌছল।

দুর্গটির অভ্যন্তরও দেখতে খুবই সুন্দর। ভেতরে আকাশচুম্বী অনেক সুন্দর ইমারত নির্মাণ করা হয়েছে। সে দেখল, ঘরগুলো সব নয়নাভিরাম সাজে সজ্জিত। একজনকে জিজ্ঞেস করল, এসব সাজসজ্জা কেন?

তাকে জানানো হলো, আজ নববর্ষ। তাই রাজার নির্দেশে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। চতুর্দিকে আনন্দ ধ্বনি। কোথাও কোথাও চলছিল নাচের অনুষ্ঠান। লোকেরা নতুন সাজগোজ করে হাসি তামাশা করে ফিরছে। দূত সরাসরি রাজদরবারে গিয়ে পৌছল। দরবারগৃহটিকেও অত্যন্ত সুন্দররূপে সাজানো হয়েছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সজ্জিত নববধু বরের আগমন অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণছে।

তখন দরবার চলছিল। পারিষদবর্গের সকলেই নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। সম্রাট রডারিক রৌপ্য নির্মিত একটি উঁচু সিংহাসনে উপবিষ্ট। পেছনে কয়েকজন সুন্দরী রমণী দাঁড়িয়ে আনন্দ দিচ্ছে। কয়েকজন সুন্দরী নর্তকী সম্রাটের সামনে নেচে নেচে গান গাইছে। তারা যেমন সুন্দরী তেমনি অপরূপ সাজে সজ্জিত। নাচেও তারা অত্যন্ত পটু। তাদের উপস্থিতি গোটা পরিবেশ মোহনীয় করে

তুলেছে। সভাসদসহ সম্রাট অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে নাচ দেখছেন। আগত দূত একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে নাচ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করল। সে ভাবছিল, সময় বুঝে থিওডমিরের চিঠিটি সম্রাটের সামনে পেশ করবে। কিন্তু নাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গান শুরু হয়ে গেল। আরম্ভ হলো হৃদয়স্পর্শী বাদ্যের সুর। গায়িকাদের সুরেলা কণ্ঠে সভাসদবর্গ মুগ্ধ হয়ে গেল। সম্রাট নিজেও তন্ময় হয়ে গেলেন। এক সময় গান শেষ হলো। সুন্দরী গায়িকারা দুই সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের পরনে নানা বর্ণের বাহারী পোশাক। সকলের দৃষ্টি তাদের পোশাকের দিকে। দূত সুযোগ বুঝে সুন্দরীদের ভিতর দিয়ে সম্রাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সম্রাট অনেকটা বিরক্তির সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে রাগত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হে দুর্ভাগা?

দূত কিছুটা ঘাবড়ে গেল। তার ভয় হলো, সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে। সম্রাট রডারিক অত্যন্ত বদমেজাজী হিসেবে পরিচিত। সকলেই তাকে ভয় করে চলত। দূত তৎক্ষণাৎ কুর্নিশ করে আদবের সঙ্গে উত্তর দিল, আমি একজন দূত জাহাঁপনা!

রডারিক বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'দূত'!

দূত : জী হ্যাঁ।

রডারিক : কোথাকার দূত?

দূত : সেনাপতি থিওডমিরের।

সম্রাটের রাগ ধীরে ধীরে কমতে লাগল। তার চেহারায় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, থিওডমির কি তাহলে বিলকিসকে গ্রেফতার করতে পেরেছে?

দূত : জী হ্যাঁ জাহাঁপনা!

রডারিক : তুমি নিজে বিলকিসকে দেখেছ?

দূত : দেখেছি হুজুর।

রডারিক : সে নাকি খুবই সুন্দরী?

দূত : জী, সে চতুর্দশী চাঁদের চেয়েও সুন্দরী।

রডারিক : সে এখন কোথায়?

দূত : সেনাপতি থিওডমিরের হেফাজতে আছে জাহাঁপনা!

রডারিক কিছুটা রেগে গেল। বলল, থিওডমির এমন নির্বোধের মতো কাজ করল কেন?

দূত সম্রাটের কথার মর্ম বুঝতে পারলো না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

সম্রাট এতে আরো রেগে গেলেন। অনেকটা ধমকের সুরে বললেন, আরে বুদ্ধু! থিওডমির বিলকিসকে নিজের কাছে রেখেছে কেন?

দূত : তাকে পাঠানোর সুযোগ হলো না জাহাঁপনা!

রডারিক : কেন?

দূত : হঠাৎ কোত্থেকে যেন বিস্ময়কর কিছু লোক এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

রডারিক : তোমাদের সাথে তাদের কোথায় দেখা হলো?

দূত : যেখানে প্রধান সেনাপতির সৈন্য অবস্থান করছিল।

রডারিক : তারা এসে কি বলল?

দূত : তারা এসেই যুদ্ধ শুরু করে দিল।

রডারিক অনেকটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, যুদ্ধ?

দূত : জী হ্যাঁ।

অতঃপর দূত একের পর এক ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা সম্রাটকে জানালো। দরবারে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে তার কথা শুনছিল।

রডারিক জিজ্ঞেস করল, ওরা কে, কোত্থেকে এসেছে?

দূত : জাহাঁপনা, তা কেউ বলতে পারে না। তাদের পরনে লম্বা জুব্বা, মুখে লম্বা দাড়ি, উজ্জ্বল চেহারা। তাদের দেখে দেবদূতের মতো মনে হচ্ছিল। কিন্তু ওরা জিনের মতো যুদ্ধ করছিল।

রডারিক : এসব তো ভারী আশ্চর্যজনক ব্যাপার!

এবার দূত এগিয়ে থিওডমিরের চিঠিটি সম্রাট রডারিকের হাতে দিল। রডারিক চিঠিটি মন্ত্রীর হাতে দিলে সে তা পড়তে শুরু করলো। চিঠিটির ভাষ্য এমন–

মহামান্য সম্রাট,

এক আশ্চর্যজনক জাতি আমাদের স্পেনের ওপর আক্রমণ করেছে। তাদের পরনে আদিম পোশাক। আমার জীবনে আমি কখনো এমন পোশাক দেখিনি। পায়ের গাঁট পর্যন্ত লম্বা জুব্বা। চওড়া হাতা। লম্বা কাপড় দিয়ে তাদের শির বাঁধা (পাগড়িকে বুঝানো হয়েছে)। এর উপরে লম্বা কাপড় দিয়ে ঢাকা, যা কান বরাবর এসে লটকে পড়েছে। তাদের চেহারা রাশভারী ও উজ্জ্বল। মুখে লম্বা দাড়ি। কিন্তু যখন আক্রমণ চালায় তখন তাদের রক্তপিপাসু বাঘের মতো মনে হয়। তাদের আক্রমণ এতটাই তীব্র আর ভয়াবহ, কেউই তাদের সামনে টিকতে পারে না।

তারা মাটি ফেঁড়ে উঠে এসেছে, না আকাশ থেকে নেমে এসেছে আমরা তা বুঝতে পারছি না। আমরা যথেষ্ট বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছি এবং যারপর নাই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আমাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে।

মনে হয় মৃত্যু কি জিনিস ওরা তা জানেই না; বরং তারা শুধু মারতেই এগিয়ে আসে। তারা পিছপা হতেও জানে না; বরং মরিয়া হয়ে সামনে এগিয়ে আসে। তাদের মোকাবিলা করা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। ওদের গতিরোধ করা না গেলে সমস্ত স্পেন ওরা ধ্বংস করে ফেলবে।

দেশের এ দুর্যোগ প্রতিহত করার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনার নিজের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। তা না হলে দেশ ও জাতি এক চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অবশ্য তাদের এক ব্যক্তিকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি। আর বিলকিস আমার হেফাজতেই আছে।

নিবেদক
আপনার একান্ত বাধ্যগত
সেনাপতি থিওডমির

চিঠিটি পড়ে সম্রাট রডারিকসহ সভাসদরাও অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো। কী হতে যাচ্ছে তারা কিছুই বুঝতে পারল না। তারা চোখ তুলে দেখতে পেলো, দুজন বৃদ্ধ পাদরির মতো পোশাক পরে রূপার ছড়ি হাতে সামনে এগিয়ে আসছে। সম্রাট-সভাসদ সকলেই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বার. দুই বৃদ্ধ রক্ষী

বৃদ্ধ দুজনের মুখে পাকা দাড়ি। পরনে সাদা জুব্বা। কোমরে বাঁধা কোমরবন্ধনী। কোমরবন্ধনীর অগ্রভাগ হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত। কোমরবন্ধনীর উপরে দ্বাদশমণ্ডলের বৃত্ত অংকিত। কোমরে চাবির অনেকগুলো গোছা লটকানো। যাতে অনেক চাবি ঝুলানো। উভয়ের গড়ন লম্বা আকৃতির। রূপার ছড়ির ওপর ভর করে তারা হাঁটছিল। তাদের দেখে সম্রাট নিজেও বিস্মিত হয়ে পড়লেন।

উভয়ই সরাসরি সম্রাটের আসনের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। তারা অবনত মস্তকে রাজাকে কুর্নিশ করল। তারপর রাজার গুণকীর্তন করলো। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা?

এক বৃদ্ধ উত্তর দিল, আমরা জাদুঘর নামে পরিচিত গম্বুজের রক্ষক।

সবার জানা ছিল, টলেডোর পাহাড়ের ওপর একটি গম্বুজ আছে। সম্রাট হিরাক্লিয়াস গম্বুজটি নির্মাণ করেছিলেন। অনেক বছর যাবত সেটি তালাবদ্ধ। হিরাক্লিয়াস সমুদ্রের তীরে একটি মিনারও নির্মাণ করেছিলেন। তার নামানুসারে মিনারটির নামকরণ করা হয়েছিল হিরাক্লিয়াসের মিনার। এই মিনারটি আজো বিদ্যমান। এটি নির্মাণের সময় নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় একটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছিল। এই গম্বুজটিই 'জাদুঘর' নামে খ্যাত। নির্মাণের সময় থেকেই এটি বন্ধ। এর ভেতরে কি আছে কেউ তা জানে না। সম্রাট রডারিক বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্বিতীয়বার তোমাদের আসার হেতু কি?

বৃদ্ধদুজনের একজন বলল, স্পেনে রীতি আছে, যিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন তিনি নববর্ষের দিনে নিজের নামাঙ্কিত তালা গম্বুজের ফটকে ঝুলিয়ে দিবেন।

সম্রাট তাদের কথায় ছেদ টেনে বললেন, আমার নামাঙ্কিত তালা গম্বুজের ফটকে ঝুলানোর কথা বলতেই তোমরা আমার কাছে এসেছ?

এক বৃদ্ধ : জী হ্যাঁ।

সম্রাট : এতে কী উপকার হবে?

অপর বৃদ্ধ : এতে প্রয়াত রাজাদের উপদেশ বাস্তবায়ন হবে।

সম্রাট : গম্বুজের ভেতরে কী আছে, তা কি তোমরা জানো?

প্রথম বৃদ্ধ : জী না হুজুর। গম্বুজটি নির্মাণের পর থেকেই তা বন্ধ। ফলে এর ভেতর কি রয়েছে তা আমাদের অজানা।

সম্রাট : তোমরা কতদিন থেকে তা দেখাশোনা করছ?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : জাহাঁপনা, আমরা দুভাই। আমাদের পূর্বপুরুষরাও এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আমরাও বুঝ-জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এর দেখাশোনা করে আসছি।

সম্রাট : তোমরা এর সংরক্ষণ করছ কীভাবে?

প্রথম বৃদ্ধ : আমরা বহিরাংশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি।

সম্রাট : আর ভেতরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা?

প্রথম বৃদ্ধ : কেউ করে না।

সম্রাট : কেন?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : তা খোলার হুকুম নেই জাহাঁপনা!

সম্রাট : কার হুকুম নেই।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : গম্বুজটির প্রতিষ্ঠাতার।

সম্রাট : সম্রাট হিরাক্লিয়াসের?

প্রথম বৃদ্ধ : জী হ্যাঁ।

সম্রাট : কেন নেই।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, গম্বুজটি খোলা হলে দেশে বিপর্যয় নেমে আসবে।

সম্রাট : আর কিছু?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : যে সম্রাট তা খুলবেন তিনি মারা যাবেন।

সম্রাট : অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী তো।

প্রথম বৃদ্ধ : জী হ্যাঁ।

সম্রাট : কোনো সম্রাট কি তা খোলার সাহস করেছেন কি?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : কয়েকজন সম্রাট তা করেছিলেন।

সম্রাট : তারপর কী হয়েছে?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : হয়তো তাদের মৃত্যু হয়েছে নয়তো অন্য কোনো বিপদে পড়েছেন।

সম্রাট : তোমাদের সামনেও কি কোনো সম্রাট তা খোলার চেষ্টা করেছিলেন?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : জী না হুজুর, আমরা তেমন কাউকে দেখিনি।

সম্রাট : তোমরাও জানো না এর ভেতর কি রয়েছে?

প্রথম বৃদ্ধ : শুধু আমরা কেন জাহাঁপনা, বর্তমানে বিশ্বের কেউই তা জানে বলে মনে হয় না।

সম্রাট : এ ব্যাপারে তোমাদের কী ধারণা?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : আমরা কখনো এ ব্যাপারে চিন্তাই করিনি।

সম্রাট : আমি কি আমার ধারণার কথা বলবো?

প্রথম বৃদ্ধ : বলুন জাহাঁপনা।

সম্রাট : এর ভেতর অনেক মূল্যবান সম্পদ আছে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : তাহলে তা সংরক্ষণের জন্য এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর কী প্রয়োজন ছিল?

সম্রাট : সম্ভবত ধারণা করা হয়েছিল, এরূপ করলে কোনো রাজা তা খুলতে আর সাহস করবে না।

প্রথম বৃদ্ধ : সম্পদ লুকিয়ে রাখার মানে কী হতে পারে?

সম্রাট : সম্পদ গোপনকারীরা হয়তো ভেবেছিল, তারা নিজেরাই যেহেতু এ সম্পদ ভোগ করতে পারেনি। সুতরাং আর কেউই যেন তা ভোগ করতে না পারে। সে জন্যই তারা এরূপ ভীতিকর ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : কিন্তু এ গম্বুজটি তো সম্রাট হিরাক্লিয়াস নির্মাণ করেছিলেন।

সম্রাট : হ্যাঁ তিনিই হয়তো এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

প্রথম বৃদ্ধ : যাই হোক জাহাঁপনা, আপনিও আপনার নামাঙ্কিত তালাটা লাগিয়ে দিন।

সম্রাট : আমিও কি সেই নির্বোধদের মতো ফটকে তালা আটকে দেব? না, তা কখনোই দেব না। আমি গম্বুজটি খুলবোই।

বৃদ্ধ দুজনই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল। সভাসদরা সম্রাটের কথা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রধানমন্ত্রী : জাহাঁপনা কি সত্যিই গম্বুজটি খুলবেন?

সম্রাট (দৃঢ়ভাবে) : নিশ্চয়ই খুলবো।

প্রধানমন্ত্রী : কিন্তু জাহাঁপনা...।

সম্রাট : কিন্তু কি?

প্রধানমন্ত্রী : প্রাচীন লোককথা আছে, এ গম্বুজের রহস্য কেউই জানতে পারবে না। তবে যে জানতে পারবে সে হবে বংশের সর্বশেষ সম্রাট। এ রহস্য জানা তার পক্ষে তখনই সম্ভব হবে যখন সে সিংহাসনচ্যুত হবে।

সম্রাট : হ্যাঁ, এসব লেখা না থাকলে হয়তো এতদিনে কোনো না কোনো রাজা তা বের করে নিয়ে যেতো।

প্রধানমন্ত্রী : তাতে কোনো সম্পদই নেই জাহাঁপনা!

সম্রাট : আপনি কি দেখেছেন?

প্রধানমন্ত্রী : দেখিনি, তবে পূর্বপুরুষদের মুখে শুনেছি।

সম্রাট (রেগে গিয়ে) : পূর্বপুরুষরা নির্বোধ ছিল।

একজন সামরিক কর্মকর্তা : জাহাঁপনা! এ সম্পর্কে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

সম্রাট : কী সেটা?

সামরিক কর্মকর্তা : যেদিন গম্বুজটি খোলা হবে, সেদিনই দেশে আপদ নামবে।

সম্রাট (তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে) : ভষ্যিতবাণী তো শুধু ভয় দেখানোর জন্য। আমি ভয় করি না। গম্বুজটি আমি খুলবোই। এর ভেতর কি আছে আমি তা দেখবোই।

একজন পাদরি : আমার তো মনে হয় জাহাঁপনার সে ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত। যদি তাতে কোনো সম্পদ থেকেও থাকে, তবে এখন তো আপনার কোনো অর্থ-কড়ির প্রয়োজন নেই। বরং ভবিষ্যতের কোনো জরুরি প্রয়োজনের জন্য রেখে দেয়া উচিত।

সম্রাট : আমি মুখে যা বলি, তা না করে ছাড়ি না। অতএব আমাকে বারণ করা বাতুলতা মাত্র।

পাদরি : আপনার মর্জি জাহাঁপনা!

সম্রাট বৃদ্ধদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ফিরে যাও। চাবিগুলো পরিষ্কার করে রেখো। আমি আগামীকালই গম্বুজ খুলব।

বৃদ্ধদ্বয় অবনত মস্তকে সম্রাটকে কুর্নিশ করে ফিরে গেল। রডারিক সামরিক কর্মকর্তাকে বললেন, এখন কী পরিমাণ সৈন্য পাঠানো যেতে পারে?

সামরিক কর্মকর্তা : আনুমানিক এক লাখ জাহাঁপনা!

সম্রাট : ঠিক আছে, তুমি সবাইকে আমার নির্দেশ জানিয়ে দাও। তারা যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

সামরিক কর্মকর্তা : জো হুকুম জাহাঁপনা!

সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন। অন্য সভাসদরাও উঠে দাঁড়ালো এবং অবনত মাথা ঝুঁকিয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানালো। উপস্থিত নর্তকীরাও বুকে হাত রেখে রাজাকে কুর্নিশ করল। সম্রাট একবার সকলের দিকে তাকিয়ে সিংহাসন থেকে নেমে দরবার ত্যাগ করলেন। পেছনে দাঁড়ানো সুন্দরী যুবতীরা সম্রাটের চোগা ধারণ করে পিছে পিছে গেল। রাজার প্রস্থানের পর অন্য সভাসদরাও দরবার ছাড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরবার খালি হয়ে গেল।

তের. ভয়

সম্রাট দরবার থেকে বেরিয়ে সরাসরি হেরেমে চলে গেলেন। বৃদ্ধ রক্ষীদের আগমন, তাদের কথা ও গম্বুজ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তিনি কিছুটা গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন। তিনি অত্যন্ত জেদি স্বভাবের মানুষ। এই জেদের বশবর্তী হয়েই দরবারে তিনি গম্বুজটি খোলার দৃঢ় সিদ্ধানের কথা ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু এখন তার মনে কিছুটা দ্বিধা দেখা দিয়েছে। খোলার সিদ্ধান্ত পরিহার করাও এখন তার জন্য বিপদ। জনতা তাকে কাপুরুষ ভাববে।

প্রাসাদে পৌঁছে তিনি তার রাজকীয় পোশাক বদলে আহার গ্রহণ করলেন। তারপর বিছানায় গা এগিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই তার মনে আবার গম্বুজের চিন্তা এলো। মনে এক অজানা ভয়ের উদ্রেক হলো। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে বলতে লাগল, গম্বুজটি খোলা হলে তা তোমার জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে। দূতের দেয়া সংবাদ ও থিওডমিরের চিঠির বিষয়েও তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আগন্তুকদের পরিচয় সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই, তবুও তার মনে এক অজানা শঙ্কা পীড়া দিচ্ছিল। না জানি তারা কে, কোত্থেকে এসেছে। কে সেই জাতি যারা বিনা কারণেই হামলা চালিয়েছে।

এ চিন্তা তাকে এতোই অস্থির করে তুলেছিল যে, কয়েক ঘণ্টা এভাবেই কেটে গেল। তিনি যতই ভাবছিলেন, অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি তার পারিপার্শ্বিকতার কথাও ভুলে যান। পরিচারিকারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার এ তন্ময়তা দেখে উৎসুক হয়ে কাশির শব্দ করল। এ শব্দে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমরা কি এখানেই দাঁড়িয়ে ছিলে?

জনৈক তরুণী : জী হ্যাঁ, আমরা এখানেই ছিলাম।

সম্রাট : কখন থেকে?

তরুণী : অনেকক্ষণ ধরে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি কী যেন চিন্তা করছিলেন।

রডারিক : হ্যাঁ, আমি আজ কিছুটা চিন্তায় আছি।

জনৈক মুখরা তরুণী মুচকি হেসে বলল,

জাহাঁপনা কি ফ্লোরিন্ডার কথা ভাবছেন?

পাঠক হয়তো ভুলে যাননি, সম্রাট রডারিক কাউন্ট জুলিয়ানের যুবতী কন্যা ফ্লোরিন্ডার সতীত্ব হরণ করেছিল। যাকে তার পিতা জুলিয়ান মাতার অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সম্রাট নিজেকে সামলে উঠে বসলেন। তিনি বললেন, তোমরা তো ভালো কথাই মনে করেছ। তার পিতা সেই যে তাকে নিয়ে গেল আর তো নিয়ে এলো না। না জানি তার মা কেমন আছে।

তরুণী : শুনেছি পুরো ব্যাপারটাই নাকি একটি অজুহাত।

সম্রাট (বিস্ময়ের স্বরে) : অজুহাত! তুমি কি করে জানলে?

তরুণী : ফোরিন্ডা তার সখী রাহীলের কাছে বলেছিল।

সম্রাট : রাহীল আবার কে?

তরুণী : সে তরুণী আবার আজ ক'দিন যাবত নিখোঁজ।

সম্রাট : রাহীল এ কথা কার কাছে বলেছে?

তরুণী : নিখোঁজ হওয়ার দিন রাহীলই আমাকে কথাটি বলেছিল। আমি ভেবেছিলাম, রাহীলকে পাওয়া গেলে তাকে আপনার কাছে হাজির করে কথাটি বলব; কিন্তু সেই যে নিখোঁজ হলো আর পাওয়া গেল না। তাই আমি একাই কথাটি জাহাঁপনাকে জানালাম।

সম্রাট : কিন্তু সে এত অজুহাত দেখালো কেন?

তরুণী : রাহীল বললো, ফ্লোরিন্ডার সব ঘটনা পিতাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল এবং তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। সে প্রেক্ষিতে একটি অজুহাত দেখিয়ে পিতা তাকে নিয়ে যায়।

সম্রাট রডারিক এ কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত হয়ে গেলন। তিনি কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন, এমনি মুহূর্তে এক পরিচারিকা এসে কক্ষে প্রবেশ করে কুর্নিশ করে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। সম্রাট তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ব্যাপার? পরিচারিকাটি একটি চিঠি বের করে বলল, জাহাঁপনা! প্রাসাদরক্ষীদের প্রধান এ চিঠিটি আমার কাছে দিয়েছে।

চিঠিটি সম্রাটের হাতে অর্পণ করা হলো। তিনি চিঠিটি খুলে নিচে জুলিয়ানের নাম দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তোমাদের সকল ধারণা মিথ্যা। দেখ, জুলিয়ান চিঠি লিখেছে। হয়ত ফ্লোরিন্ডার মা এখনো সুস্থ হয়ে উঠেনি। তাই চিঠি দিয়েছে। একথা বলেই রডারিক চিঠিখানা পড়তে লাগলেন-

পাপিষ্ঠ রাজা রডারিক,

তুমি আমার কন্যার সতীত্ব নষ্ট করে গথ রাজবংশকে অপমানিত করেছ। জেনে রেখো আমি এর প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবো না। যতদিন পর্যন্ত তোমার রাজপ্রাসাদ ধূলিস্যাৎ না হবে আর তুমি সিংহাসনচ্যুত না হবে ততদিন আমি

নিশ্চিন্ত হতে পারব না। মনে পড়ে, ফ্লোরিন্ডাকে নিয়ে আসার সময় তুমি আমার সাথে পথ চলতে চলতে তোমার জন্য বিশেষ ধরনের শিকারী বাজপাখি পাঠানোর অনুরোধ করেছিলে?[৬] এখন আমি এমন এক ধরনের বাজপাখি নিয়ে এসেছি, যারা তোমার প্রজা ও রাজ্য একসাথে খেয়ে ফেলবে।

বলব কি, সে শিকারী বাজপাখি কারা? তাঁরা হচ্ছেন মুসলিম মুজাহিদ। তাঁরা এমন এক জাতি, যেখানেই তাঁদের পদার্পণ ঘটেছে সেখানেই তাঁদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। তাঁরা এখন তোমার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমনকি থিওডমিরকে পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য করেছে। অপেক্ষা কর, তোমার পাপের শাস্তি অত্যাসন্ন।

ইতি
কাউন্ট জুলিয়ান

রডারিক চিঠিটি পড়ছিলেন আর রাগে তার চেহারা লাল হয়ে উঠছিল। পড়া শেষ করে চিঠির বাহক পরিচারিকাকে নির্দেশ দিলেন প্রাসাদ-রক্ষীদের প্রধানকে ডেকে আনতে। পরিচারিকা চলে গেলে সম্রাট রাগে ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। সম্রাটের এ অবস্থা দেখে অন্য পরিচারিকারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ল। কারো মুখে রা নেই। সবাই নীরব, নিথর। কিছুক্ষণ পর সামরিক পোশাকধারী এক জওয়ান এসে উপস্থিত হলো। সে নতজানু হয়ে সম্রাটকে কুর্নিশ জানালো। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো এ পত্র কার?

প্রধান : জী না জাহাঁপনা!

সম্রাট : কে তা নিয়ে এসেছিল?

প্রধান : একজন অশ্বারোহী দূত।

সম্রাট : কতক্ষণ আগে চিঠিখানা দিয়ে গেছে?

প্রধান : তা অনেকক্ষণ আগে।

সম্রাট : তুমি তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা পৌছালে না যে?

প্রধান : আমাকে জানানো হয়েছিল, আপনি বিশ্রামে আছেন।

সম্রাট : দূত আর কিছু বলেনি?

প্রধান : কিছু বলেনি জাহাঁপনা! চিঠিটা দিয়েই চলে গেল।

সম্রাট : শয়তানটা বেঁচে গেল! ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।

---

৬. সম্রাট রডারিক কাউন্ট জুলিয়ানের কাছে এক ধরনের শিকারী বাজপাখি পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন (তারীখে আন্দালুস)। –লেখক

রক্ষীদের প্রধান চলে গেল। সম্রাট এবার নতুন সমস্যায় পড়লেন। চিন্তায় মাথা ঘুরতে লাগল। এমন সময় কয়েকজন পরিচারিকা এসে ভেতরে ঢুকল। রডারিক জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই?

তারা জানালো, রানি আসছেন।

রানির আগমনবার্তা শুনে সম্রাট আরো ঘাবড়ে গেলেন। রানি যাতে চিঠিটি দেখতে না পায়, সে জন্য অস্থিরভাবে তা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু চিঠিটি তখন আর খুঁজে পেলেন না। ইতোমধ্যে রানি এসে গেলেন। সম্রাট দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানালেন। রানি তাগড়া যুবতী। বয়স বড় জোর বিশ কি বাইশ। খুবই সুন্দরী। গোলগাল চেহারা, প্রশস্ত ললাট, ডাগর ডাগর কালো কালো চোখ, উঁচু নাক, আপেলের মতো গণ্ডদেশ। সাক্ষাৎ সৌন্দর্যের প্রতিমা। পরনে দামী রেশমী পোশাক; শরীর জুড়ে হীরা-জহরতের অলঙ্কার আর গলায় মোতির হার তাকে আরো সুন্দর করে তুলেছিল। নাম নায়লা। সারা দেশে তার সৌন্দর্যের খ্যাতি প্রসিদ্ধ। স্মিত হেসে রানি একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। সম্রাটকে লক্ষ্য করে বললেন, শুনলাম আপনি নাকি বিস্ময়কর গম্বুজটি খুলতে যাচ্ছেন।

সম্রাট : হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ।

নায়লা : কিন্তু সেটি না খুললেই কি নয়?

সম্রাট : গম্বুজটি সম্পর্কে অনেক কল্পকাহিনি ও লোকভীতি প্রচলিত বলেই আমি সেটি খুলতে চাই ।

নায়লা : গম্বুজটি সম্পর্কে যে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে?

সম্রাট : সেগুলো এজন্যই যাতে কেউ তা খুলতে সাহসী না হয় এবং এতে লুকানো সম্পদ নিতে না পারে।

নায়লা : তবে কি এতে সম্পদ আছে?

সম্রাট : নিশ্চয়ই, তাতে সম্পদ আছে।

নায়লা : আমার তো ধারণা, এটা কল্পনা মাত্র।

সম্রাট : তুমি দেখে নিও, এতে বহু মূল্যবান সম্পদ আছে।

নায়লা : আমার মন বলছে, গম্বুজটি না খুললেই ভালো।

সম্রাট : হ্যাঁ, আমি তোমার কথাই মেনে নিতাম। কিন্তু দরবারে ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে আর সবাই তা জেনেও ফেলেছে। এমতাবস্থায় খোলা না হলে লোকে আমাকে কাপুরুষ ভাববে। আর তুমিও নিশ্চয় তা চাও না?

নায়লা : ঠিক আছে, তুমি যা ভালো মনে কর তাই করো।

এই বলে রানি বিছানার দিকে তাকালেন। কাউন্ট জুলিয়ানের চিঠিটি বালিশের কাছে পড়ে ছিল। সম্রাট তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নায়লা সে দিকে তাকিয়ে রহস্যের ভঙ্গিতে বললেন, এ চিঠি আবার কার?

এ কথা শুনে সম্রাটের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে চিঠিটি নিতে হাত বাড়ালেন। ইতোমধ্যে রানি চিঠিটি হাতে নিয়ে ফেলেছেন। তাতে রডারিক আরো ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, চিঠিটি আমায় দাও। এটি তোমার দেখার মতো নয়।

রানি নায়লা অপমানিত বোধ করলেন। তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, আমি অবশ্যই এটি দেখবো।

সম্রাটের চেহারা লজ্জা ও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি একদৃষ্টিতে রানির চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চৌদ্দ. সামরিক চুক্তি

রানি চিঠিটি খুলে ফেলেছেন, কিন্তু তখনো পড়েননি। সম্রাট অনুনয়ের সুরে বললেন, প্রেয়সী আমার, তুমি পত্রটি পড়ো না। কিন্তু মানুষের স্বভাব হলো যা থেকে নিষেধ করা হয় তার প্রতিই অধিক আগ্রহ বোধ করে। সম্রাট পত্রটি পড়তে যতই নিষেধ করছিলেন, রানির আগ্রহ ততই বেড়ে যাচ্ছিল। রডারিকের দুশ্চরিত্র সম্পর্কে নায়লা নানারকম কথা শুনেছিলেন কিন্তু এর কোনো প্রমাণ তিনি পাননি। চিঠিটির ব্যাপারে তার মনে নানারকম সন্দেহের সৃষ্টি হলো।

রডারিক রানি নায়লাকে ভয় করতেন। কারণ তৎকালীন স্পেনের পাদরিদল ছিল নায়লার খুবই অনুগত। সে সময় স্পেনে পাদরিদের অনেক তৎপরতা ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যেও ছিল তাদের বিপুল প্রভাব। এমনকি শাসকদের উত্থান পতনেও পাদরিদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাই রাজার আইন-কানুন পাদরিদের রীতিনীতিতে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে পারতো না।

রডারিকের আগে স্পেনের সম্রাট ছিলেন গথ বংশোদ্ভূত ডনরা। এই গথিকরা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জাতি। তারা রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল। মূলত তারা ছিল এশিয়ান। গথিকরা আবার দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল। একটি পরিচিত ছিল 'প্রাচ্য গথ' নামে। তারা ইতালি দখল করেছিল। অপরটি 'পাশ্চাত্য গথ' নামে পরিচিত ছিল। তারা স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ডনরা ছিলেন পাশ্চাত্য শাখার অন্তর্ভুক্ত।

সম্রাট ডনরা ছিলেন অতিশয় দয়ালু ব্যক্তি। তিনি সকল প্রজাকে সমান চোখে দেখতেন। তার কাছে ইহুদি খ্রিষ্টানের কোনো পার্থক্য ছিল না; কিন্তু পাদরিদের কাছে তা পছন্দ হতো না। তারা ইহুদিদের অত্যন্ত হীন চোখে দেখতো এবং তার ওপর নানা প্রকার অসম্মান অবিচার চালাতো। এই নিয়ে পাদরিদের সঙ্গে ডনরার বিবাদ বাধে এবং পাদরিরা ডনরাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেষ্টা করে। পাদরিরা অভিযোগের ধোঁয়া তুলে, সম্রাট ডনরা ইহুদিদের পক্ষপাতপুষ্ট। অতএব স্পেনের শাসন ক্ষমতায় তার অধিষ্ঠিত থাকার কোনো অধিকার নেই। এই বলে তারা ডনরাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাদের সহায়তায় রডারিক দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। পাদরিদের সংঘটিত করতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রডারিকের স্ত্রী নায়লা। তাই তিনি ছিলেন পাদরিদের একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি। এ কারণে রডারিকের মনে ভয় ছিল, নায়লা ক্ষেপে গেলে পাদরিদের সহায়তায় তিনি যে কোনো সময় রডারিককে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন।

রডারিকের নিষেধের উত্তরে নায়লা রাগত কণ্ঠে বললেন, আমি এটা পড়ব। আমি নিশ্চয়ই পড়ব।

রডারিক : কিন্তু তাতে যে তুমি কষ্ট পাবে।

নায়লা : তা আমি জানি।

রডারিক : তাহলে জেনে শুনে দুঃখ বাড়ানো কি ঠিক হবে?

নায়লা : কিন্তু আমি যে বাধ্য।

রডারিক : এতে তোমার বাধ্য হওয়ার কি আছে?

নায়লা : আচ্ছা বলো দেখি চিঠিটি কার?

রডারিক : কাউন্ট জুলিয়ান লিখেছে।

নায়লা : কি লিখেছে?

রডারিক : তা বলতে পারলে তো আর পড়তে নিষেধ করতাম না।

নায়লা : শোনো, ফ্লোরিন্ডা যখন থেকে প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে তখন থেকেই আমি অত্যন্ত অস্থিরতায় সময় কাটাচ্ছি।

রডারিক : কারণ তাকে ভুলতে পারছ না। তাই খারাপ লাগছে।

নায়লা : সে সুন্দরী সাধ্বী, তাকে ভোলা যায় না। তবে আমার অস্থিরতা অন্য কারণে।

রডারিক : কী সেই কারণ?

নায়লা : আমার সন্দেহ, তুমি তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিলে তাই সে এখান থেকে চলে গেছে।

রডারিক কি বলবে ভেবে পাচ্ছেন না। তার অপকর্মের প্রমাণ তখন নায়লার হাতে। মিথ্যা বললে, নায়লা চিঠিটি পড়ে আসল ঘটনা জেনে ফেলবে। আর সত্য কথাও নিজ মুখে বলা যাচ্ছে না।

নায়লা : চুপ করে রইলে যে, তবে কি আমার সন্দেহ সত্য?

রডারিক : সেসব কথা এখন থাক। চিঠিটি যদি আমাকে দিয়ে দাও তবে আমি অঙ্গীকার করছি, বিস্ময়কর গম্বুজটি খুলবো না।

নায়লা (হেসে) : গম্বুজটি খুললে আমার ক্ষতি কিসের! আর না খুললেই বা আমার কী লাভ!

রডারিক : চিঠিটি পড়লেও তোমার কোনো লাভ হবে না।

নায়লা : চিঠিটি পড়তে যেভাবে নিষেধ করা হচ্ছে, তাতে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে যাচ্ছে। চিঠিটি সম্পর্কে প্রথমে যখন আমি জানতে চেয়েছিলাম তখন খোলাখুলি উত্তর দিয়ে ফেললে হয়তো আমি পড়ার কথা চিন্তাও করতাম না।

রডারিক : আমারই ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করো।

নায়লা : তাহলে ভুলের মাশুলের জন্য অপেক্ষা করো।

এ কথা বলেই নায়লা চিঠিটি পড়তে লাগলেন। রডারিক বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি আবার বললেন, বেগম সাহেবা, চিঠিটি তুমি পড়ো না!

নায়লা রাগত স্বরে বললেন, চুপ করো। আমি যা সংকল্প করেছি তা করবোই। রডারিক আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। তিনি নায়লার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নায়লা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে চিঠিটি পড়ছিলেন।

নায়লা চিঠিটি পড়ছিলেন, তার চেহারা ক্রমে ক্রমে রক্তবর্ণ ধারণ করছিল। তার চোখ থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছিল। অপর দিকে রডারিকের চেহারা লজ্জা ও শঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে গেল। নায়লার চিঠি পড়া শেষ হলো।

নায়লা রাগ সংবরণ করে পরিচারিকাদের কক্ষ ত্যাগ করতে ইঙ্গিত করেন। তারা অবনত মস্তকে চলে গেল। এখন সে কক্ষে কেবল নায়লা আর রডারিক। নায়লা কর্কশ সুরে রডারিককে বললেন, তোমার অপকর্মের প্রমাণের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয়?

রডারিক সাহস হারালেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, তাকে অবশ্যই এক কঠিন সত্যের মোকাবিলা করতে হবে। তিনি চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে বললেন, এ জন্যই তো চিঠিটি পড়তে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। কারণ জুলিয়ান এতোটাই চতুর লোক যে, আমাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সে এ ষড়যন্ত্র করেছে। এটা তো নিছক ষড়যন্ত্র মাত্র।

নায়লা : তাতে কি তার সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে না।

রডারিক : তা তো নিশ্চয়ই, তবে জুলিয়ান সুনামের চাইতে স্বার্থটাকেই বড় করে দেখেছে।

নায়লা : এতে তার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

রডারিক : পদচ্যুত রাজা ডনরা যে জুলিয়ানের শ্বশুর এটা তুমি কি ভুলে গেছ। সে ষড়যন্ত্র করে ডনরাকে আবার ক্ষমতাসীন করতে চাচ্ছে। অবশ্য তার চালটা এতোই গভীর যে, তাকে বুঝতে হলে একটু ভাবতে হবে।

নায়লা : কিন্তু কিছু একটা না হলে কি নিজের মেয়ের নামে কেউ এমন বলতে পারে?

রডারিক : শত্রুতাই যার উদ্দেশ্য, তার কাছে অন্য সব কিছুই গৌণ।

নায়লা কিছুটা দমে গেলেন। রডারিক বুঝতে পারলেন, চালাকিটা অনেকটা কাজে এসেছে। রডারিক আবার অনুনয়ের সুরে বললেন, আমায় বিশ্বাস করো

প্রিয়তমা! আমি সত্য কথা বলছি। এজন্যই আমি চিঠিটি পড়তে বারণ করেছিলাম। কারণ আমার মনে হচ্ছিল, তুমি হয়তো জুলিয়ানের চাল বুঝতে পারবে না। আর মেয়েরা তো স্বভাবতই সন্দেহপ্রবণ।

নায়লা : আমি ফ্লোরিন্ডাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

রডারিক : ঠিক আছে। তুমি তাকেই জিজ্ঞেস করো। এটা অবশ্য ভাবনার বিষয় যে, যদি এমন কিছু হয়েই থাকতো তবে ফ্লোরিন্ডা এখান থেকে যাওয়া তো দূরের কথা; আমার অনুমতিই পেতো না।

নায়লা : আমি এখন কিছুই বলছি না, তবে এর সত্যতা অবশ্যই যাচাই করব।

রডারিক : আমার অভিমতও তাই। বিষয়টির যাচাই হওয়াই উচিত, তবে তা অবশ্যই গোপনে হতে হবে। অনথায় আমার অসম্মানের কারণ হবে।

নায়লা : আমি সবই বুঝি।

রডারিক : ভুলে যেও না, জুলিয়ান আমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য মুসলমানদের ডেকে এনেছে। সে হয়তো মুসলমানদের সাথে কোনোরকম চুক্তি করেছে।

নায়লা : হ্যাঁ, এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

রডারিক : আমি মুসলমানদের প্রতিহত করে জুলিয়ানকে উচিত শিক্ষা দেবো।

নায়লা : এ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই।

রডারিক : তোমাকে একটি অঙ্গীকার করতে হবে।

নায়লা : কী সেটা?

রডারিক : যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি নীরব থাকবে।

নায়লা : এক শর্তে আমি তাতে রাজি আছি।

রডারিক : কী সেই শর্ত?

নায়লা : তোমাকে অঙ্গীকার করতে হবে, তুমিও আর কখনো কোনো মেয়েকে উত্ত্যক্ত করবে না।

রডারিক : আমি অঙ্গীকার করছি, আর কখনো এমনটি হবে না।

নায়লা : তাহলে আমিও নীরব থাকব।

রডারিক : আমি এ জন্য কৃতজ্ঞ যে, বিষয়টির নিষ্পত্তি হলো।

নায়লা : এখনো কৃতজ্ঞতার সময় আসেনি।

রডারিক : কেন?

নায়লা : আমি বিষয়টির সত্যতা যাচাই করব। যদি সত্য হয়, তবে...।

সম্রাট রডারিক রানি নায়লার চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাতে তখনও রাগের চিহ্ন বিদ্যমান। নায়লার কথা শেষ হতে না হতেই রডারিক বললেন- তাহলে তুমি আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে?

নায়লা : নিশ্চয়ই করব।

রডারিক : আমি এর জন্য প্রস্তুত।

নায়লা : ঠিক আছে, চুক্তি আপাতত এ পর্যন্তই।

নায়লা চলে গেলেন। রডারিক আর কিছু বলার মতো সাহস পেলেন না। শুধু তার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নায়লা চলে গেলে রডারিক স্বস্তির শ্বাস ফেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

[illegible] রহস্যের গম্বুজ

সম্রাট রডারিক সারা রাত খুবই অস্থিরতায় কাটালেন। রাতে কোনো কিছু খাননি, ভালো ঘুমও হয়নি। তিনি ভাবতে লাগলেন, গম্বুজটি খোলার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকেই যেন তার ওপর নানারকম বিপদাপদ আসা শুরু হয়েছে। কিন্তু জেদের বশবর্তী হয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা থেকে বিরত থাকাও সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি গম্বুজটির খোলার সিদ্ধান্তেই অটল থাকলেন। পরদিন সকালেই তিনি তার উপদেষ্টাবৃন্দ, মন্ত্রী পরিষদ ও কয়েকজন সৈনিককে ডেকে পাঠালেন।

দেশজুড়ে সাড়া পড়ে গেল রাজা গম্বুজটি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্মাণের পর থেকে এ যাবৎ গম্বুজটি কখনো খোলা হয়নি। এমন কি রোমান সম্রাট কায়সারও তা খোলার সাহস করেননি। ইতিপূর্বে যারাই সেটা খোলার চেষ্টা করেছে, তারাই হয়তো মৃত্যুবরণ করেছে, নয়তো অন্য কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়েচে। সুতরাং রডারিক কর্তৃক গম্বুজটি খোলার সিদ্ধান্তে দেশবাসীর মধ্যে এক প্রকার আতঙ্ক দেখা দিল। সকলেই ভাবতে লাগল, এই বুঝি দেশে কোনো মহাবিপদ নেমে আসছে।

এদিকে যে সৈনিক থিওডমিরের চিঠি নিয়ে সম্রাটের দরবারে এসেছিল, সে শহরের দু-চারজনের কাছে মুসলমানদের আগমন ও খ্রিষ্টানদের শোচনীয় পরাজয়ের কথা প্রকাশ করে দিয়েছিল। পরবর্তী সময় তারা অন্যদের কাছেও এ ঘটনা বর্ণনা করে। ফলে শহরবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

জনতার ধারণা হলো, গম্বুজ খোলার সিদ্ধান্তের ফলেই এসব নতুন নতুন সমস্যা আপতিত হচ্ছে এবং স্পেনবাসীর ওপর নানারকম বিপদ নেমে আসছে।

সম্রাট রডারিক যাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তারা সবাই এসে হাজির হলো। সম্রাট শাহী পোশাক পরিধান করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে গম্বুজের দিকে এগুতে লাগলেন। সঙ্গে যারা যাচ্ছিল, তারা সবাই ছিল অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত। দেখে মনে হচ্ছিল, মৃত্যু গহবরের দিকে তাদের টেনে নেয়া হচ্ছে। সকলেই নীরব, নিথর। কারো মুখে টু শব্দটিও নেই। সকলেরই কামনা ছিল, রাজা যদি এ কাজটি থেকে বিরত থাকতেন! কিন্তু সবাই জানতো, সম্রাট একবার যা করতে মনস্থ করেন তা থেকে কখনো বিরত হন না। ফলে কেউ তাকে বারণ করার সাহস করেনি, সবাই চুপচাপ তার পিছনে হেঁটে গেল। সৈন্যদল সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের দেখে অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায়

শহরবাসীর বুক ঢিপঢিপ করছে। ধীরে ধীরে সৈন্যদের মিছিল রাজধানী থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করল।

সকলের পরনে দামী রেশমী পোশাক। সূর্যালোকের প্রতিফলনে ঝলমল করছে। একসময় গম্বুজটির চূড়া তাদের দৃষ্টিগোচর হলো; কিন্তু সূর্যালোকের প্রতিফলনে সে দিকে ভালোভাবে তাকানো যাচ্ছিল না।

গম্বুজটি পাহাড়ের উঁচু টিলায় অবস্থিত। শাহী মিছিল পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। তারা গম্বুজটির যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল তাদের মন ভয়ে ততোই আড়ষ্ট হয়ে আসছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা একটি লম্বা সরুপথে প্রবেশ করল। ঘোড়ার খুরের শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যে তারা সরুপথটি অতিক্রম করে চূড়ায় গিয়ে পৌঁছাল। সেখানেই সেই রহস্যময় গম্বুজটির অবস্থান।

তারা ধীরে ধীরে গম্বুজটির সামনে উপস্থিত হলো। গম্বুজের চারিদিকে ছোটবড় অনেকগুলো টিলা। সর্বোচ্চ টিলায় গম্বুজটি নির্মিত। ঘোড়া নিয়ে টিলার ওপর উঠা সম্ভব নয়, তাই পূর্বেই ঘোড়া ছেড়ে এসেছিল। সবাইকে নিয়ে গম্বুজের কাছে গেলে সম্রাট রডারিক দেখতে পান, এর দেয়াল মর্মর প্রস্তরে নির্মিত, সূর্যালোকে এগুলো চিকমিক করছে।

তারা গম্বুজের দেয়ালে একটি উপদেশ লিখিত দেখতে পেলেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও সেটি অক্ষত অবস্থায় আগন্তুকদের দৃষ্টি আকর্ষণ কওে চলছে। রডারিক বাণীটি পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল, ‘যে অন্যদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে, সে অবশ্যই কষ্ট ও অশান্তিতে পতিত হয়।’ বাণীটি পাঠ করে সম্রাট রডারিক অবনত মস্তকে ভাবতে থাকেন। তার মনে পড়ে যায় বৃদ্ধ পাদরির কথা। তিনি এসে রাজাকে গম্বুজটি খুলতে বারণ করেছিলেন; কিন্তু রডারিক তার কথা শুনেনি। বৃদ্ধ সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

সম্রাট আরেকটু এগিয়ে গিয়ে আরো একটি উপদেশ উৎকীর্ণ দেখতে পেলেন। তাতে লেখা, ‘জেদ হলো আত্মম্ভরিতা। আর আত্মম্ভরিতা হলো ধ্বংসের মূল।’

সম্রাট ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মনস্থ করলেন, আর কোনো উপদেশ তিনি দেখবেন না; কিন্তু প্রকৃতির বিধান যা মানুষ দেখতে চায় না, তাকে তা-ই দেখতে হয়। কোনো উপদেশের দিকে তাকানোর তার আদৌ ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু এক অজ্ঞাত শক্তি যেন তার চোখ সেদিকে টেনে নিয়ে গেল। আরো একটি উপদেশ তার দৃষ্টিগোচর হলো। তাতে লেখা ছিল, ‘যে শাসক তার হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ কানে নেয় না, সে নিজ হাতেই নিজের কবর রচনা করে।’

রডারিকের মনে কাঁপুনির সৃষ্টি হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, যদি ফিরে যাওয়া যেতো। পরক্ষণেই তার খেয়াল হলো এমতাবস্থায় ফিরে গেলে প্রজারা তাকে কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। অবচেতন মনেই তিনি গম্বুজের দরজার দিকে এগুতে লাগলেন।

তার সঙ্গীরাও উপদেশগুলো পড়ছিল। তারা আশায় ছিল, এসব পড়ে সম্রাটের বোধোদয় হবে। তিনি তার সিদ্ধান্ত মূলতরি ঘোষণা করবেন; কিন্তু কেউই মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস করলো না।

পরিশেষে তারা ফটকের সামনে গিয়ে পৌছল। দেখতে পেলো, ফটকটি খুব উঁচু এবং প্রশস্ত। মনে হচ্ছে এক বিরাট পাথর কেটে তা তৈরি করা হয়েছে এবং নানারকম নকশা করা হয়েছে। ফটকের কড়াটি লোহার। তাতে অতীতের অনেক রাজা-বাদশাহদের নামে তালা ঝুলানো। তালাগুলোর অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এগুলো বহুকাল না খোলায় মরচে পড়ে গেছে।

সম্রাটকে দেখে বৃদ্ধ রক্ষী দুজন মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করল। তারা সোজা হয়ে দাঁড়ালে সম্রাট তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'চাবিগুলো কি পরিষ্কার করা হয়েছে?'

একজন বৃদ্ধ উত্তর দিল, জী হ্যাঁ, গতকাল সারা দিনে আমরা এ কাজেই ছিলাম। কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে।

সম্রাট : আর তালাগুলো...?

এক বৃদ্ধ : সেগুলো পরিষ্কারের সুযোগ হয়নি জাহাঁপনা!

সম্রাট : তোমরা বড় ভুল করেছ। তোমরা একা পারবে না বলে আমাকে জানালেই পারতে। আমি আরো লোক পাঠিয়ে দিতাম।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : আমরা মনে করেছিলাম, আপনি হয়তো আরো ভেবেচিন্তে আপনার সিদ্ধান্ত মুলতবি ঘোষণা করবেন।

সম্রাট : তোমাদের জানা উচিত, হাকিম নড়ে তো তার হুকুম নড়ে না।

প্রথম বৃদ্ধ : মহামান্য সম্রাট গম্বুজটি খোলা যে খুবই কষ্টকর ও বিপজ্জনক।

সম্রাট : এসব স্রেফ পাগলামি। কোনো ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : দেশবাসীর প্রতি সদয় হোন জাহাঁপনা!

সম্রাট : ঘাবড়িও না। ভয়ের কোনো কারণ নেই।

প্রথম বৃদ্ধ : আমার যে বুক কাঁপছে জাহাঁপনা!

সম্রাট : তোমরা বৃদ্ধ বলে এমন হচ্ছে। তা ছাড়া তোমরা ভবিষ্যদ্বাণীটি অন্ধভাবে বিশ্বাস করছ।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণীই যে সত্য প্রমাণিত হয় জাহাঁপনা!

সম্রাট : আমি তা বিশ্বাস করি না।

মন্ত্রী : কিন্তু জাহাঁপনা...

সম্রাট : তুমি আবার কী বলতে চাও?

মন্ত্রী : আমি বলতে চাই, ফটকটি খুললেই ভালো।

সম্রাট : ভারী বিস্ময়ের কথা তো! তুমি কি আমার স্বভাব জানো না?

মন্ত্রী : আপনি তো উপদেশগুলো দেখেছেন জাহাঁপনা।

সম্রাট : দেখেছি। এগুলো এজন্যই লেখা হয়েছে, যাতে খুলতে আগ্রহী কোনো ব্যক্তি এসব দেখে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে।

এরপর আর কেউ কোনো কথা বলতে সাহস করল না।

সম্রাট বললেন, রক্ষীদের কাছ থেকে চাবিগুলো নাও এবং তালা খোলার ব্যবস্থা কর।

মন্ত্রী (ভীত স্বরে) : ঠিক আছে তাই হোক।

এই বলে তিনি রক্ষীদের থেকে চাবি নিলেন; কিন্তু নিজে খোলার সাহস পেলেন না। কয়েকজন সিপাইকে ডেকে তালা খোলার নির্দেশ দিলেন। তারা তালা খুলতে শুরু করে। মরচে পড়ে যাওয়ায় সেগুলো সহজে খোলা যাচ্ছিল না; কিন্তু সিপাহিরা আদেশ পালনে বাধ্য। তাই তারা মরিচা পরিষ্কার করে আস্তে আস্তে তালাগুলো খুলতে লাগল।

একেকটি তালা খুলতে প্রচুর সময় লাগছিল। ফলে কয়েকটি তালা খুলতেই প্রায় সারাদিন লেগে গেল। সম্রাট কাছে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে এলো। আর মাত্র একটি তালা বাকী। কয়েকজন সিপাই সে তালাটিও খুলে দিলো। সম্রাট রডারিক এগিয়ে গিয়ে সঙ্গীসাথিদের নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

ষোল. গম্বুজের গোপন রহস্য

গম্বুজের দ্বারা খুলে দেয়া হলে ভেতর থেকে এক প্রকার বদ্ধ হাওয়া বেরুতে লাগল। ফলে রডারিক ও তার সঙ্গী সাথিরা একটু সরে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর তারা ভেতরের দিকে এগুতে লাগলেন। প্রথমে তারা একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করেন। কক্ষটি দীর্ঘকাল খালি পড়ে থাকায় প্রচুর ধুলোবালি জমে গিয়েছিল। তারা সামনে এগিয়ে গেলেন এবং ভেতরের দরজা দিয়ে অপর একটি কক্ষে প্রবেশ করেন।

সে কক্ষে একটি বিরাটকায় প্রতিমা দাঁড়ানো। চোখ থেকে যেন আগুন ছিটকে পড়ছে। হাতে একটি ভারী হাতুড়ি। তা দিয়ে অবিরত মাটি ওপর আঘাত হেনে চলছে।

প্রতিমাটি এতো উঁচুতে যে, তার দুপায়ের মাঝখানে একটি উঁচু দরজা আছে, যার ভেতর দিয়ে যে কোনো বিরাটাকায় মানুষ সহজেই আসা যাওয়া করতে পারবে।

প্রতিমাটির অপর পাশেই আরেকটি দরজা, যার পেছনেই একটি কক্ষ ছিল; কিন্তু প্রতিমাটির জন্য সেদিকে এগুনো যাচ্ছিল না। কারণ ভারী হাতুড়িধারী প্রতিমাটির কাছ দিয়ে যেতে কারো সাহস হচ্ছিল না। তা ছাড়া কোনো বিকল্প পথ না থাকায় তারা এগুতেও পারছিলেন না। কক্ষটিতে লাল বর্ণে লেখা, 'আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছি।' রডারিক বাক্যটি পাঠ করে বললেন, হে প্রতিমা! আমি কেবল গম্বুজটির রহস্য জানতে এসেছি, এর কোনোরূপে অবমাননা বা ক্ষতি করতে আসিনি, কিন্তু প্রতিমার কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া বুঝা গেল না। সে যথারীতি নিজের কাজেই লিপ্ত থাকল।

রডারিক আরেকটু এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ নিচে থাকা একটি হুকে তার পা পড়ে গেল। অমনি প্রতিমাটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রডারিক একটু পিছিয়ে এলেন। প্রতিমাটির আর কোনোরূপ নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল না। সেটি সোজা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। দুহাতে হাতুড়ি এমনভাবে ধরা যেন হামলা করতে উদ্যত। অবস্থাটি রডারিক ও তার সঙ্গীদের কাছে খুবই ভয়ঙ্কর মনে হলো। প্রতিমাটির চোখ দুটি গনগনে লাল, যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে।

রডারিক ও তার সঙ্গীরা ভয়ে ভয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। মনে আশঙ্কা, প্রতিমাটি এখনই হাতুড়ি দিয়ে তাদের ওপর আঘাত হানবে। কিন্তু কোনোরূপ নড়াচাড়া লক্ষ্য করা গেল না। সবাই প্রতিমার পায়ের নিচের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অপরদিকের কক্ষে প্রবশে করলেন।

যে কক্ষে তারা প্রবেশ করলেন তার দেয়াল মর্মর পাথরখচিত এবং ছাদ সাদা গোলাকার। দেয়ালে অনেক মূল্যবান পাথর বসানো।

কামরার মাঝখানে একটি টেবিল। যা খোদ সম্রাট হিরাক্লিয়াসের তৈরি। এটি প্রাচীন শিল্পরীতির একটি উত্তম নিদর্শন। টেবিলটি খুবই সুন্দর ও মসৃণ। টেবিলের ওপর একটি ছোট সিন্দুক বসানো। যাতে একটি লাইন উৎকীর্ণ, 'এ গম্বুজের সকল রহস্য এ বাক্সে সংরক্ষিত।'

রডারিক বললেন, এই ছোট সিন্দুকই কি তবে সকল রহস্যের আধার?

মন্ত্রী বললেন, এতে তো কিছু আছে বলে মনে হয় না।

রডারিক তার দিকে তাকিয়ে বললেন, এতো সহজেই কি করে বুঝে ফেললে? আগে সিন্দুকটি খুলতে দাও। আমার তো মনে হয়, এতে অনেক কিছুই বন্দী আছে।

বলেই রডারিক আবার সিন্দুকটির দিকে তাকালেন। লাইনটির নিচে একটি ছোট করে লেখা আরেকটি লাইনের প্রতি তার দৃষ্টি গেল। রডারিক লেখাটি পড়লেন। তাতে লেখা, 'কেবল একজন সম্রাটই সিন্দুকটি খোলার সাহস করবে; কিন্তু তাকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে, কারণ এর ভেতর এমন সব ঘটনা দৃষ্টিগোচর হবে, যা কারো মৃত্যুর পূর্বে দৃষ্ট হয়।' লেখাটি পাঠ করে রডারিকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। মন্ত্রী পাশেই ছিলেন। তিনিও লেখাটি পড়েছিলেন। কম্পিত হৃদয়ে তিনি সম্রাটকে বললেন এখানেই ক্ষান্ত হোন জাহাঁপনা, সিন্দুকটি মনে হয় না খোলাই ভালো।

রডারিক বললেন, এখন কি আর বাকী রইল, গম্বুজও খোলা হলো। এখন তো কেবল এ সিন্দুকটিই বাকী।

মন্ত্রী : এর ভেতরেই তো সকল রহস্য বন্দী।

রডারিক : আমি তো সে রহস্যই জানতে চাইছি।

একথা বলেই তিনি সিন্দুকটি খুলে ফেললেন। সিন্দুকটির ভেতরে তিনি দেখতে পেলেন, তাতে চামড়ার একটি লম্বা ফিতা রয়েছে। ফিতাটি লোহার হুকের সঙ্গে পেঁচানো এবং ফিতার উভয় পাশে তামার পাত লাগানো।

সে ফিতায় সৈনিকদের ছবি অংকিত রয়েছে তারা তলোয়ার, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তাদের চেহারা ছিল খুবই উজ্জ্বল ও ধবধবে। ফিতার উপরিভাগে লেখা ছিল, 'রে হতভাগা সম্রাট! তাদের দিকে লক্ষ্য কর যারা তোমাকে পদচ্যুত করে তোমার রাজ্য দখল করে নেবে।' সম্রাট বাক্যটি পাঠ করে আঁতকে উঠলেন। তিনি মন্ত্রীর দিকে তাকালেন। মন্ত্রীও বাক্যটি পড়েছিলেন এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য রাজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। উভয়ের দৃষ্টি

এক হয়ে গেলে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার ফিতার দিকে দৃষ্টি দিলেন। তারা লক্ষ্য করেন, ফিতাটি দ্রুত ঘুরছে। এক সময় ফিতায় একটি মাঠ দেখা গেল এবং বহু লোকের শোরগোল শোনা গেল। আকাশে ঘন মেঘ দেখা দিল এবং মাঠ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। অন্ধকার দূরীভূত হলে অশ্বারোহীদের দৌড়াদৌড়ি লক্ষ্য করা গেল। দেখা গেল, ক্রমেই ময়দানটি একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। একদিকে খ্রিষ্টান সৈন্যরা স্পেনের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অপর দিকে ঢিলেঢালা পোশাক ও পাগড়ী পরিহিত কিছু লোক। তাদের মুখে লম্বা দাড়ি এবং চেহারা উজ্জ্বল। কিছু লোকের হাতে বর্শা, কারো হাতে তীর-ধনুক আবার কারো হাতে তলোয়ার। তারা একদিকে রণবাদ্য বাজাচ্ছে, অপরদিকে আল্লহু আকবার ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস নিনাদিত করে তুলছে। এ শব্দ শুনে তারা দমে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখতে পেলেন, দুটি দলের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বর্শা ও তলোয়ার উঁচিয়ে সে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। তলোয়ারের আঘাতে মানুষের কর্তিত শির মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। চারিদিকে কেবল আহাজারি। ধীরে ধীরে যুদ্ধ আরো তীব্রতর হলো। খ্রিষ্টানরা সংখ্যায় অনেক হয়েও অপর দলটিকে তারা পরাস্ত করতে পারল না। বহু খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হচ্ছে। এক সময় ক্রুশধারী খ্রিষ্টানদের হাত থেকে পতাকাটি পড়ে গেল এবং খ্রিষ্টানরা পরাজয় বরণ করল।

পরাজিত খ্রিষ্টানরা এদিক সেদিক পালাতে লাগল। আর জুব্বাধারীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করতে লাগল। হতাহতদের আর্তচিৎকারে তখন সমস্ত মাঠ ভারী হয়ে উঠেছে। রডারিক ও তার সঙ্গীরা ভাবতে পারছেন না, কী হচ্ছে আর তারা এ কি দেখছেন। তারা আবার ফিতার দিকে তাকালেন। একজন অশ্বারোহীর প্রতি তাদের নজর পড়ল। তার পরনে দামী রেশমী পোশাক, মাথায় মণিমুক্তাখচিত শাহী মুকুট। তার ঘোড়াটি সাদা বর্ণের। তার পোশাক, মুকুট ও অস্ত্রশস্ত্র দেখতে রডারিকের মতো। আরোহীটি একজন খ্রিষ্টান। তার চেহারা দেখতে ঠিক রডারিকের চেহারার মতো। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, একজন জুব্বাধারী সে খ্রিষ্টান আরোহীর দিকে এগিয়ে আসছে এবং যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। খ্রিষ্টান আরোহীটি বর্শাবিদ্ধ হলো। ফলে তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। এক সময় আরোহীটি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মরদেহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

এসব দেখে রডারিক ও তার সঙ্গীরা আরো ঘাবড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, একটি বিস্ময়কর আলো সমস্ত কামরায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমেই তা উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এক সময় তা এতো দীপ্ত হয়ে উঠল যে, চোখ এর তেজ সহ্য করতে পারছে না।

এমন সময় সিন্দুকের ভেতর থেকে আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। রডারিক ও তার সঙ্গীরা দ্রুত পালাতে লাগলেন। তখন তারা একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পেলেন, যেন বজ্রপাত হচ্ছে অথবা কোনো পাহাড় ফেটে পড়েছে। এ আওয়াজ শুনে তারা অস্থির হয়ে দৌড়াতে লাগলেন। যে কক্ষে প্রতিমা ছিল, তারা প্রথমে সে কক্ষে এলেন। প্রতিমার স্থানটি গর্তে পরিণত হয়েছে এবং প্রতিমাটি সে গর্তে পড়ে গিয়েছে। তারা দেখতে পান, প্রতিমাটি মুখ খুলে বিকট বজ্রধ্বনির মতো আওয়াজ তুলল। সে ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক রক্ষিত কক্ষটি ভেঙ্গে পড়ল। আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ততক্ষণে রডারিক ও তার সঙ্গীরা গম্বুজের ফটক পার হয়ে বেরিয়ে এলেন।

তাদের বেরুনোর সময় সমস্ত গম্বুজে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং আগুনের লেলিহান শিখা উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। দেয়ালের পাথরগুলো দূর দূরান্তে ছিটকে পড়তে থাকে। সেগুলো যেখানে ছিটকে পড়ছিল, সেখানেই আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল।

ইতোমধ্যে রাত হয়ে এসেছিলো। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সমস্ত পাহাড় আলোকিত করে তুলল। রডারিক ও তার সঙ্গীরা দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন।[৭]

---

[৭] এ কাহিনিটি তারীখে আন্দালুসের ১৭-১৮ ও ১৯১ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। এ কাহিনির সত্যতা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে ঘটনাটি একজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকের লেখা। আমাদের ধারণা এতে কিছু না কিছু সত্যতা হয়তো আছে। কেননা, বিশ্ব পরিব্রাজকগণ দীর্ঘকাল পরও পাহাড়ের সে গম্বুজটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছেন। সেখানকার অধিবাসীরাও প্রায় একই রকম ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সতের. প্রস্থান

সম্রাট রডারিক ও তার সঙ্গীরা দ্রুত পালাচ্ছিল এবং পেছন ফিরে গম্বুজের অবস্থা দেখছিল। তারা লক্ষ্য করছিল, দেয়ালের ইট-সুরকি ছিটকে ছিটকে পড়ছে। তাদের আশঙ্কা হলো, পাথরের কোনো টুকরা ছিটকে তাদের ওপরও পড়তে পারে। এই ভয়ে তারা আরো দ্রুত ঘোড়া চালালেন। চারিদিকে ঘন অন্ধকার থাকায় ঘোড়াগুলো কখনো কখনো হোঁচট খাচ্ছিল। ঘোড়া অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ প্রাণী। সম্ভবত সেগুলো বিপদ বুঝতে পেরেছিল। এজন্য নিজ থেকেই তারা অত্যন্ত দ্রুত দৌড়াচ্ছিল।

এক সময় তারা পাহাড় অতিক্রম করতে সক্ষম হলো এবং শহর অভিমুখে এগুলো লাগল। তখনও দূর আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছিল।

সম্রাট : উফ, কী ভয়ঙ্কর ঘটনাই না আমরা আজ দেখেছি!

মন্ত্রী : যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি বিস্ময়কর জাহাঁপনা!

সম্রাট : আমার ধারণা ছিল, সেখানে হয়তো কোনো গুপ্তধন আছে।

মন্ত্রী : আমি তো আগেই বলেছিলাম, সেখানে কোনো গুপ্তধন নেই।

সম্রাট : আমি যদি গম্বুজটি না খুলতাম, তাহলে?

মন্ত্রী : তাহলেও তা-ই থাকতো।

সম্রাট : তা হয়তো ঠিক, কিন্তু ফিতায় যাদের দেখা গেল, তাদের তো চেনা গেল না।

মন্ত্রী : আমার ধারণা, ওরা হয়তো আরব।

সম্রাট : আরব মুসলমান?

মন্ত্রী : জী হ্যাঁ।

সম্রাট (অনুতাপ করে) : স্পেনে মুসলমানদের হামলা?

মন্ত্রী : আমার মনে হয়, যারা থিওডমিরকে পরাজিত করেছে এরা ওরাই।

সম্রাট : হয়তো তা-ই হবে। থিওডমির তার চিঠিতে যেসব লোকের বর্ণনা দিয়েছে, আমরা তাদেরই দেখেছি।

মন্ত্রী : আমাদের এটা স্মরণ রাখতে হবে, মুসলমানরা যে দেশ আক্রমণ করে, চূড়ান্ত বিজয় না করে তারা ক্ষান্ত হয় না।

সম্রাট : এমনটিই তো শোনা যায়। জুলিয়ানই হয়তো তাদের ডেকে এনেছে।

মন্ত্রী : এটা জুলিয়ানের চরম নির্বুদ্ধিতা। তার জানা উচিত ছিল, মুসলমানরা স্পেন জয় করতে পারলে সিউটা তার হাতে ছেড়ে দেবে না।

সম্রাট : আমার দুঃখ এখানেই, সে খ্রিষ্টান হওয়া সত্ত্বেও নিজ দেশ ও জাতির সাথে এমন গাদ্দারী করল!

মন্ত্রী : জুলিয়ান তো তেমন লোক নন; হয়তো তার কোনো বড় রকম ক্ষতি করা হয়েছে।

সম্রাট : ক্ষতি তো এটাই, তার শ্বশুরকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে।

মন্ত্রী : ঠিক বলেছেন হুজুর। হয়তো ডনরাও এতে যুক্ত রয়েছে।

সম্রাট : কিন্তু এই নির্বোধরা জানে না, মুসলমানরা স্পেনে ক্ষমতাসীন হলে তাদের কোনো পদ দেবে না।

মন্ত্রী : এটা তাদের একান্তই নির্বুদ্ধিতা।

তারা শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। এখন সবাই নীরব।

রডারিক চাইছিলেন, জনসাধারণ যেন এ ঘটনা জানতে না পারে। কারণ তাতে রাজার অসম্মান হবে এবং এ জন্য দেশবাসী তাকে দায়ী করবে। রডারিক এসব ঘটনার জন্য ডনরা ও জুলিয়ানকে দায়ী করেন। ইতোমধ্যেই তারা রাজপ্রাসাদের কাছে এসে গেলেন। রডারিক ঘোড়ার পিঠ থেকে মেনে মহলে ঢুকে পড়েন। সঙ্গী সাথীরা সবাই নিজ নিজ গৃহে চলে যান। রডারিক তার কামরায় ঢুকে নায়লাকে বসা অবস্থায় দেখতে পান। গম্বুজের ঘটনাবলি তাকে এত ভীত করে ফেলেছিল যে, তার চেহারায় অস্থিরতার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট।

নায়লা তাকে দেখেই বললেন, গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেল?
রডারিক বললেন, না কিছুই পাওয়া যায়নি।

নায়লা : তাহলে তাতে কি ছিল?

রডারিক : কিছুই ছিল না। যা দেখেছি, সবটাই জাদু ও ধোঁকাবাজী।

তারপর গম্বুজে যেসব বিষয় দেখেছেন, নায়লার কছে তা বর্ণনা করলেন।

নায়লা অবাক বিস্ময়ে তা শ্রবণ করলেন। রডারিকের কথা শেষ হলে নায়লা বললেন, জেদ করে যে ভুল করেছ, তা এবার বুঝ।

রডারিক : হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি অনুতপ্ত, একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন পুড়ে গেল।

নায়লা : এটাও অস্বাভাবিক নয় যে, সেখানে তুমি যা দেখেছ বাস্তবেও তোমাকে এর সম্মুখীন হতে হবে।

রডারিক : আমি তা বিশ্বাস করি না।

কামরায় প্রচুর আলো ছিল। সে আলোয় নায়লার সুন্দর চেহারা পূর্ণ চাঁদের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

নায়লা : আচ্ছা, থিওডমির কি কোনো শক্রদের দ্বারা পরাজিত হয়েছে?

রডারিক : হ্যাঁ, তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো গম্বুজে আমি যাদের দেখেছি ঠিক একই ধরনের লোক থিওডমিরকে পরাজিত করেছে। আমি শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।

নায়লা : তাদের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা।

রডারিক : তারা মুসলমান, আরব থেকে এসেছে।

নায়লা বিস্ময়ের সুরে বললেন, মুসলমান!

রডারিক : হ্যাঁ।

নায়লা : দেশ ও জাতির সংরক্ষক হয়ে তুমি কেন যে এ ভুল করতে গেলে?

রডারিক : আমি আবার কি ভুল করলাম?

নায়লা : তুমি জুলিয়ানকে ক্ষেপালে কেন?

রডারিক : আমি তো বলেছি, আমি তাকে ক্ষেপাইনি। সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আমাকে দোষারোপ করছে। সে চাচ্ছে...

রডারিকের কথা শেষ হতে না হতেই নায়লা বললেন, ঠিক আছে, আমি আর সে প্রসঙ্গ বাড়াতে চাই না। কি ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছ, আমি শুধু সেটাই জানতে এসেছিলাম। এখন আমি যাচ্ছি।

এই বলে নায়লা চলে গেলেন। তাকে বাধা দেয়ার মতো সাহস রডারিকের ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন নায়লা ফ্লোরিন্ডার সমস্ত ঘটনাই জেনে ফেলেছে। সারাদিনই রডারিকের অত্যন্ত অস্থিরতায় কেটেছে। গম্বুজের ঘটনাবলি তাকে এতোই অস্থির করে ফেলেছিল যে, রাতে কিছু আহার গ্রহণ করলেন না। সরাসরি শয়নকক্ষে চলে যান এবং নিদ্রার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি সেনাপতিকে ডেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশানুসারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হলো এবং ছোট ছোট সৈন্য দল পাঠানো শুরু হয়ে গেল। কয়েকদিন পর সম্রাট রডারিক তার সমস্ত উপদেষ্টা, বীর যোদ্ধা ও অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। প্রজারা তাকে জমকালো বিদায় সংবর্ধনা জানালো। সম্রাট রডারিক সর্বমোট ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য কর্ডোভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

আঠার. নিখোঁজ

রডারিকের কাছে দূত পাঠিয়ে থিওডমির সেডোনার দিকে যাত্রা করেন। তার আশঙ্কা ছিল, মুসলমানরা তার পিছু ধাওয়া করতে পারে। এই ভয়ে তিনি সোজা পথ এড়িয়ে পাহাড়ী পথে এগুতে লাগলেন। তার সৈনিকদের অধিকাংশই নিহত হয়েছিল। যারা বেঁচে ছিল তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। মুষ্ঠিমেয় কিছু সৈন্য থিওডমিরের সঙ্গে ছিল।

থিওডমিরের মনে যেমন পরাজয়ের গ্লানি ছিল, তেমনি এ প্রশান্তিও ছিল যে, তারা একজন আরবকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে। থিওডমির ভেবে রেখেছিল, সম্রাটের সামনে বন্দীকে হাজির করে নিজের বীরত্বের পরিচয় দেয়া যাবে। এ জন্য সে দ্রুত সেডোনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

পালিয়ে যাওয়া অন্য খ্রিষ্টান সৈন্যরাও থিওডমিরের সঙ্গে এসে মিলিত হতে লাগলো। ফলে সর্বসাকুল্যে থিওডমিরের সঙ্গে সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচশত। থিওডমির যে জনপদই পাড়ি দিচ্ছিল, সেখানেই মুসলমানদের দুঃসাহসিকতার কথা শুনিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের উত্তেজিত করে তুলতে চেষ্টা করছিল। থিওডমির খ্রিষ্টানদের বুঝাচ্ছিল, মুসলমানরা ক্রুশ চিহ্নিত পতাকাকে অসম্মান করেছে। তারা খ্রিষ্টানদের জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়ে ফেলছে। সবাই মিলে তাদের প্রতিহত না করতে পারলে তারা গোটা স্পেন দখল করে নেবে। তখন খ্রিষ্টান পুরুষদের হত্যা করবে এবং মেয়েদের দাসীতে পরিণত করবে। গির্জার পতন ঘটাবে এবং খ্রিষ্টধর্মের বিলোপ সাধন করবে।

থিওডমিরের এরূপ প্রচারণায় জনপদবাসী ভয় পেয়ে গেল। অনেকে গ্রাম ছেড়ে কর্ডোভার দিকে চলে গেল। ফলে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ল। আবার কেউ কেউ থিওডমিরের সঙ্গে যোগ দিল। এতে তার সঙ্গীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এদের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় এক হাজারে।

থিওডমির এগিয়ে চলছিল আর বিভিন্ন জনপদ থেকে রসদ সংগ্রহ করছিল। ফলে তারা বেশ নির্বিঘ্নেই পথ চলছিল। বিলকিসের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। তার বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছিল। সে কেবল নজরবন্দী ছিল। কিন্তু ইসমাঈলের ব্যাপারে তাদের প্রবল ভীতি ছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল, তাঁর বাঁধন খুলে দিলে তিনি হয়তো পালিয়ে যাবেন, নতুবা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ শুরু করবেন।

ইসমাঈল সম্পর্কে থিওডমিরের এই ভয় অমূলক ছিল না। সে ইসমাঈলকে যে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখেছিল তাতে তার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল, তাঁর

বাঁধন খুলে দেয়া হলে বিচিত্র নয় যে, তিনি একাই সকল খ্রিষ্টানকে পরাজিত করে ফেলবেন। তাই থিওডমির ইসমাঈলের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল।

তাছাড়া থিওডমির মুসলমানদের মানুষই মনে করতো না। কারণ সে বুঝে উঠতে পারছিল না, এরা কারা এবং কোত্থেকে এসেছে, কিই-বা তাদের উদ্দেশ্য। তার ধারণা ছিল যারা জীবন বাজী রেখে এরকম আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে তারা মানুষ হতে পারে না। তাই মুসলমানদের ব্যাপারে তার মনে চরম ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল।

থিওডমিরের আরবি ভাষা জানা ছিল না। তাই ইসমাঈল ও বিলকিসের মধ্যে যে কথোপকথন হতো, সে বা তার সঙ্গীরা তার কিছুই বুঝতেন না। তাতে থিওডমিরের মনে আশঙ্কা হলো, বিলকিস ও ইসমাঈলকে একসঙ্গে রাখলে বিলকিস ইসমাঈলকে ছেড়ে দিতে পারে। এজন্য দুজনকে পৃথক রাখা হলো।

পথিমধ্যে একস্থানে তারা কয়েকটি তাঁবু পেয়েছিল। একটিতে থিওডমির নিজে অবস্থান গ্রহণ করে, একটি তাঁবু বিলকিসকে দেয় আর বাকীগুলো অন্যান্য খ্রিষ্টান অফিসারদের মধ্যে বণ্টিত হলো। থিওডমির বিলকিসের অধিক পরিমাণে যত্নআত্তির ব্যবস্থা করল। অবশ্য এর কারণও ছিল। থিওডমিরের জানা ছিল, বিলকিসকে সম্রাটের কাছে পাঠাতে হবে। তার যত্ন না হলে সে সম্রাটের কাছে নালিশ করতে পারে। তাতে থিওডমিরের ক্ষতি হয়ে যাবে।

থিওডমির এ-ও জানতো, সম্রাট যে মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন তার প্রতি কারো দুর্ব্যবহার তিনি কখনো সহ্য করেন না। সুতরাং বিলকিস থিওডমিরের নামে কোনো অভিযোগ করলে তাতে সম্রাট নির্ঘাত থিওডমিরের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে শাস্তি দেবেন। এজন্য থিওডমির বিলকিসের আরাম-আয়েশের প্রতিবিধানে কোনো ক্রটি রাখলো না।

বিলকিস নিজের তাঁবুতে গিয়ে ইসমাঈলের কথা ভাবতে লাগলেন। কিভাবে ইসমাঈলকে তার তাঁবুতে আনা যায়, তাঁর কষ্ট লাঘব করা যায়। এ চিন্তায় সে বিভোর হয়ে পড়ল। বিলকিস এ ইচ্ছার কথা থিওডমিরকে একাধিকবার জানালেও থিওডমির তার কথায় কান দেয়নি। বিলকিস ভাবছিল, ইসমাঈল হয়তো তাকে স্বার্থপর ভাবছে। কারণ বিলকিস আজকাল ইসমাঈলের সঙ্গে কথা বলার তেমন সুযোগ পাচ্ছেন না। থিওডমির সব সময়ই তার সঙ্গে সঙ্গে থাকছে। আর ইসমাঈলকে খ্রিষ্টান সৈন্যরা ঘিরে রাখছে।

একদিন খ্রিষ্টান সৈন্যদল সে স্থান ছেড়ে যাত্রা করল। তারা একটি পাহাড়ী পথ দিয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ের সে অংশটি সবুজ শ্যামল। দুদিকেই সবুজের সমারোহ। বৃক্ষগুলো ফলে ফুলে পূর্ণ। চারিদিকে ফুলের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্য তখন

পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। তার সোনালী আভা বৃক্ষের সবুজ পাতায় লুটোপুটি খাচ্ছে। থিওডমির এবং বিলকিস দুটি ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি যাচ্ছে। তারা চলছে সবার আগে আগে। পিছনে খ্রিষ্টান সৈন্যদল সারিবদ্ধভাবে পথ চলছে। মাঝখানে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ইসমাঈল একটি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। অনেক দূর যাওয়ার পর তারা একটি উপত্যকায় পৌছল। থিওডমির সেখানে নেমে ঘোড়ার বিশ্রামের ব্যবস্থা করল। তার ইচ্ছে ছিল, দলবল নিয়ে দিনে দিনে পাহাড়টি অতিক্রম করে পাদদেশে পৌছে যাওয়া। তাই সবাইকে লক্ষ্য করে বললো,

: বাহাদুর সিপাহিরা! এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে নাও। ঘোড়াগুলোকেও কিছুটা বিশ্রাম দাও। আজকে আমাদের অনেক রাত পর্যন্ত পথ চলতে হবে। একথা শোনামাত্র সিপাহিরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগলো। এমন সময় সামনের দিক থেকে একজন অশ্বারোহীকে আসতে দেখা গেল। তার পরনে খ্রিষ্টানদের পোশাক। তাকে দূত বলে মনে হচ্ছে। থিওডমির তাকে দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। এই সুযোগে বিলকিস ঘোড়া থেকে নেমে গেল। একজন খ্রিষ্টান সিপাহি তা দেখামাত্র ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল।

বিলকিস সামনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। ভাবখানা যেন কোনো ফুল তুলতে চাচ্ছে। বিলকিস আশপাশের ফুলগাছ থেকে ফুল তুলতে তুলতে আড়চোখে ইসমাঈলের দিকে তাকাতে লাগলেন।

ইসমাঈলও দূর থেকে বিলকিসকে দেখছিল। বিলকিস একটি ফুল নিয়ে খেলাচ্ছলে সামনে এগুতে লাগল। এক সময় ইসমাঈলের কাছাকাছি এসে পৌছে সলাজ দৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে একটি ফুল ছুঁড়ে দিয়ে বললো,

আপনি কি এ ফুলটি গ্রহণ করবেন?

ইসমাঈল হাসলেন। তিনি বললেন, এটা কি আমি তোমার প্রেমের নিদর্শন বলে মনে করব?

বিলকিস লজ্জা পেয়ে গেল। আনতদৃষ্টিতে বলল, আপনি যদি আমাকে এর যোগ্য বলে মনে করেন, তবে...

ইসমাঈল ফুলটি হাতে নিয়ে বললেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বিলকিস আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বললেন, আপনি হয়তো আমাকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে করেছেন, কিন্তু আমার অসুবিধাগুলো আপনি জানেন না।

ইসমাঈল : আমি সব জানি।

বিলকিস : আপনি হয়তো আমাকে অভিযুক্ত করতে পারেন।

ইসমাঈল : আমার কি এর অধিকার আছে?

বিলকিস : আপনি এমনটা বলছেন কেন?

ইসমাঈল : কথা হলো যে, বিলকিস...

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বিলকিস বলে উঠল, দেখুন থিওডমির ফিরে আসছে। সে আমার প্রতি কঠোর নজর রাখছে। আপনার সঙ্গে আমার যাতে কোনোরকম যোগাযোগ না হয় এ ব্যাপারে সে খুব সতর্ক। আমাদের একসাথে দেখলে সন্দেহ করতে পারে। যাক যে কথার জন্য এসেছিলাম তা হলো, আজ রাতে আপনি একটু সতর্ক থাকবেন।

ইসমাঈল তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন আমার জন্য কি কোনো ভয়ের কারণ আছে?

বিলকিস হেসে ফেললেন। বললেন, আমি কি বলেছি, আর আপনিই বা কি বুঝলেন। আমি বলেছি আজ রাত হয়তো আমি আপনার কাছে আসার চেষ্টা করব।

ইসমাঈল : কী জন্য?

বিলকিস : সেটা সময় হলেই বুঝতে পারবেন। এখন চললাম। বিলকিস তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন। ইসমাঈল বিলকিসের দেয়া ফুলটি বুকে চেপে ধরে বিলকিসের গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন। বিলকিস সেখান থেকে সরাসরি নিজের ঘোড়ার কাছে চলে গেল। ইতোমধ্যে থিওডমিরও আগন্তুককে নিয়ে ফিরে এসেছে।

আগন্তুক ছিল দূত। থিওডমির তাকেই চিঠি দিয়ে সম্রাট রডারিকের কাছে পাঠিয়েছিল। তাকে সঙ্গে করে এনে সে খ্রিষ্টান সিপাহিদের লক্ষ্য করে বললো, বাহাদুর সিপাহিরা! আমাদের সম্রাট স্বয়ং এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে আসছেন। সুতরাং আর বিশ্রামের সময় নেই। আমাদের এখন দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে।

নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিরা ঘোড়ায় চড়ে বসল এবং যাত্রা শুরু করল। কিছুদূর চলার পর তারা একটি পাহাড়ী পথে এসে উপস্থিত হলো। পথটি এতোটাই সংকীর্ণ যে কেবল চারজন আরোহী পাশাপাশি চলতে পারবে।

সিপাহিরা চার চার জন করে সারিবদ্ধভাবে এগুতে লাগল। তারা পাহাড়টি পেরিয়ে শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। রাত হয়ে এসেছে। পাহাড়টির কোলেই একটি বিরাট ময়দান। সবাই সে ময়দানে অবস্থান করল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল সবাই। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হলো। এমন সময় দেখা গেল, ইসমাঈল নিখোঁজ।

থিওডমির ভীষণ ঘাবড়ে গেল। অস্থির হয়ে তাঁর তালাশে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। জানা গেল, শোয়ার সময়ও সে ছিল, এর পরেও তাকে দেখা গেছে; কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে আর পাওয়া যায়নি।

সিপাহিরাও অস্থির হয়ে পড়ল। তারা বুঝতেই পারলো না, এত লোকের মাঝ থেকে সে কীভাবে পালিয়ে গেল। তারা বসে বসে ইসমাঈলের তালাশের চিন্তা ভাবনা করছিল। এমন সময় বিলকিসের তাঁবুর প্রহরী এসে খবর দিল, তাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। থিওডমির দৌড়ে সেদিকে গেল। দেখতে পেল, তাঁবু খালি পড়ে আছে। সে আরো অস্থির হয়ে পড়ল। বললেন, বেটা দুর্ভাগা নিজেও গেছে আবার বিলকিসকেও নিয়ে গেছে। তিনি সবাইকে নির্দেশ দিলেন, তাদের খুঁজে বের করতে।

সিপাহিরা তাদের তালাশে পাহাড়ের ওপর উঠে সমস্ত পাহাড় তন্নতন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। এভাবে সারা দিন কেটে গেল। আবার রাত নামলো। তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। সেখানেই রাত্রি যাপন করল। পরদিন সকালে আবার তাদের তালাশে বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন খোঁজ করল; কিন্তু কোথাও তাদের হদিস মিলল না। তৃতীয় দিন বাধ্য হয়ে তারা সামনের দিকে যাত্রা করল।

উনিশ. দুঃখজনক সংবাদ

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ইসমাঈল ও বিলকিসের কোনো সন্ধান করতে না পেরে থিওডমির সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ল। তারা আর কালবিলম্ব না করে সোজা কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হলো এবং প্রান্তর অতিক্রম করে গোয়াদেল কুইভার নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছল।

স্পেনে বড় নদী মাত্র দুটি। একটি হচ্ছে টেগাস, অপরটি গোয়াদেল কুইভার। দুটো নদীই অত্যন্ত নিচ দিয়ে প্রবাহিত। ফলে এগুলো থেকে সেচের সুযোগ গ্রহণ করা অসম্ভব। এজন্য নদী দুটো স্পেনের কোনো উপকারে আসে না। তা সত্ত্বেও নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সুন্দর ঘাস ও ফুলে ফলে এক মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

খ্রিষ্টান সৈন্যরা গোয়াদেল কুইভার পাড় হয়ে কর্ডোভার কাছে এসে পৌঁছালো। তারা জানতে পেরেছিল, সম্রাট রডারিক ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে কর্ডোভায় অবস্থান করছেন। অবশেষে থিওডমিরের সৈন্যদল কর্ডোভায় পৌঁছে গেল। রডারিকের সৈন্যদল ততক্ষণে সারা শহর ছেয়ে ফেলেছে। শহরটি দেখতে তাঁবুর শহর বলে মনে হচ্ছে।

সম্রাটের আগমনে থিওডমিরের সৈন্যরাও আনন্দিত। তারাও সম্রাটের বাহিনীর তাঁবুর পাশে তাঁবু ফেললো। সম্রাটের কাছে সেনাপতির আগমনবার্তা পৌঁছল। রডারিক থিওডমিরের চিঠিতে বর্ণিত বন্দীটিকে দেখতে উৎসুক ছিলেন। বেশী আগ্রহ ছিল বিলকিসের প্রতি। তাই থিওডমিরের আগমন বার্তা শোনামাত্র তিনি নিজেই থিওডমিরের তাঁবুর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।

সম্রাটের বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। সবাই সতর্ক হয়ে গেল; কিন্তু সম্রাট কেন বের হয়েছেন, কোন দিকে যাবেন তা কেউই বলতে পারলো না। সবাই কাজ ছেড়ে সম্রাটের সংবর্ধনার জন্য প্রস্তুত থাকলো।

সম্রাট রডারিক সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করেই থিওডমিরের তাঁবু কোন দিকে জানতে চাইলেন। একজন সৈন্য এগিয়ে এসে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সেনাপতি থিওডমিরও সম্রাটের আগমনবার্তা পেয়ে গেলেন। তিনি দ্রুত সামরিক পোশাক পরিধান করে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেলেন, সম্রাট ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছেন। সম্রাটের কাছাকাছি পৌঁছে সেনাপতি মাথা ঝুঁকিয়ে সম্রাটকে কুর্নিশ করলেন। রডারিক থিওডমিরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চিঠিতে

যে এক বিস্ময়কর জাতির কথা উল্লেখ করেছিলে, তাদের সাথে কি তোমার কোনো যুদ্ধ হয়েছে?

থিওডমির : হ্যাঁ, জাহাঁপনা!

রডারিক : লোকগুলো কোত্থেকে এসেছে?

থিওডমির : জাহাঁপনা! তারা কোত্থেকে এসেছে, তা কেউই বলতে পারে না।

রডারিক : তাদের সংখ্যা কত হবে?

থিওডমির : সঠিক সংখ্যা হয়তো বলা যাবে না, তবে সাত আট হাজারের বেশি হবে না।

রডারিক (স্মিত হেসে) : মাত্র সাত হাজার!

থিওডমির : জী হ্যাঁ, তবে তাদের এ পরিমাণই যথেষ্ট শক্তিশালী।

রডারিক : তুমি তাদের খুবই সাহসী বলে মনে করো?

থিওডমির : কী বলবো জাহাঁপনা, তাদের থেকে সাহসী আমি কাউকে দেখিনি।

রডারিক : তারা খুবই যুদ্ধবাজ, তাই তো?

থিওডমির : ঠিক তাই জাহাঁপনা, যুদ্ধ তাদের কাছে খেলা।

রডারিক : তারা কি পদাতিক না অশ্বারোহী?

থিওডমির : তারা পদাতিক জাহাঁপনা; কিন্তু খোদ অশ্বারোহীও তাদের কাছে পাত্তাই পায় না।

রডারিক : যুদ্ধে তোমাদের নিহতের সংখ্যা কত?

থিওডমির : মৃতের সঠিক সংখ্যা হয়তো বলা যাবে না; তবে ১৩-১৪ হাজারের কম হবে না।

রডারিক : তাদের কতজন নিহত হয়েছে?

থিওডমির : সত্যি বলতে তাদের কাউকেই আমি মরতে দেখিনি। তারা এমন এক জীব, মৃত্যুই মনে হয় তাদের ভয় পায়!

রডারিক : এ তো খুবই বিস্ময়ের কথা!

থিওডমির : তাদের সবকিছুই বিস্ময়কর হুজুর।

রডারিক : তোমরা কেবল একজনকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছ।

থিওডমির : জী জাহাঁপনা, তা-ও তো বহু চেষ্টা ও কৌশলে।

রডারিক : সে কি তোমাদের বেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়েছিল?

থিওডমির : জী হ্যাঁ, আমরা পরাজিত হয়ে আমি ৫০-৬০ জন সৈন্য নিয়ে তাঁবুতে পালিয়ে আসি। উদ্দেশ্য ছিল, বিলকিসকে নিয়ে পালিয়ে যাব, কিন্তু...

রডারিক : শত্রু এসে তোমাদের পথ রোধ করে।

থিওডমির : জী না জাহাঁপনা, শত্রুদলের এক যুবক এসে বিলকিসকে নিয়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

রডারিক : বিলকিসকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল?

থিওডমির : জী হ্যাঁ, জাহাঁপনা!

রডারিক : আর বিলকিস?

থিওডমির : সেও যুবকটির সঙ্গে যেতে সম্মত ছিল।

রডারিক : তারপর কী হলো?

থিওডমির : যুবকটি আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হলো।

রডারিক (বিস্ময়ের সঙ্গে) : সে একাই তোমাদের এতো লোকের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল!

থিওডমির : শুধু প্রস্তুতই হলো না, আক্রমণও চালালো।

রডারিক : ভারী বিস্ময়ের ব্যাপার দেখছি!

থিওডমির : আরো বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সে একাই আমাদের একুশজনকে হত্যা করলো।

রডারিক : তাহলে সে তো বাস্তবিকই একজন সাহসী ব্যক্তি।

থিওডমির : অথচ সে একটু আঘাতও পেলো না।

রডারিক : তাহলে তাকে বন্দী করলে কিভাবে?

থিওডমির : আমি বিলকিসকে গিয়ে ধরতেই সে চিৎকার করে উঠল। তাতে যুবকটি অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে তাকালো। ঠিক তখনই আমার সৈন্যরা তাকে ধরে বেঁধে ফেললো।

রডারিক : তাহলে তোমরাও যথেষ্ট চেষ্টা করেছ। আমি যুবকটিকে দেখতে চাই।

থিওডমির : এখন তাকে কোথায় পাবো জাহাঁপনা?

রডারিক : কেন, তাকে কি হত্যা করে ফেলেছ?

থিওডমির : না জাহাঁপনা, সে পালিয়ে গেছে।

রডারিক বিস্ময়ের সুরে বললেন, কোথা থেকে কিভাবে পালিয়ে গেল? সে কি জাদুকর ছিল?

থিওডমির : তাই জাহাঁপনা, হয়তো জাদুকর অথবা জিন হতে পারে।

রডারিক : বিলকিস কোথায়?

থিওডমির : সেও পালিয়েছে জাহাঁপনা। যুবকটি মনে হয় তাকেও নিয়ে গেছে। রডারিক রাগত স্বরে বললেন, তোমরা হয়তো তাদের পাহারা গাফিলতি করেছ। তাই তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

থিওডমির : পাহারার ব্যাপারে কোনো রকম ক্রটি করা হয়নি জাহাঁপনা! তদুপরি যুবকটিকে সবসময় বেঁধে রাখা হতো। তা সত্ত্বেও সে নিজেও পালিয়ে গেল আবার বিলকিসকেও নিয়ে গেল। এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার জাহাঁপনা!

রডারিক : তাদের সন্ধান করেছ?

থিওডমির : ক্রমাগত তিনদিন তাদের খোঁজ করেছি, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইনি।

রডারিক : আফসোস, এক পরমা সুন্দরী যুবতীকে হাতছাড়া করলে!

থিওডমির : জাহাঁপনা, আমি এ জন্য খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

রডারিক কঠোর সুরে বললেন, এখন তোমার প্রথম কর্তব্য হলো সেই সুন্দরীকে খুঁজে বের করা।

থিওডমির : আমিও তাই চিন্তা করছি জাহাঁপনা!

রডারিক : ঠিক আছে, সৈন্যদের এই নির্দেশ দাও।

থিওডমির : তাই হবে জাহাঁপনা!

রডারিক সেখান থেকে চলে গেলেন। থিওডমির সম্রাটের নির্দেশ প্রচার করে দিলেন। পরদিন সকালে থিওডমির তার সৈন্য নিয়ে ওয়াদী আল কাবীরের দিকে রওনা করল।

বিন. সাহায্যকারী বাহিনী

খিওডমিরের কোনো হদিস না পেয়ে আমামন সঙ্গে গমনকারী মুজাহিদদের নিয়ে ফিরে এলেন। তারিক ও মুজাহিদরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে রাতটি কাটালেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিখোঁজ মুজাহিদের অনুসন্ধান শুরু হলো। প্রথমে আমামনের কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চাওয়া হলে আমামন জানালেন, তার কাছে সকল আরবকেই একরকম মনে হয়। সুতরাং তার পক্ষে সে মুজাহিদটি বিশেষ কোনো চিহ্ন উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

তারপর সকল মুজাহিদের হাজিরা নেয়া শুরু হলো। দুপুরের দিকে জানা গেল, মুজাহিদটির নাম ইসমাঈল। তিনি ছিলেন পঁচিশজন সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রথমে সকলেরই ধারণা ছিল, তিনি হয়তো তারিকের সঙ্গে আছেন। কারণ, ইসমাঈল আর মুগীছকে তারিক খুবই বিচক্ষণ ও সাহসী বলে মনে করতেন। তাঁদের মধ্যে মুগীছ প্রৌঢ় আর ইসমাঈল যুবক।

খিওডমির ইসমাঈলকে ধরে নিয়ে গেছে জেনে তারিক খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি আমামনকে ডেকে পাঠালেন।

তারিক : আপনি কি বলতে পারবেন, খিওডমির কোনদিকে পালিয়েছে?

আমামন : না হুজুর, যেসব স্থানে গিয়েছে বলে আমার আন্দাজ ছিল সেসবের প্রত্যেকটিতে তালাশ করেছি; কিন্তু কোনো হদিস পাইনি।

তারিক : আপনার কী মনে হয়, সে কোন দিকে যেতে পারে?

আমামন : আমার মনে হয়, সে হয়তো কর্ডোভায় যাবে।

তারিক : কর্ডোভা এখান থেকে কতদূর?

আমামন : অনেক দূর হুজুর!

তারিক : পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ কোন কোন স্থান আছে?

আমামন : আলজাযায়ের ও সেডোনা।

তারিক : কোনো সামরিক ঘাঁটি আছে কি?

আমামন : না, হুজুর!

তারিক : কোনো দুর্গ?

আমামন : তেমন কোনো দুর্গ নেই।

তারিক : কোনো যুদ্ধলিপ্সু জাতির বসতি?

আমামন : আপনাদের শত্রু তো সর্বত্রই, হুজুর।

তারিক : তাহলে তো তারা আমাদের মোকাবিলা করবে।

আমামন : স্পেনের সর্বত্রই হয়তো আপনাদের মোকাবিলার সম্মুখীন হতে হবে।

তারিক : কিন্তু এ দিকে কোনো সীমান্ত চৌকি নেই যে?

আমামন : হুজুর, এ দিকে সমুদ্র। খ্রিষ্টানদের ধারণা এ দিক থেকে তাদের কোনো রকম হামলা হবে না।

তারিক : তাহলে থিওডমির এখানে কি করছিল?

আমামন : এটি একটি আকস্মিক ঘটনা হুজুর!

তারিক : আচ্ছা, এখন আমরা কোন দিকে যাব?

আমামন : কর্ডোভার দিকে।

তারিক : আপনি কি নিশ্চিত, থিওডমির কর্ডোভা যাবে?

আমামন : জী হ্যাঁ, আমার নিশ্চিত ধারণা সে কর্ডোভা হয়ে টলেডো যাবে।

তারিক : টলেডো কি স্পেনের রাজধানী?

আমামন : জী হ্যাঁ।

তারিক : কর্ডোভায় কি অনেক সৈন্য আছে?

আমামন : সৈন্য তেমন বেশি নেই। তবে সেখানকার দুর্গ অত্যন্ত সুরক্ষিত।

তারিক : দুর্গে প্রবেশ করার কোনো গোপন পথ আপনার কি জানা আছে?

আমামন : না হুজুর!

তারিক : মানে, কোনো গোপন পথই নেই নাকি আপনারই জানা নেই?

আমামন : আমার জানা নেই হুজুর।

তারিক : আচ্ছা, আপনি কি আমাদের সঙ্গে থাকতে চান?

আমামন : আমি এখন আপনাদের ছেড়ে কোথায় যাব?

তারিক : আফসোস, আপনার কন্যা হাতে এসেও হাতছাড়া হয়ে গেল।

আমামন : আমার নির্বুদ্ধিতা হুজুর!

তারিক : সেটা কিরকম?

আমামন : আমি তাড়াহুড়ো করে কেবল একজন মুজাহিদ নিয়ে সেদিকে গিয়েছিলাম।

তারিক : হ্যাঁ, এটা আপনার ভুল হয়েছে। কয়েকজন নিয়ে গেলে হয়তো আপনার কন্যাও হাতছাড়া হতো না আবার আমরা একজন মুজাহিদকেও হারাতাম না।

আমামন : আমার ধারণা ছিল, হয়তো তাঁবুতে কোনো সৈন্য নেই। এত শীঘ্র তারা পরাজিত হবে, আমি সেটা আঁচ করতে পারিনি।

তারিক : এখন খ্রিষ্টানরা যদি তাদের পিছু ধাওয়ার ভয়ে ইসমাঈলকে হত্যা করে?

আমামন : তাহলে সে মুসলমানদের জন্য খুবই দুঃখের কারণ হবে।

তারিক : হ্যাঁ, দুঃখ তো বটেই, তবে...

আমামন : তবে অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবেন।

তারিক : হ্যাঁ, ইসমাঈলকে হত্যা করা হলে সেখানে উপস্থিত তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।

আমামন : আর যদি আমার কন্যা বিলকিসকে হত্যা করা হয়?

তারিক : তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে। তাদের সবাইকে দাসদাসীতে পরিণত করা হবে।

আমামন এ কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। তিনি বললেন, আপনারা তো মজলুমের উত্তম সহায়ক!

ইতোমধ্যে মুজাহিদরা আহার শেষ করে বেরিয়ে আসলেন। তারিক আর দেরি করা সমীচীন নয় বলে সকলকে রওয়ানার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র সবাই রওয়ানা দিলেন।

তাড়াতাড়ি কর্ডোভায় পৌঁছার উদ্দেশ্যে তাঁরা দ্রুত এগুচ্ছিলেন, কিন্তু কর্ডোভা ছিল অনেক দূর। তাদের পথ যেন শেষ হচ্ছিল না। থিওডমিরের পরাজয় ও পলায়নের সংবাদ আলজাযায়ের ও সেডানার অধিবাসীদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। তাতে সেখানকার অধিবাসীরা খুবই ভীত হয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে সেসব এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাই সেসব এলাকায় কোনো মোকাবিলা তো দূরের কথা, মুজাহিদরা কোনো খ্রিষ্টানেরই সাক্ষাৎ পেলেন না। তাঁদের রসদপত্রের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমগ্র অঞ্চল জনশূন্য হওয়ায় রসদ সংগ্রহ দুষ্কর হয়ে পড়ল।

সৌভাগ্যক্রমে সময়টা ছিল ফসল পাকার মৌসুম। মুজাহিদরা সেখান থেকে প্রয়োজনমতো খাবার সংগ্রহ করে নিচ্ছিলেন। এছাড়াও তাঁরা স্থানে স্থানে আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল পাচ্ছিলেন। তাঁরা সেসবও খেতেন। তাঁরা একে একে আলজাযায়ের ও সেডোনা সংলগ্ন অঞ্চলগুলো জয় করে লা-জান্ডা ঝিলের কাছে পৌঁছলেন। ২৮শে রমজান ৯২ হিজরি মোতাবেক জুলাই ৭১১ সালে তাঁরা লা-জান্ডা ঝিলের নিকটবর্তী একটি ছোট নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেন। তারা দেখতে পেলেন, সামনের বিরাট প্রান্তরজুড়ে খ্রিষ্টান সৈন্যদল তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান নিয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু তাঁবুর সারি। মুজাহিদরা এ বিরাট সৈন্যদল দেখে

কিছুটা দমে গেলেন। তারিক তা বুঝতে পেরে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, মুসলিম ভাইয়েরা! বুঝতে পারছি, বিরাট সৈন্যদল দেখে তোমরা কিছুটা ঘাবড়ে গেছ। মনে রেখো, তোমরা এমন এক জাতির সন্তান যারা শামের মতো শক্তিশালী রাজ্যকে তছনছ করে দিয়েছে। শত্রু সৈন্য বড়জোর এক লাখ হবে; অথচ তোমাদের ছয় হাজার ছয় লাখের মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। তিনি অবশ্যই তোমাদের বিজয় দান করবেন।

তারিকের এ সংক্ষিপ্ত ভাষণ সৈন্যদের উজ্জীবিত করে। নদী তীরে তাঁরাও তাঁবু ফেললেন। তাঁদের তাঁবুর সংখ্যা কম হলেও সেগুলো এমনভাবে খাটানো হলো যে দূর থেকে চারগুণ মনে হলো। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে খুবই আনন্দিত হলো। তারা ভাবলো, প্রথম আক্রমণেই তাদের খতম করে ফেলবে। মুসলমানরা সারা রাত জেগে কাটালেন। তাঁদের ধারণা ছিল, খ্রিষ্টানরা যুদ্ধের ময়দানে বের হবে; কিন্তু তারা বের না হওয়ায় মুজাহিদরা তাঁবুতেই অবস্থান করলেন।

পরদিন ঈদুল ফিতর। এর আগে সফরে থাকা সত্ত্বেও মুজাহিদরা রোজা রেখেছেন। ঈদের সকালে দুরাকাত নামায আদায় করে তাঁরা ঈদ উদযাপন করলেন। সেদিনও খ্রিষ্টানরা ময়দানে নামলো না। তারিক ভাবলেন, খ্রিষ্টানরা হয়তো আরো সৈন্য আগমনের অপেক্ষা করছে। সেদিন বিকেলেই মুসলমানরা তাদের পেছনদিকে ঘোড়ার ধুলি উড়তে দেখলেন। মুসলমানরা ভাবলেন, এদের জন্যই হয়তো খ্রিষ্টানরা অপেক্ষা করছিল। তাঁরা তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ক্রমে নিকটবর্তী হলে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুজাহিদরা দেখতে পেলেন, এরা আরব পোশাক পরিহিত। তাদের বুঝতে বাকী রইল না, মূসা তাদের সাহায্যার্থে এ বাহিনী পাঠিয়েছেন। তাঁরা সকলেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। এ দলের সৈন্যসংখ্যা পাঁচহাজার। সব মিলিয়ে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো বার হাজার। নবাগতরাও পুরনোদের সাথে অবস্থান নিল। সে রাত মুসলমানরা বেশ হাসি খুশিতে কাটালেন।

একুশ. একটি সুন্দর প্রতিকৃতি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, থিওডমির বিলকিসের বাঁধন খুলে দিয়েছিল। তাতে সে ইচ্ছেমতো চলাফেরা করতে পারতো। কিন্তু বিলকিস তাঁবুর বাইরে কোথাও যেতেন না; বরং তাঁবুর ভেতরেই কাটাতেন। থিওডমিরের সৈন্যদল যাত্রা শুরু করলে বিলকিসও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতো। সে জানতো, তাকে সম্রাট রডারিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে চেষ্টায় ছিল, ফুরসত পেলেই ইসমাঈলকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। ইতোপূর্বে সে তা ইসমাঈলকে বলেও রেখেছে। খ্রিষ্টান সৈন্যদল যেদিন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিল সেদিন বিলকিস সিদ্ধান্ত নিল, আজই তাকে পালাতে হবে। তাই সেদিন রাতের আহার শেষ করে সে সকাল সকাল শুয়ে পড়ল। প্রহরীরা তার তাঁবুতে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলো, সে শুয়ে পড়েছে। তারাও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত কিছুটা গভীর হলে বিলকিস দেখতে পেল, তার তাঁবুর প্রহরীরা পর্যন্ত নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। তাদের পাশে খোলা তলোয়ার পড়ে আছে। চারিদিক নীরব, নিথর। সারা বিশ্বই যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চাঁদ যেন উদার দৃষ্টিতে ঘুমন্ত বিশ্বকে অবলোকন করছে।

বিলকিস তাঁবুতে ফিরে এবং ঘুমের পোশাকের ওপর পরিধেয় কাপড় পরে নিলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। বিলকিস অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রহরীদের পাশ কেটে এগিয়ে গেলেন। বিভিন্ন তাঁবুর আড়াল দিয়ে ইসমাঈলের তাঁবুর কাছে যেতে লাগলেন। দিনের বেলাতেই তিনি সেটার অবস্থান জেনে নিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন, ইসমাঈলও প্রহরীদের সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বিলকিস ইসমাঈলকে রাতে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন; কিন্তু তাঁকে ঘুমন্ত দেখে তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। কারণ খ্রিষ্টানরা ইসমাঈলকে এত কড়া পাহারায় রেখেছিল যে, তাঁর শৃঙ্খলের রজ্জু তারা নিজেদের কোমরে বেঁধে রেখেছিল। যাতে ইসমাঈল একটু নড়াচড়া করলেই তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

বিলকিস ইসমাঈলের কাছে গিয়ে হালকা একটু কাশি দিলো। কাশির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইসমাঈলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি মাথার কাছে বিলকিসকে দেখতে পেলেন। বিলকিস তার ওপর ঝুঁকে পড়ে তলোয়ার দিয়ে দ্রুত বাঁধন কাটতে লাগলো। দ্রুত সবগুলো বাঁধন কেটে তাঁকে উঠে আসতে ইঙ্গিত দিলো।

ইসমাঈল বুঝতে পারেন, একটু শব্দ হলেই প্রহরীরা জেগে উঠবে। তাই তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উঠে এলেন। যেমন কোনো মা তার সন্তানের নিদ্রা ভঙ্গের ভয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে যান।

ইসমাঈল পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন। আনন্দের আতিশয্যে বিলকিসের হাত চেপে ধরে বলতে থাকেন, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাচ্ছি না! বিলকিস ঠোঁটে তর্জনী চেপে ধরে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করলেন। ফিসফিস করে বললো, এখন ধন্যবাদ জানানোর সময় নেই। দয়া করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসুন। তার কথামতো ইসমাঈল বিলকিসের পেছনে পেছনে দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে ইসমাঈল বিলকিসের কাঁধ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়েন। বললেন, তোমার তলোয়ারটি আমার হাতে দাও। বিলকিস অনুচ্চস্বরে বললো, এখন তলোয়ার দিয়ে কি করবেন?

ইসমাঈল : কেউ জেগে উঠলে তাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।

বিলকিস : তাতে তো অন্যরাও জেগে উঠতে পারে।

ইসমাঈল : তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, কোনো উপায় নেই এমন পরিস্থিতিতেই কেবল আমি এই তলোয়ার ব্যবহার করবো।

বিলকিস : আমিও এটাই চাচ্ছি।

এই বলে বিলকিস তলোয়ারটি ইসমাঈলের হাতে দিলেন। ইসমাঈল তলোয়ারটি উঁচু করে তুলে ধরলেন। তা দেখে বিলকিস বললো, আপনি এ কি করছেন?

ইসমাঈল : ঘাবড়িয়ো না, আমি এর ধার পরীক্ষা করছি।

বিলকিস : দয়া করে এখন এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়ুন।

ইসমাঈল মুচকি হেসে বললেন, ঠিক আছে। তোমার নির্দেশই সই।

বিলকিসও তাঁর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলো। ধীরে ধীরে তাঁরা তাঁবুর সীমানার বাইরে চলে এলেন। এখন আর তাদের অতো সতর্কতার প্রয়োজন নেই; কিন্তু অসতর্কতায় ঘুমন্ত এক খ্রিষ্টানের পায়ের সঙ্গে ইসমাঈলের পায়ের ধাক্কা লেগে গেল। অমনি সে জেগে গিয়ে বলে উঠল, কে রে নির্বোধ?

সঙ্গে সঙ্গেই ইসমাঈল তলোয়ার উঁচিয়ে ধরলেন। সিপাহিটি ইসমাঈলের হাতে খোলা তলোয়ার দেখে ঘাবড়ে গেল। হাতজোড় করে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে রইল। ইসমাঈলের চেহারা ও পোশাক দেখে সে আরো ঘাবড়ে গিয়েছিল।

ইসমাঈল বুঝতে পারলেন, তিনিও সিপাহিটির কথা বুঝবেন না আবার সেও তাঁর কথা বুঝবে না; এখানে অযথা দেরি করলে অন্যরা জেগে উঠতে পারে। তাই

সিপাহিটিকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। সিপাহিটিও চুপচাপ পড়ে রইল। একসময় আবার ঘুমিয়েও পড়ল। সকালে ঘুম থেকে উঠেও রাতের ঘটনা কারো কাছে বলল না। কারণ তার মনে ভয় ছিল, থিওডমির ঘটনাটি জানতে পারলে তাকে শত্রুদের সহায়তার অভিযোগে হত্যা করে ফেলবে।

ইসমাঈল ও বিলকিস মাঠ ছেড়ে পাহাড়ে উঠে এলেন। সেখান থেকে শত্রু ছাউনি অনেক দূরে। এবার তাঁরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ইসমাঈল বিলকিসকে লক্ষ্য করে বললেন, এই সাহসিকতার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বিলকিস বিনয়ের সঙ্গে বললো, ধনবাদ জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

ইসমাঈল লক্ষ্য করলেন, বিলকিসের চেহারা দেখে তাকে বোকা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সে বোকা নয়; সে অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। বন্দী ছিল বলেই হয়তো তাকে বোকা মনে হতো।

বিলকিস : আপনাকেই বরং আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।

ইসমাঈল : কেন, তুমি কি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য নও?

বিলকিস : নিশ্চয়ই না।

ইসমাঈল : কিন্তু ...

বিলকিস : এসব আলাপ ছেড়ে সামনে চলুন, শত্রুরা খোঁজ করতে পারে।

ইসমাঈল : তুমি তো দেখছি অত্যন্ত চতুর।

বিলকিস : তাতে আপনার কি?

ইসমাঈল : আচ্ছা, তুমি এত মুখরা কেন?

বিলকিস : তা কোনো সমস্যা?

ইসমাঈল : হ্যাঁ, কারণ তুমি সুন্দরী।

বিলকিস : এসব আলাপ ছেড়ে এটা ভাবুন, আমরা কোথায় যেতে পারি?

ইসমাঈল : আমি তো এ দেশ সম্পর্কে কিছুই জানি না।

বিলকিস : আর আমি সব চিনি, তাই না?

ইসমাঈল : তাহলে আমরা এখন কোথায় যাব?

বিলকিস : তাহলে চলুন, আমরা আবার শত্রু-ছাউনিতে ফিরে যাই।

ইসমাঈল : ইয়াল্লা, এ কি বলছ তুমি!

বিলকিস : খুব ভয় পেয়ে গেলেন দেখছি। আপনি পুরুষ হলেন কেন?

ইসমাঈল : কেন আমি কী হবো?

বিলকিস : যা হওয়া উচিত ছিল।

ইসমাঈল : আমি তো তাই হয়েছি।

বিলকিস : হ্যাঁ, আপনি কচু হয়েছেন।

এসব আলাপ আলোচনায় তারা এতোই বিভোর ছিলেন যে, অন্য কোনো দিকেই তাদের কোনোরকম ভ্রুক্ষেপ ছিল না। চাঁদের আলোয় একের পর এক টিলা পেরিয়ে উঁচু চূড়ায় উঠে গেলেন তাঁরা। ইসমাঈল ছিলেন আগে আগে, বিলকিস পেছনে। তাঁরা যখন চূড়ায় পৌঁছলেন, তখন চাঁদ অস্তপ্রায়। পূর্বাকাশে সূর্যের আগমন লক্ষ্য করা গেল। ইসমাঈল বললেন, এখন তো ভোর হয়ে আসছে। শত্রুরা আমাদের তালাশে এদিকে আসতে পারে।

বিলকিস : আমরা এখন কোথায় এসেছি তা দেখে নিন।

ইসমাঈল লক্ষ্য করলেন, তারা কয়েশত ফুট উপরে উঠে এসেছেন। তিনি বিস্ময়ের সুরে বললেন, আমরা এতো উঁচুতে এলাম কী করে?

বিলকিস : এসে তো গেলাম; কিন্তু এখন নামবো কী করে?

ইসমাঈল : যিনি উপরে নিয়ে এসছেন, তিনিই নামিয়ে নেবেন।

সে সময় সূর্য উঠে গেছে। তারা দুজনে একটি পাথরের আড়ালে বসে পড়লেন। খ্রিষ্টানরা ধারণা করেছিল, এত উঁচুতে হয়তো তারা উঠতে পারবে না। তাই সেদিকে যাওয়ার চিন্তাই করেনি; বরং নিচ থেকেই তালাশ করে চলে গেছে।

বাইশ. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

রডারিক দেখতে পেলো, আরো নতুন সৈন্য এসে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখন মুজাহিদদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তাই সে অনুতাপ করে বলতে লাগল, নতুন সৈন্য আসার আগেই তাদের ওপর আক্রমণ করা উচিত ছিল। সম্রাট রডারিকের ধারণা ছিল, মুসলমানরা হয়তো রসদপত্রের অভাবে এমনিতেই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাবে; কিন্তু ইতোমধ্যে আরো নতুন সৈন্য এসে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় খ্রিষ্টানদের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। তারা আশঙ্কা করল, যুদ্ধ বিলম্বিত হলে নতুন নতুন সৈন্যদল হয়তো আসতেই থাকবে।

অতএব, (৯২ হিজরির) শাওয়াল মাসের ২ তারিখ ভোরে খ্রিষ্টানরা যুদ্ধের ময়দানে এসে জমায়েত হতে শুরু করল। খ্রিষ্টান ও মুসলিম বাহিনীর অবস্থানের ব্যবধান ৩-৪ মাইল। স্থানটি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে অনেক টিলা ও এলোমেলোভাবে অনেক গাছপালা।

খ্রিষ্টান সৈন্যদের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে তুমুল শব্দে রণবাদ্য বেজে উঠল। অশ্বারোহী খ্রিষ্টান সৈন্যরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে জয়ধ্বনি দিতে দিতে যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ হতে লাগল। মুজাহিদরাও ফজরের নামায পড়ে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে যেতে লাগল এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে শুরু করল। মুসলমানদের কাছে মাত্র আটশটি ঘোড়া। সেগুলো তারা থিওডমিরের পরাজিত সৈন্যদের থেকে গনিমতস্বরূপ পেয়েছিল। একটি ঘোড়ার ওপর তারিক, অপরটিতে মুগীছ এবং অন্যগুলোর ওপর অপরাপর মুজাহিদরা আরোহণ করেছে। বারো হাজার সৈন্যের অবশিষ্ট সবাই পদাতিক। আবার নবাগত বাহিনীর অধিকাংশই লাঠিয়াল। তারা লাঠি দ্বারাই যুদ্ধ করত।

মুসলিম বাহিনীর কাছে পর্যাপ্ত ঢাল, তলোয়ার কিংবা বর্শা নেই। বলতে গেলে তারা একরকম নিরস্ত্র। অন্যদিকে খ্রিষ্টানরা সব রকম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তার ওপরে তারা সকলেই নিয়মিত যোদ্ধা। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশই সাধারণ লোক। কেবল জিহাদের আগ্রহই তাদের স্বদেশ থেকে এত দূরদেশে নিয়ে এসেছে। অস্ত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও তারা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

মুসলিম সৈন্য সংখ্যা সর্বমোট বারো হাজার এবং খ্রিষ্টান সৈন্য সংখ্যা নব্বই হাজার। সর্বসাকুল্যে খ্রিষ্টান সৈন্য সংখ্যা মুসলিম সৈন্যের প্রায় আটগুণ। সৈন্য

সংখ্যা কিংবা অস্ত্রশস্ত্র কোনো দিক দিয়েই খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের তুলনা হয় না। মুসলমানরা কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের বিশ্বাস, বিজয় একমাত্র আল্লাহর হাতে।

মুসলমানরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলে দেখতে পেলেন, খ্রিষ্টানদের তাঁবু থেকে একটি সুন্দর ঘোড়ার গাড়ি বেরিয়ে আসছে। চারটি ঘোড়া রূপার তৈরি গাড়িটিকে টেনে আনছে। গাড়ির ওপর একটি রেশমী গদিতে উপবিষ্ট সম্রাট রডারিক। তারিক মুজাহিদদের সারি থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন,

মুজাহিদ ভাইয়েরা! তোমরা মনে করো না, তোমরা নিরস্ত্র আর খ্রিষ্টানরা অস্ত্রসজ্জিত। এটা ঠিক, খ্রিষ্টানরা সংখ্যায় অধিক। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, আল্লাহ্ সর্বদা মুসলমানদের এমন অবস্থাতেই বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ তো জান্নাতের বিনিময়ে মুসলমানদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন। তা কতই না সহজ ও ভালো সওদা! মুসলমানরা বিশ্বাস করে, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকেরই মৃত্যু অবধারিত। অতএব জিহাদে শরীক হয়ে জীবনদানে বাধা কোথায়?

শহীদদের প্রতিদান তো নিশ্চিত জান্নাত। জান্নাতের চাইতে উত্তম প্রতিদান আর কী হতে পারে? পৃথিবীর ইতিহাস মুসলমানদের কীর্তি-কাহিনিতে ভরপুর। প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই মুসলমানরা জয়লাভ করেছে। কেননা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন তিনি মুসলমানদের সাহায্যকারী। আর আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী তাদের জয় তো অবশ্যম্ভাবী। তাই আমরা বিশ্বাস করি, আমরা অতি অবশ্যই জয়লাভ করবো। তোমরা সিংহপুরুষদের বংশধর। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষ শত্রুদের খতম করো।

তারিক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করেই দেখতে পেলেন, খ্রিষ্টান সৈন্যরা উত্তাল তরঙ্গেও মতো সামনে এগিয়ে আসছে। তাদের অগ্রসরমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, হয়তো মুহূর্তের মধ্যেই মুসলিম মুজাহিদদের পায়ের তলায় পিষে ফেলবে। খ্রিষ্টান সৈন্যদের সারি পূর্ব থেকেই পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মুগীছকে বাহিনীর ডানের এবং তাহিরকে বামের অংশের দায়িত্ব দিয়ে তারিক নিজে পশ্চাদভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। খ্রিষ্টান সৈন্যরা রণবাদ্যের তালে তালে দ্রুত সামনে এগুতে লাগল।

তারিকও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুসলিম মুজাহিদরা সামনে বাড়তে লাগলেন। বেলা বেড়ে গেছে। রণাঙ্গন জুড়ে সূর্যালোক

ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্যের আলোতে সিপাহিদের পোশাক চমকাচ্ছে। উভয় দলই ধীরে ধীরে সামনে এগুচ্ছে। ফলে দু'দলের মধ্যকার দুরত্ব কমে আসছে। খ্রিষ্টান সৈন্যদের সারি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকায় ডানদিকের সৈন্যরা বামদিকের আর বামদিকের সৈন্যরা ডানদিকের অংশ দেখতে পাচ্ছিল না। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তারা তীরের মাধ্যমে যুদ্ধ করবে; কিন্তু খ্রিষ্টানরা তীর দ্বারা যুদ্ধ করে সময় ক্ষেপন করতে চাচ্ছিল না। মুসলমানরা তা বুঝতে পেরে বর্শা উঁচিয়ে ধরলেন। খ্রিষ্টনরাও আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত ছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। পূর্ণোদ্যমে বর্শা নিক্ষেপ শুরু হলো। খ্রিষ্টানরা প্রথম থেকেই নানা প্রকার হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছিল।

আক্রমণ শুরু করার পূর্বে তারিক তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন। তৃতীয় তাকবীরের সময় সকল মুজাহিদ সম্মিলিতভাবে তাকবীর দিলেন। অতঃপর একযোগে আক্রমণ শুরু হলো। মুসলমানরা ছিল পাথরের মতো অনড় আর সুদৃঢ়। তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। খ্রিষ্টানরা দ্বিতীয় বারের মতো হামলা চালালো। প্রথম আক্রমণেই মুজাহিদরা অনেক খ্রিষ্টানকে হত্যা করলো।

খ্রিষ্টানদের অবস্থা টলটলায়মান। অসংখ্য খ্রিষ্টান হতাহত হতে লাগল, উহ্-আহ করতে করতে তারা একের পর এক ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝরে পড়তে লাগল। এ অবস্থা দেখে অন্য খ্রিষ্টানরা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আরো ক্ষীপ্র গতিতে হামলা চালালো। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তীব্রতার কোনো প্রভাব দেখা গেল না। তারা যেরকম দৃঢ়তা নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছিল, সেভাবেই যুদ্ধ করে চলল। যতদূর পর্যন্ত সৈনিকরা প্রসারিত ছিল যুদ্ধও ততদূর ছড়িয়ে পড়ল। তখন পর্যন্ত প্রথম সারির মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চাতের সারির সৈন্যরা ছিল আক্রমণের অপেক্ষায়। খ্রিষ্টানদের প্রথম সারির কোনো সৈন্য মারা গেলে পেছনের সারি থেকে আরেকজন এসে সে স্থান পূরণ করছিল। কিন্তু মুজাহিদদের দ্বিতীয় সারির কোনো মুজাহিদের সামনে আসার প্রয়োজন পড়েনি। প্রথম সারির মুজাহিদরা চাচ্ছিল, তারা শীঘ্রই খ্রিষ্টানদের প্রথম সারি সাফ করে ফেলবে। এ ছাড়াও অশ্বারোহী খ্রিষ্টানরা যাতে পদাতিক মুজাহিদদের কাছে পৌঁছতে না পারে, এজন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। কিন্তু বর্শা যুদ্ধ সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়ায় উভয় পক্ষই বর্শা ছেড়ে তলোয়ার ধরলো। শুভ্র-স্বচ্ছ তলোয়ার সূর্যের আলোকচ্ছটায় ঝিকমিক করে উঠলো। যুদ্ধের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের উঠানামাও দ্রুততর হচ্ছিল। খ্রিস্টানরা ঢাল দ্বারা তলোয়ারের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছিল; কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হতে লাগল। মুজাহিদদের প্রবল আক্রমণে খ্রিষ্টানদের হাত, পা, মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল। সূর্যের তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রবলতাও বৃদ্ধি পেলো। খ্রিষ্টানদের প্রথম সারির সৈন্য প্রায় সকলেই একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আরোহীর মৃত্যুর পর তাদের ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে লাগল।

মুসলিম মুজাহিদরা সহিসবিহীন ঘোড়াগুলো ধরে ফেলে সেগুলোর পিঠে চেপে বসলেন। ইতোমধ্যে এলোপাথাড়ি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের মধ্যে ও খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চারিদিকে তখন ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। তলোয়ারের দ্রুত উঠানামায় রণাঙ্গন জুড়ে বিরাজ করছে এক অন্যরকম দৃশ্য। আরোহীদের অবস্থান ও তলোয়ারের দ্রুত উঠানানামা দেখে মনে হচ্ছে, শস্যক্ষেত্র থেক ফসল কাটা হচ্ছে। রক্তস্নাত তলোয়ার সঞ্চালণে মানবরূপী শস্যের যবনিকাপাত ঘটছে।

খ্রিষ্টানরা প্রথম থেকেই শোরগোল করছে। তাদের শোরগোলের আওয়াজ যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে কয়েক মাইল জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। খ্রিষ্টান সৈন্যরা তখনও মনোবল না হারিয়ে বিপুল উত্তেজনা ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলছে। তাদের ইচ্ছা, যত শীঘ্র সম্ভব মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। কিন্তু মুসলমানরা এমন ইস্পাতসম প্রাচীর গড়ে তুলেছে যে না তাদের মারা যাচ্ছে আর না তারা পিছপা হচ্ছে। যে খ্রিষ্টানের ওপর তারা একবার আক্রমণ চালাচ্ছে, তাকে যমের বাড়ি না পাঠিয়ে ছাড়ছে না। তাদের নাঙ্গা তলোয়ারের আঘাতে ঢাল দ্বিখণ্ডিত হয়ে শত্রুদের মাথায় গিয়ে আঘাত হানছে।

একদিকে মুগীছ আর-রূমী, অপর দিকে তারিক আক্রমণ চালাচ্ছেন। তারা যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছেন, সে দিকেই একের পর এক শত্রু সৈন্য কচু-কাটা করতেন। এভাবে বহু শত্রুসৈন্য নিহত হলো। সবচেয়ে বেশী উদ্যম নিয়ে লড়ছিলেন স্বয়ং সেনাপতি তারিক। তাঁর এক হাতে পতাকা অপর হাতে তলোয়ার। তাঁর ক্ষীপ্র আক্রমণ শত্রুদের মধ্যে এমন ভয়ের সৃষ্টি করলো যে কেউই তাঁর মুখোমুখি হতে সাহস করছে না।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে এসেছে। তখনো তীব্রগতিতে লড়াই চলছে। একদল অপর দলের মধ্যে ঢুকে একাকার। খ্রিষ্টানরা ধারণা করেছিল, ঘোড়ার পায়ের তলেই মুসলমানদের পিষে ফেলা যাবে; কিন্তু দেখা গেল, পদাতিক মুজাহিদদের বর্শার আঘাতে অশ্বারোহী খ্রিষ্টানরাই একের পর এক ধরাশায়ী হয়ে যাচ্ছে। খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারল, মুজাহিদদের পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহী খ্রিষ্টানদের চাইতেও বজ্রকঠিন। পদাতিক মুসলমানরা যে ঘোড়া লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ

করে সে ঘোড়াই পায়ে আঘাত লেগে মারা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আরোহীও ধরাশায়ী হচ্ছে। আবার যে আরোহীকে লক্ষ্য করে মুজাহিদরা তীর নিক্ষেপ করছে, তীর তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আহত ব্যক্তিও চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

স্থানে স্থানে খ্রিষ্টানদের ছিন্ন ভিন্ন দেহ স্তূপাকারে পড়ে আছে, রক্তের স্রোত বয়ে চলছে। খ্রিষ্টানরা লক্ষ্য করছিল, এককভাবে তাদেরই মৃত্যু হচ্ছে। অপরদিকে মুসলমানদের মৃত্যুর হার এতোই নগণ্য যে বুঝাই যাচ্ছে না। কোনো মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করলেও কমপক্ষে ১০-১৫জন শত্রু সৈন্য খতম করে তারপর শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিতেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একই গতিতে যুদ্ধ চলল। দু'দলেরই আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, একদিনেই চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলবে। তথাপি সন্ধ্যা হয়ে আসায় তা আর সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে উভয় পক্ষই যুদ্ধ স্থগিত করে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল।

দ্বিতীয় অংশ

এক. হারিয়ে গেল বিলকিস

ইসমাঈল ও বিলকিস দু'জনই পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় উঠে গিয়েছিলেন। থিওডমিরের অনুচররা যখন তাদের তালাশ করছিল, তাঁরা পাহাড়ের ওপরেই লুকিয়ে ছিলেন। শত্রুরা চলে গেলে তারা স্বস্তিবোধ করেন এবং নিচে নেমে আসার পথ খুঁজতে লাগলেন; কিন্তু অন্ধকারে শত্রু সৈন্যের ভয়ে তারা যে চূড়ায় উঠেছিলেন, তা অত্যন্ত খাড়া এবং উঁচু। কিন্তু এখন সেখান থেকে নিচে নেমে আসা কষ্টকর হয়ে পড়ল। সেখান থেকে নিচে তাকাতেও ভয় করে। বিলকিস বললো, আমরা এখন নামব কি করে?

ইসমাঈল বললেন, আমরা যে পাশ দিয়ে উঠে এসেছি সেখান দিয়ে তো দেখছি নামা যাবে না।

বিলকিস : কিন্তু আমরা উঠলাম কী করে?

ইসমাঈল : শত্রুর ভয়ে রাতের অন্ধকারে উঠে এসেছিলাম, কিন্তু এখন ...।

বিলকিস : কিন্তু এখন কী?

ইসমাঈল : আমার ওঠা তো তেমন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়; কিন্তু তোমার ...।

বিলকিস : আমি কেমন করে উঠলাম এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার, তাই তো!

ইসমাঈল : হ্যাঁ।

বিলকিস (ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে) : কেন?

ইসমাঈল : কারণ তোমরা স্পর্শকাতর, দুর্বল। তাই তোমার পক্ষে খাড়া চূড়ায় ওঠা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার।

বিলকিস (কিছুটা আনমনা হয়ে) : কেন আমি কি মানুষ নই?

ইসমাঈল : মানুষ! তুমি কি মানুষ?

বিলকিস : তাহলে কী?

ইসমাঈল : আমি কেমন করে বলব, তুমি কী?

বিলকিস (অভিমানের সুরে) : যান, আপনার সাথে আমার আর কোনো কথা নেই।

ইসমাঈল (বিস্মিত হয়ে) : কেন, আমি কী কসুর করেছি?

বিলকিস : আপনি কি বুঝতে পারছেন, আমি কী বলেছি?

ইসমাঈল সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, ঠিকই বলেছ। আমি যেন মাঝে মধ্যে নিজেই নিজের মাঝে হারিয়ে যাই, কিছুই বুঝতে পারি না। পাগলের মতো হয়তো আজেবাজে বকছি। তুমি কিছু মনে কারো না।

বিলকিস (বিস্ময়ের সঙ্গে) : আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?

ইসমাঈল : তাই মনে করতে পারো।

বিলকিস : না না, এরকম কথা মুখে আনবেন না, আমার ভয় হয়।

ইসমাঈল : কিসের ভয়?

বিলকিস : ঈশ্বর না করুন আপনি যদি পাগল হয়ে গেলে আমার কী হবে?

ইসমাঈল : তোমার কোনো ভয় নেই।

বিলকিস : কেন?

ইসমাঈল : কারণ আমার এ পাগলামী তোমারই রূপ লাবণ্যের সৃষ্টি।

বিলকিস লজ্জা পেয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলো। ইসমাঈল বিলকিসের লাজুক মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উভয়েই নির্বাক, নিশ্চুপ। বিলকিসের দৃষ্টি তখন দূরে, বহুদূরে। প্রকৃতির শ্যামলিমা উপভোগ করছে। কিছুক্ষণ পর ইসমাঈল বিলকিসকে বললেন, তুমি এমনভাবে তাকিয়ে থেকো না, তা হলে আমি আত্মহারা হয়ে যাই।

বিলকিস লজ্জা পেয়ে গেল। প্রসঙ্গ পাল্টে ইসমাঈলকে বললো, আপনার কি এখানে থাকতে ভালো লাগছে?

ইসমাঈল : পাহাড়ের উঁচু চূড়া, চারিদিকের সবুজ শ্যামল দৃশ্য, রঙবেরঙের ফুলের সৌরভ আর এর মাঝে তোমার উপস্থিতি স্থানটিকে একেবারে জান্নাতে পরিণত করেছে।

বিলকিস : আরে, এ যে কবিত্ব দেখছি। আপনি কবি নাকি?

ইসমাঈল : প্রত্যেক আরবই জন্মগত কবি।

বিলকিস মুচকি হেসে বললো, ঠিক আছে কবি সাহেব! আমরা কীভাবে নামব, এখন সে কথাই ভাবা যাক। যেখানে লোকজন নেই সেখানে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগে না। চাই তা স্বর্গই হোক বা অন্য কিছু।

ইসমাঈল বললেন, এসো, দেখা যাক কী করা যায়। এই বলে তারা পথ চলতে শুরু করেন। সম্পূর্ণ পাহাড়টিই নানারকম ফুল-ফলের বৃক্ষ দিয়ে ঢাকা। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজের সমারোহ। এসব দলিত মথিত করেই তাদের এগুতে হচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করছেন। প্রকৃতি গোটা পাহাড়টিকে ফুলে-ফলে ভরে রাখায় তাদের খাবারের অভাব হলো না। ক্ষুধা পেলে গাছ থেকে ফল পেড়ে ক্ষুধা নিবারণ করছেন। এভাবে সারাদিন পথ চলছেন। রাত হয়ে এলে কোনো পাথরের ওপর শুয়ে পড়ছেন। খাবার হিসেবে ফলমূলতো পাওয়া গেলেও কোথাও পানির সন্ধান

মিললো না। এভাবেই কয়েকদিন কেটে গেল; কিন্তু পানির আর হদিস পাওয়া গেল না। রসালো ফল খেলে পিপাসার সাময়িক নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তৃষ্ণা থেকেই যায়। ফলে অভাব ঠিক বোধ করতে হচ্ছে।

ইসমাঈল জাতে আরব। তার ওপর পুরুষ। তাই পানির কষ্ট তাঁর জন্য সহজাত ব্যাপার। ফলে কয়েকদিনের পিপাসায় তাঁর তেমন কষ্ট অনুভব হয়নি; কিন্তু বিলকিস তাতে অভ্যস্ত না থাকায় পানির পিপাসায় কষ্ট পাচ্ছিল। তার ওষ্ঠদ্বয় শুকিয়ে গিয়েছিল। সে কাতর হয়ে ছটফট করছিল।

বিলকিসের নাজুক অবস্থা ইসমাঈলের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ দুর্দশা দেখে তিনি মনোকষ্টে ভুগছিলেন। তাকে রসালো ফল খাইয়ে পিপাসা লাঘবের চেষ্টা করছিলেন। বিলকিস নিজেও ধৈর্যধারণের যথেষ্ট চেষ্টা করতে থাকলো।

বিলকিস নিজেও চাচ্ছিল তার কোনো অস্থিরতা যেন ইসমাঈল বুঝতে না পারেন। তাই সে জোর করে মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি এতোই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে হাঁটতেও পারছিল না। একটু হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তো।

সমতলভূমি হলে হয়তো পথ চলতে এতোটা কষ্ট হতো না। একে তো খাড়া পাহাড়ী পথ, তদুপরি এদিক ওদিক পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় সোজা পথে নামা সম্ভব হচ্ছিল না। কখনো উপরে উঠতে হতো আবার কখনো নিচে নামতে হচ্ছিল। ফলে বিভিন্ন চূড়ার আড়ালে আবডালে ঘুরে ঘুরেই তাদের দিন চলে যাচ্ছিল। কয়েকবার এমন হয়েছে, একই শৃঙ্গের চারিপাশে একাধিকবার চক্কর দিয়েছেন; কিন্তু পথ না পাওয়ায় নামতে পারেননি।

এভাবে ঘুরাঘুরি করেই তাদের কয়েকদিন কেটে গেল। এ সময় বিলকিসের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। পিপাসায় তিনি আরো কাতর হয়ে পড়লেন। একদিন দুপুরে আর পথ চলতে না পেরে একটি পাথরের ওপর বসে পড়লেন। সূর্য তখন ঠিক মধ্য গগনে। মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বিলকিসের রুক্ষ চুলগুলো উড়ে এসে তার লাবণ্যময় চেহারায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে, ওষ্ঠের ওপর এসে ভিড় জমাচ্ছে। এভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে একপর্যায়ে সে ঢলে পড়ল এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। ইসমাঈলের বুঝতে বাকী রইল না, পিপাসার তীব্রতায় তার এ দুর্দশা। বিলকিসকে সেখানে রেখেই তিনি তৎক্ষণাৎ পানির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

এগুতে এগুতে তিনি ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। তাঁর আশা, বিলকিস হয়তো জেগে উঠবে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটি টিলার আড়ালে পড়ে তিনি দ্রুত দৌড়াতে

লাগলেন। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে পানির খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা, হয়তো এখানো কোনো ঝরনার সন্ধান মিলে যাবে।

তিনি যতই এগুচ্ছেন ততই সবুজ তৃণলতায় ঢাকা টিলার সন্ধান পাচ্ছেন। এসব দেখে তাঁর ধারণা হলো, হয়তো ধারে কাছেই কোথাও পানির ঝরনা আছে। কিছুদূর এগিয়ে তিনি একটি ফাটল দেখতে পেলেন। ফাটলটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তিনি দেখতে পেলেন, ফাটলটির গভীরে অসংখ্য উজ্জ্বল পাথর টুকরো পড়ে আছে। এগুলো এতো দীপ্তিমান যে সেদিকে চোখ মেলে তাকানোই যাচ্ছে না। তিনি বুঝতে পারলেন, আল্লাহ তাঁকে হীরে মুক্তোর খনিতে নিয়ে এসেছেন; কিন্তু সেগুলো এতোই গভীরে যে তাঁর পক্ষে সেখানে নেমে ফিরে আসা সম্ভব না।

ইসমাঈল ফাটলটি পেরিয়ে সামনে এগুলেন। আরো কিছুদূর এগিয়ে তিনি পানির আওয়াজ শুনতে পেলেন। তার মন আনন্দে ভরে গেল। যে দিক থেকে শব্দ আসছিল, তিনি সে দিকেই যেতে লাগলেন। এভাবে অনেক দুর যাওয়ার পর পাহাড়ের প্রান্তে এসে দেখতে পেলেন, নিকটস্থ একটি উঁচু পাহাড় থেকে পনি নেমে আসছে এবং পাথর বেয়ে নিচে প্রবাহিত হচ্ছে।

স্থানটি তাঁর খুবই কাছে। তারও খুব পিপাসা পেয়েছিল; কিন্তু তিনি জানতেন, বিলকিস পানির পিপাসায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাই বিলকিসের আগে পানি পান করতে তাঁর লজ্জাবোধ হলো। ফলে তিনি পানি পান থেকে বিরত থাকলেন। দ্রুত বিলকিসের কাছে ফিরে আসলেন। কিন্তু বিলকিসকে অজ্ঞান অবস্থায় যে স্থানে রেখে গিয়েছিলেন, সেখানে তাকে পাওয়া গেল না। তাতে তিনি অন্তন্ত ভীত হয়ে পড়লেন।

ইসমাঈল পাগলের মতো এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকেন। বনকুঞ্জের আড়ালে, গাছের উপরে, টিলার আড়ালে আবডালে তাকে খোঁজ করলেন; কিন্তু কোনো হদিস পেলেন না। চিন্তায় অস্থির হয়ে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। আরো দ্রুত দৌড়াতে লাগলেন। চিৎকার করে বিলকিসের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন; কিন্তু তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল তাঁর ডাকার শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল। তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। একটি পাথরের ওপর বসে তিনি হারিয়ে গেলেন চিন্তার রাজ্যে।

দুই. বিরাট বিজয়

৯২ হিজরি সালের ২রা শাওয়াল খ্রিষ্টান ও মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে যে সংঘটিত যুদ্ধ সারাদিন চলল; কিন্তু কারো পক্ষেই বিজয়লাভ সম্ভব হলো না। ইতোমধ্যে রাত হয়ে এলো। উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হলো। সবাই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেল।

পরদিন সকালে উভয় শিবিরে আবার রণ দামামা বেজে উঠল। সাজ সাজ রবে সকলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুদলেরই মরণপণ চেষ্টা প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে বিজয়মাল্যে ভূষিত হওয়া। রণবাদ্যের সুর, সৈন্যদের জয় ধ্বনি এবং আহতদের আর্তচিৎকারে চতুর্দিক মুখরিত। গত দিনের মতো আজো তুমুল যুদ্ধ চলছে। স্থানে স্থানে স্তূপাকারে মরদেহ পড়ে আছে। বয়ে চলছে রক্তের স্রোত; কিন্তু আজো যুদ্ধে মীসাংসা হলো না। রাত হয়ে আসায় দ্বিতীয় দিনের মতো যুদ্ধবিরতি দিতে হলো। তৃতীয় দিন সকালে আবার রণবাদ্য বেজে উঠল। উভয়পক্ষ পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বহু লোক হতাহত হলো। সারাদিন যুদ্ধ চললো কিন্তু সেদিনও যুদ্ধের ফায়সালা হলো না। সন্ধ্যা হয়ে এলে উভয় পক্ষ যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালো।

৯২ হিজরির ৫ই শাওয়াল। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিষ্টানরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসে পড়ল। সংখ্যায় তারা অনেক বেশি। তাদের বিরাট বিরাট সারি দেখে মনে হচ্ছে, এক বিশাল জনসমুদ্র। সম্রাট রডারিক বিশেষ এক আসনে বসে খ্রিষ্টানদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন,

হে খ্রিষ্টান সৈন্যদল! তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি। শত্রুদলের সৈন্য সংখ্যা তোমাদের তুলনায় এক অষ্টমাংশ। এরপরও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ক্রমাগত তিন দিন যুদ্ধ করেও তোমরা শত্রুদের পরাভূত করতে পারছ না। তোমাদের জন্য এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমি চাই, আজ যে করেই হোক তোমরা শত্রুদের পরাজয় বরণে বাধ্য করবে।

খ্রিষ্টানরা আবার নতুন করে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। হয়তো বিজয়, নয়তো মৃত্যু প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। রণবাদ্য বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত ক্ষীপ্রগতিতে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুসলিম মুজাহিদরা ফজরের নামায পড়েই যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারিক সকলের সামনে দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে বলতে

লাগলেন, মুজাহিদ ভাইয়েরা! বিগত তিনদিন ধরে তোমরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছ; কিন্তু কোনো মীমাংসা হয়নি। এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে কতদিনে শেষ হবে, আল্লাহই জানেন। যুদ্ধের এই শ্লথগতি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে পেছনে নিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের পূর্বপুরুষরা খ্রিষ্টানদের অস্তিত্বই স্বীকার করতেন না; খ্রিষ্টানরা সব সময় তাদের হাতে পরাজিত হতো। আজ সেই খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধেই তোমাদের যুদ্ধ হচ্ছে। আশা করি তোমরাও তাদের পরাস্ত করবে। মনে রেখো, মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেন। তোমরা ধর্মপ্রাণ, তাই আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করেন। তোমরা সাহসী হও, আল্লাহর নাম নিয়ে পূর্ণোদ্যমে হামলা চালাও। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের বিজয় দান করবেন।

কথা শেষ করেই তারিক তিন বার আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। তৃতীয় তাকবীরের সঙ্গে সঙ্গে সকল মুজাহিদও সমস্বরে ধ্বনি তুললেন। আল্লাহর বড়ত্বের শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠে। খ্রিষ্টানরাও অনেকটা ভীত হয়ে পড়ে। তাকবীর শেষ করেই মুজাহিদরা সামনে এগুতে থাকেন। অপরদিক থেকে খ্রিষ্টান সৈন্যরাও দ্রুত এগিয়ে আসছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয়পক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। উভয় দলেই বিরাজ করছিল তুমুল উত্তেজনা। বিজলির চমকের মতো শুভ্র তলোয়ার দ্রুত উঠানামা করছে। তলোয়ারের আঘাতে ছিন্ন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে; রক্তের বন্যা বয়ে চলছে। খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। যুদ্ধ চারিদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, একদল অন্য দলের মধ্যে ঢুকে গেছে। ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল রক্তস্নাত তলোয়ার। চারিদিকে মার মার রব। খ্রিষ্টানদের আর্তচিৎকারে চারিদিকে নিনাদিত। কান পাতার জো নেই। একেকজন সৈন্য একেকটি ক্ষীপ্ত বাঘ। প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত। সকলেই যুদ্ধে চূড়ান্ত মীমাংসার প্রত্যাশী। উভয়পক্ষের ধারালো তলোয়ার একাধারে সংহার করে যাচ্ছে। সূর্যের প্রখরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধের গতিও তীব্রতর হয়ে গেছে। যে গতিতে খ্রিষ্টানরা আঘাত হানছে, ঠিক একই গতিতে মুসলমানরা পাল্টা আঘাত হেনে খ্রিষ্টানদের পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করছে। সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়ে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের তুলনা নেই। খ্রিষ্টানরা প্রায় সকলেই অশ্বারোহী; অপরদিকে খুব কমসংখ্যক মুসলমানেরই ঘোড়া আছে। খ্রিষ্টানরা সংখ্যায়ও অনেক বেশি। তাছাড়া প্রত্যেক খ্রিষ্টান সৈন্যের কাছেই সকল প্রকার অস্ত্র আছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কাছে হাতে গোনা অস্ত্র। খ্রিষ্টানরা বর্ম পরিহিত কিন্তু মুসলমানদের পরনে সাধারণ পোষাক। এরপরও মুসলিম

মুজাহিদরা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলছে। তাঁরা যেদিকে হামলা চালাচ্ছেন সারির পর সারি ওলটপালট করে দিচ্ছেন। তাঁদের তলোয়ারের অব্যর্থ আঘাত ঢাল ভেদ করে শত্রুদের মস্তকে গিয়ে আঘাত হানছে। মুসলমানরা খানিকটা নুইয়ে মাথা বাঁচিয়ে যুদ্ধ করতেন। আজো তারা একইভাবে যুদ্ধ করছেন। মুজাহিদরা ১৫-২০টি সারি পরাভূত করে সামনে এগিয়ে গেলেন। ইতোমধ্যে সহস্রাধিক খ্রিষ্টান সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হলো।

মুগীছ আর-রূমী ডানদিকস্থ মুজাহিদদলের অধিনায়ক। তিনি অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর কাছে অশ্ব ছিল। তিনি যে দিকে ছুটতেন একের পর এক শত্রু সৈন্যকে ভূপাতিত করে এগিয়ে যেতেন। তিনি যে উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করছেন, তাঁর অনুগামী সৈন্যরাও একই গতিতে যুদ্ধ করছেন। সকলেই বীর বিক্রমে শত্রু সৈন্যব্যূহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ দলের হাতে অসংখ্য শত্রু সৈন্য নিহত হলো।

বামদিকস্থ বাহিনীর অধিনায়ক তাহির। তিনি টগবগে তরুণ যুবক। রক্তে তারুণ্যের উদ্দীপনা। তিনিও অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলছেন। তিনি প্রতিটি আক্রমণেই অন্তত দু-চার জন খ্রিষ্টান সৈন্যকে খতম করতেন। তাঁর অনুগামী সৈন্যদলের লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টনদের ডানদিকস্থ সেনাদলকে পর্যুদস্ত করা। এ জন্য তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলছেন।

অন্যদিকে খ্রিষ্টানরাও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে; কিন্তু তাদের কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসু হচ্ছে না; বরং যারাই সামনে এগিয়ে আসছে তারাই নিহত হচ্ছে। যুদ্ধের গতি তখন অত্যন্ত তুঙ্গে। এলোপাতাড়ি যুদ্ধ চলছে। বেশ কিছু মুজাহিদও শাহাদাতবরণ করেছেন। এদের অধিকাংশই শাহাদাতবরণ করেছেন ঘোড়ার খুরের আঘাতে; কিন্তু কোনো মুজাহিদই কমপক্ষে দশজন খ্রিষ্টান সৈন্যকে হত্যা না করে শহীদ হননি। তদুপরি শহীদদের সংখ্যা এতো কম যে বুঝাই যায় না। অপর দিকে খ্রিষ্টানদের নিহতের সংখ্যা এতো বেশী, যে কেউই তা বুঝতে পারবে।

মুজাহিদদের মধ্যস্থলে আছে তারিক। তাঁর এক হাতে ইসলামী ঝাণ্ডা অপর হাতে তলোয়ার। তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যে দিকে আক্রমণ করছেন, সে দিকে মাতম পড়ে যাচ্ছে। যে অশ্বারোহীকে ধাওয়া করছেন, তার মৃত্যু অবধারিত। তিনি যে উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করছেন তাতে মনে হচ্ছে, তিনি একাই সমস্ত খ্রিষ্টানকে সাবাড় করে ফেলবেন। অন্য মুজাহিদরাও একইভাবে আক্রমণ করে চলছেন। মুসলিম সৈন্যরা পঞ্চাশজন পঞ্চাশজন, ষাটজন ষাটজন করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। তাঁরা কোনো অশ্বারোহী

শত্রু সৈন্যকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে কোনো একজন সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসছেন। দুপুর পর্যন্ত এভাবে প্রায় পাঁচশ ঘোড়া মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এলো। শখানেক অশ্বারোহী মুজাহিদ তারিকের দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তারিক যে দিকেই আক্রমণ চালাচ্ছেন, অশ্বারোহী সে দলটি সে দিকেই ছুটছেন। শত্রু নিধনের হিড়িক পড়ে গেল। তাঁরা যে সারির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, একজন একজন করে সে সারির সকল সৈন্য সাফ করে দিচ্ছেন। এভাবে অসংখ্য খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হয়ে চলছে। মুজাহিদরা সম্রাট রডারিকের দিকে এগুতে লাগলেন। একে পর এক সারি অতিক্রম করে তাঁরা এগুচ্ছিলেন। রডারিক ছায়াদার গাছের নিচে একটি আসনে বসে হেলান দিয়ে বসে যুদ্ধে দৃশ্য দেখছিল। একের পর এক খ্রিষ্টান সৈন্যের নিহত হতে দেখে তার রাগ হচ্ছিল। তখন পর্যন্ত তার মনে আশা ছিল, খ্রিষ্টানরা সংখ্যায় মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি। সুতরাং তারাই জিতবে। এমন সময় তিনি কাছাকাছি কোথাও শোরগোল শুনতে পেল। দেখতে পান যে, মুসলিম সেনাপতি তারিক শতাধিক অশ্বারোহী নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছেন। সে ঘাবড়ে গিয়ে নিজের ঘোড়া খোঁজ করলো। ঘোড়াটি তার কাছেই প্রস্তুত ছিল। রঙ ধবধবে সাদা। নাম ওরিলিযা। ঘোড়াটি কাছে আসতেই সম্রাট তার পিঠে চড়ে বসে তলোয়ার বের করলেন। তলোয়ারটি তুলে ধরতেই তার সামনে সে অলৌকিক গম্বুজের দৃশ্য ভেসে উঠল। গম্বুজে চামড়ার ফিতায় তিনি যে দৃশ্য দেখেছিলেন, এ যুদ্ধে যেন তিনি দৃশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। মৃত্যুর এক ভয়াল দৃশ্য তার সামনে ভেসে উঠল। তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। সেনাপতি তারিককে সামনেই দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখামাত্রই রডারিকের শরীক ঘেমে গেল। তারিক তাকে বললেন, পাপিষ্ঠ! সাহস থাকে তো মোকাবিলা কর।

রডারিক তার রক্ষীদলের দিকে তাকালেন। কিন্তু তারাও মুজাহিদদের সঙ্গে যুঝছিল। রডারিকের আশা করছিল, রক্ষীদল তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু তাদের যুঝতে দেখে সে আরো ঘাবড়ে গেল। তখন তারিক উদ্যত তলোয়ার হাতে এগিয়ে গেলেন। রডারিক কী যেন বলতে চাচ্ছিল। এমনি মুহূর্তে তারিকের তলোয়ার রডারিকের মাথায় গিয়ে আঘাত হানল। রডারিক বিকট চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সে ঢলে পড়ার পর তারিক তার সৈন্যদলের ওপর আরো তীব্র আঘাত হানলেন। তারা সে আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে পিছিয়ে গেল। মুজাহিদরা আবার হামলা চালালেন। এত অনেক সৈন্য নিহত হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সহস্রাধিক শত্রু সৈন্য নিহত হলো। এতে খ্রিষ্টানরা হতোদ্যম হয়ে গেল। তারা নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। মুজাহিদরা

তাদের পিছে ধাওয়া করে বহুদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, একজন খ্রিষ্টানও দাঁড়িয়ে নেই। অধিকাংশই নিহত হয়েছে; অবশিষ্টরা পালিয়ে গেছে। এই যুদ্ধে এতো বেশি খ্রিষ্টান নিহত হয়েছিল যে তাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা ছিল অসম্ভব। রণাঙ্গনে তাদের মরদেহ বহুদিন পর্যন্ত পড়ে ছিল। অপরদিকে দু'শ মুসলিম মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন।

এ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের শক্তিসাহস আরো বৃদ্ধি পায়। খ্রিষ্টানদের ওপর এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এটা সেই বিজয় যার স্মরণে খ্রিষ্টানজগতে আজো মাতম করে। অপরদিকে এ জয়েরর কথা মনে করে মুসলিম বিশ্ব আনন্দ উদযাপন পালন করে; উদ্যমী হয়।

তিন. অগ্রযাত্রা

সম্রাট রডারিক স্পেনের খ্যাতনামা সমরনায়কসহ ১০ হাজার সেরা যোদ্ধা নিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার ধারণা ছিল এই বিরাট সৈন্যদলের সামনে মুসলমানরা টিকতেই পারবে না; অথচ ফল হলো উল্টো। ঈমানী প্রেরণায় বলিয়ান ১২ হাজার মুজাহিদ ৯০ হাজার সৈন্যের বিশাল খ্রিষ্টান বাহিনীকে পরাজয়বরণে বাধ্য করেন। খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন, বিপুল সৈন্যবলে বলীয়ান হয়েও এই যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের শোচনীয় পরাজয় হয়। বহু খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হয়। বহু দিন পর্যন্ত মৃত খ্রিষ্টানদের হাড়মাংস যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

এই বিজয় লাভের পর মুজাহিদরা অবনত মস্তকে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানালেন। তারপর মুজাহিদদের কেউ কেউ খ্রিষ্টানদের তাঁবুর দিকে গেলেন আর কেউ কেউ মৃত খ্রিষ্টানদের ঘোড়াগুলো ধরার কাজে মনযোগী হলেন। সন্ধ্যার আগেই সকল শত্রুছাউনি ও ঘোড়া মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। এরপর শহীদদের মৃতদেহগুলো একত্রিত করে এবং জানাযা আদায় করার পর দাফন সম্পন্ন করা হলো। সূর্যাস্তের পর মুজাহিদরা মাগরিবের নামায আদায় করে রাতের খাবার তৈরি লাগলেন। আহতদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দেয়া হলো।

ইশার নামাযের পর রাতের খাবার খেয়ে সকলেই ঘুমিয়ে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুজাহিদরা প্রথমে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপর তারিক গনিমতের মালের হিসেব নিতে শুরু করলেন। সহস্র তাঁবু, অসংখ্য তলোয়ার, বর্শা, ঢাল, কামান ও তীর ধনুক হাতে এলো। রসদপত্রও ছিল প্রচুর। পরিধেয় বস্ত্র, নানাপ্রকার সাজসরঞ্জাম, তৈজসপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র মুসলমানদের হস্তগত হলো।

যে আসনটির ওপর বসে রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল, তা সোনা-রূপা খচিত। সাথে হাতির দাঁতের বিভিন্ন কারুকাজ। তাঁর শিরস্ত্রাণটি মূল্যবান ধাতুমণ্ডিত। তার ওপর আবার পান্না, হীরা, মোতি সংযোজিত। এসব সম্পূর্ণ গনিমতের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়াও শত্রুদের পরিত্যক্ত চৌদ্দ হাজার ঘোড়া পাওয়া গেল। মুজাহিদরা মৃত খ্রিষ্টানদের লৌহবর্মও খুলে নেন।

এসব দেখে মুজাহিদরা খুবই খুশি হলেন এবং অবনত মস্তকে আবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তারিক তখনই সকল অস্ত্রশস্ত্র মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ

করে দিলেন। ফলে সকল পদাতিকই ঘোড়া পেলেন, লৌহবর্ম পেলেন। যাদের কাছে অস্ত্র ছিল না, তারা অস্ত্র পেলেন। এরপর তারিক রডারিকের শিরস্ত্রাণ ও আসনটির ধাতুগুলোকে পৃথক করে বাকী জিনিসগুলোকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। এর চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে অবশিষ্ট এক ভাগ বায়তুল মালে পাঠানো ব্যবস্থা করলেন। তিনি এই যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ দিয়ে মূসার বরাবর একটি চিঠি লিখেন। চিঠিটির ভাষ্য এমন–

স্পেন অভিযানের সেনাপতি আল্লাহর বান্দা তারিক ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে প্রাচ্যদেশীয় গভর্নর মূসা ইবনে নুসায়রের প্রতি।

জনাব,
সালাম বাদ আরজ এই যে, সকল মুজাহিদকে নিয়ে আমরা ভালোভাবেই সবুজ দ্বীপে এসে পৌছেছিলাম। সেখান থেকে এগিয়ে আমরা সীমান্তে উপনীত হলে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা হয়। খ্রিষ্টান দলের সেনাপতি ছিলেন থিওডমির। আল্লাহর রহমতে আমরা তাদের পরাজিত করে সামনে এগিয়ে যাই। অবশেষে আমরা গোয়াদেল কুইভার নদীর তীরে পৌছি। সেখানে রডারিকের ৯০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়। তাদের সঙ্গে অনেক পাদরিও ছিল। তারা খ্রিষ্টানদের প্রেরণা যোগাতো। ক্রমাগত তিন দিন তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হলো। মুজাহিদরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন; কিন্তু খ্রিষ্টানরা বহু হতাহতের পরও পিছপা হয়নি। তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে; অবশেষে চতুর্থদিন মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের কাছে তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সেদিন ছিল ৫ই শাওয়াল ৯২ হিজরি। অবশেষে আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করলেন। রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা গেছে।[৮] এতে এতো অধিক সংখ্যক খ্রিষ্টান সৈন্য মারা গেছে যে, সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি । মাত্র দু'শজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন। যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়েছে। আমাদের প্রত্যেক মুজাহিদই একেকটি বাহন পেয়েছেন। রডারিকের শিরস্ত্রাণ, তার ব্যবহৃত আসনের বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু, পরিধেয় শাহী পোশাক সবই গনিমতরূপে মুসলমানদের হস্তগত

---

৮. একজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকের মতে, তারিক চিঠির সঙ্গে মূসার কাছে রডারিকের কর্তিত শিরও পাঠিয়েছিলেন। অপর এক ঐতিহাসিকের মতে, রডারিক আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর সময় রাতে এটগয়স নদীতে পড়ে মারা যায়। আরব ঐতিহাসিকদের মতে, রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেছিল। তবে তার শির মূসার কাছে পাঠানো হয়নি। –লেখক

হয়। আমাদের ধারণা, খ্রিষ্টানরা আমাদের ভীষণ ভয় পেয়েছে। এখন তারা আমাদের নাম শুনলেই ভয় পাবে। আমরা এখন আভ্যন্তরীণ অভিযানে লিপ্ত আছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ্ যেন আমাদের কামিয়াব করেন। কায়রোবাসীদের প্রতি আমাদের সালাম রইল। আপনার প্রেরিত সৈনদলটি যথাসময়েই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ওয়াসসালাম।

আপনার অনুগত
তারিক
স্পেন

এই চিঠি দিয়ে তারিক একজন দূতকে মূসার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সকল মুসলমানকে ডেকে পরবর্তী কর্মসূচি সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। এখন কোনদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু সে দেশটি সম্পর্কে মুজাহিদরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়ায় তাঁদের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হলো না। আমামন তখনও মুজাহিদদের সঙ্গেই আছেন। তারিক তাকে ডেকে পাঠালেন।

তারিক সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর দরবারে হাজারো শুকরিয়া, তিনি আমাদের এ মহাবিজয় দান করেছেন। এখন আমরা মূসার পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করব না সামনে অগ্রসর হবো, সে সম্পর্কে আপনারা পরামর্শ দিন।

মুগীছ : এ মহাবিজয়ের পর এখন আমরা বসে থাকলে খ্রিষ্টানদের ওপর থেকে বিজয়ের প্রভাব ম্লান হয়ে যাবে। আমার মতে, আর কালবিলম্ব না করে এখনই আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত।

যায়দ : পরবর্তী নির্দেশের জন্য এখানে বসে থাকলে আমার মতে হয়তো ভুল হবে। কিছু খ্রিষ্টান সৈন্য পালিয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে কিছু অফিসারও আছে। তারা আবার নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে পারে। তাতে আমাদের জন্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। এর চাইতে সামনে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের জন্য উত্তম।

তাহির : এখন আমরা যদি খ্রিষ্টানদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখি, তাহলে শত্রুরা কোথাও স্থির হতে পারবে না। আমরা শহরের পর শহর অধিকার করতে পারব।

মুগীছ : খ্রিষ্টানদের মধ্যে আমাদের সম্পর্কে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে, তাতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখলে তারা আরো ঘাবড়ে যাবে। ফলে নতুনভাবে সাহস সঞ্চারের কোনো সুযোগ পাবে না।

তাহির : আশ্চর্যের কিছু নেই, আমরা শীঘ্রই হয়তো স্পেনের রাজধানী অধিকার করতে সক্ষম হবে।

আমামন : আমার ধারণা, খ্রিষ্টানদের ওপর আপনারা যে বিজয় লাভ করেছেন, তাতে তাদের সকল অহংকার ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। তারা এতোটাই ভয় পেয়েছে যে, আপনাদের দেখামাত্রই পালিয়ে যাবে।

তারিক : তাহলে আমাদের সামনে এগুনো উচিত।

যায়দ : নিশ্চয়ই।

তারিক : কিন্তু আমরা কোনদিকে এগুবো?

মুগীছ : আমরা তো এ দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ। এ ব্যাপারে আমামনকে জিজ্ঞেস করা যায়।

তারিক আমামনকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আমাদের বলুন, আমরা কোনদিকে যাব?

আমামন : প্রথমে আমার ধারণা ছিল, কেবল কর্ডোভার ওপর আক্রমণ করলেই হয়তো যথেষ্ট হবে; কিন্তু এখন...

তারিক : এখন কি তোমার ধারণা বদলে গেছে?

আমামন : হ্যাঁ, এখন মনে হয় তিন দিক দিয়েই হামলা করা উচিত।

তারিক : তাহলে কি আমরা আমাদের সৈন্যদের তিনভাগে বিভক্ত করব?

আমামন : এতে সফলতার বেশী সম্ভাবনা আছে। একটি সৈন্যদল কর্ডোভা হয়ে টলেডোর দিকে, দ্বিতীয় সৈন্যদল মালাগা, আলোর ও ইসতিজার দিকে এবং তৃতীয় দলটি সেভিল ও মারিটার দিকে এগিয়ে যাবে। খ্রিষ্টানদের পরাজয়ের সংবাদ ইতোমধ্যেই সারাদেশে পৌঁছে গেছে। সকলেই আপনাদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত। ফলে আপনারা যেদিকেই যাবেন সেদিকেই জয়লাভ করবেন।

মুগীছ : আমামনের অভিমতটি যৌক্তিক।

তারিক : আচ্ছা, ঠিক আছে। আর মুগীছ, আপনি আমার সঙ্গে কর্ডোভায় যাবেন। যায়দ মালাগার দিকে যাবে। কর্ডোভা বিজয়ের পর আপনাকে অন্যদিকে পাঠানো হবে। যায়দ মালাগা জয় করে টলেডোর কাছে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

মুগীছ : তা-ই ভালো।

তারিক : সবাই খেয়াল রাখবে, কোনো উপাসনালয়, শস্যক্ষেত্র ও আবাসভূমি যেন নষ্ট না হয়। শিশু, পীড়িত, নারী, বৃদ্ধ ও ধর্মীয় নেতাদের হত্যা করা যাবে না। তাদের সকলের সাথে সদাচার করতে হবে।

কথা শেষ করে তারিক সকল সৈন্যকে তিনভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগ যায়দকে দিয়ে মালাগার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। অপর দুভাগ নিজের সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

চার. প্রকৃতির ভাণ্ডার

ইসমাঈল পাথরের ওপর বসে চিন্তায় ডুবে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি সেখানে বসে রইলেন। বিলকিস কোথায় গেল, কোনো বিপদে পড়ল কিনা? এসব নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। তাঁর আশংকা হলো, কোনো শত্রু এসে হয়তো বিলকিসকে তুলে নিয়ে গেছে। তিনি অনুশোচনা করতে লাগলেন, আমি কী বোকামীটাই না করেছি! কেন যে তাকে এখানে একা ফেলে গেলাম! বিলকিস যদি কোনো আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে চলে যায়, তাহলে তো কোনো কথা নেই। কিন্তু তা না হয়ে সে কোনো বিপদে পড়লে তার সে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের জন্য আমিই দায়ি হবো। কিন্তু এখানে তো কোনো লোকজনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তিনি ধারণা করলেন, এখানে কোনো লোকজনের আগমন ঘটলে পর্বতচূড়ার তলদেশে যেসব মূলবান পাথর টুকরো রয়েছে, সেগুলো সেখানে পড়ে থাকতো না। এসব মূল্যবান পাথর তারা অবশ্যই কুড়িয়ে নিয়ে যেতো।

এমন নানান চিন্তা তাঁর মনে এসে ভিড় জমাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং যে পাথরটিতে বিলকিস বসেছিল, তিনি তা পরখ করার চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁর মনকে বুঝ দিতে চাচ্ছিলেন, এটি সে পাথর নয় যাতে বিলকিস বসে ছিল। কিন্তু পাথরটি শনাক্ত করার সমস্ত চিহ্নই ইসমাঈলের স্মৃতিতে অক্ষুণ্ন ছিল। তাই টিলার উপরস্থ সে পাথরটির চারপাশে বারবার ঘুরে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, এটি সেই পাথরই যাতে বিলকিস বসে ছিল। সবকিছুই ঠিক আছে, নেই কেবল সেই কমল কান্তি রমণী। কিছুক্ষণ তিনি সেখানে অপেক্ষা করলেন। তাঁর আশা ছিল বিলকিস হয়তো আবার এখানে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু যতই সময় গড়াতে লাগল, তিনি ততই নিরাশ হতে লাগলেন। তিনি সেখান থেকে উঠে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে এলেন। আবার পাথরটিকে ঘুরেফিরে দেখতে লাগলেন।

ভালোমত নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইসমাঈল পাথর ও টিলাটিকে বারবার দেখতে লাগলেন; তাঁর মন থেকে কেন যেন সন্দেহ দূর হচ্ছিল না। আগেও তিনি কয়েকবার পাথরটিকে পরখ করেছেন। আসলে মানুষ কোনো কিছু হারিয়ে ফেললে একই জায়গায় বারবার ঘুরে বেড়াতে থাকে। ইসমাঈলের অবস্থাও তাই হলো। পরিশেষে স্থানটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তিনি একটি পাথরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক বিলকিসকে খুঁজলেন; কিন্তু কোথাও দেখতে পেলেন না।

চারিদিকে অনেক উঁচু উঁচু টিলা এবং বড় বড় গাছ হওয়ায় স্পষ্টভাবে সব দেখাও যাচ্ছিল না। ইসমাঈল বিলকিসের নাম ধরে ডাকলেন। তাঁর ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কোনো প্রতিউত্তর পাওয়া গেল না। ইসমাঈল নিরাশ হয়ে পড়লেন। কখনো পাহাড়ের উঁচু চূড়ায়, কখনো বা গাছের উঁচু ডালে উঠে বিলকিসকে খুঁজতে লাগলেন। কখনো বা গাছের আড়ালে আবডালে ছুটাছুটি করলেন। এভাবে দৌড়াদৌড়িতে তাঁর পিপাসা আরো বেড়ে গেল; কিন্তু অস্থিরতার প্রাবল্যে সেদিকেও তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। বিলকিসের সন্ধানে তিনি ছুটাছুটি করতে লাগলেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটি স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, দুপাশে উঁচু পাহাড়, মধ্যভাগে একটি বিরাট মোতি খণ্ড।

টিলার দুপার্শ্বে সবুজের সমারোহ, যেন কোনো নিপুণ মালী সযত্নে সবুজ লতাপাতা দিয়ে টিলাটিকে ঢেকে রেখেছে। প্রকৃতির এ দৃশ্য খুবই আকর্ষণীয়। ইসমাঈল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। কী যেন ভেবে দক্ষিণ পাশের টিলায় উঠতে লাগলেন। টিলাটি ছিল ঢালু। তাই তাতে চড়তে ইসমাঈলের তেমন অসুবিধে হলো না। সেখানে উঠে তিনি চারদিকে দৃষ্টি দিলেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। টিলার নিচে তিনি একটি বিরাট গুহা দেখতে পান। গুহাটি এতোই বিরাট যে মনে হচ্ছিল, সমস্ত পাহাড়টিই গুহার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যাবে।

ইসমাঈল ভয় পেয়ে দ্রুত সেখান থেকে পিছিয়ে আসলেন। কিন্তু সরে আসার মুহূর্তেই হঠাৎ করে তার পা পিছলে গেল। তিনি নিচে গড়িয়ে পড়তে থাকলেন। তিনি টিলার তৃণগুলতা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন; কিন্তু সেগুলো এতোই নাজুক যে, হাত লাগামাত্রই তা উঠে আসছে। তাঁর মনে হলো, এভাবে গড়িয়ে পড়তে থাকলে পাথরের আঘাতে তাঁর শরীরের হাড়-মাংস উঠে যাবে।

ইসমাঈল অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি জ্ঞান হারালেন না। এভাবে গড়িয়ে পড়তে পড়তে এক সময় হঠাৎ টিলার একটি গাছকে আঁকড়ে ধরে এর সাহায্যে নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করলেন।

তিনি তখনো পর্যন্ত পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেননি। এমন সময় ধস নামার একটি বিকট আওয়াজ তাঁর কানে এলো। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, যে টিলার গাছটিকে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন, সে টিলাটি স্থানচ্যুত হয়ে তাঁর ওপর ধসে পড়ে যাচ্ছে।

ইসমাঈল ঘাবড়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এখন তাঁর মৃত্যু অবধারিত। কারণ টিলাটি যেভাবে নেমে আসছে তাতে নির্ঘাত নিচে চাপা পড়তে হবে। তিনি বুঝে গেলেন, এখন এক মুহূর্ত দেরি করার অবকাশ নেই। তাই

কালবিলম্ব না করে দ্রুত পশ্চিম পাশে দৌড়ে আল্লাহর অশেষ দয়ায় টিলার নিচ থেকে সরে গেলেন।

টিলাটি ক্রমগত নিচে পড়ছিল। কিছুদূর দৌড়ে এসে ইসমাঈল মাটির ওপর শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর একটি বিকট আওয়াজ হলো। তিনি মাথা তুলে দেখেন, টিলাটি বহুদূরে গিয়ে পড়েছে এবং ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। তাঁর মনে জাগলো, সামান্য ভারেই টিলাটি কেন ধসে পড়বে? তিনি বিষয়টি দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মন থেকে ভয় তখনো সম্পূর্ণরূপে কাটেনি; কিন্তু টিলাটি ধসে পড়ার রহস্য তাঁকে অস্থির করে তুলল। তিনি আবার সেদিকে এগুতে লাগলেন। তবে এবার তিনি অত্যন্ত সতর্ক। আস্তে আস্তে পড়ে যাওয়া টিলাটির কাছে এলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, টিলাটির নিচে রূপার মতো উজ্জ্বল সাদা পাথর চকচক করছে। তিনি আরো আগ্রহী হয়ে উঠলেন। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলেন, এ পাথরগুলো অপরিশোধিত রূপা, যার মূল্য লক্ষ কোটি টাকা।

তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল। কারণ একই দিনে তিনি প্রকৃতির দুটি গুপ্ত ধনভাণ্ডার পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে সর্বাধিক মূল্যবান হচ্ছে বিলকিস; অথচ তাকেই খুঁজে তিনি পাচ্ছেন না।

তিনি ধীরে ধীরে নিচে নেমে এসে নিচের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে; গোধূলী লগ্ন। ইসমাঈল হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। সামনে পড়লো একটি উঁচু টিলা এবং উত্তর দিকে একটি বিস্ময়কর তোরণ দেখতে পেলেন। ভালো করে দেখে বুঝলেন, দুদিক থেকে দুটি টিলা এসে সেখানে মিলিত হয়েছে। টিলা দুটির মাঝখানে খোলা জায়গা দেখে তোরণ বলে মনে হচ্ছে।

ইসমাঈল সে পথে ঢুকে পড়লেন। পাথরটির দুপাশের টিলায় কালো বা ছাই রংয়ের পাথর দেখা যাচ্ছে। তাতে রঙবেরঙের ফুলের সমারোহ। চারিদিকে বিচিত্র সব ফুলের সুবাস। এসব দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। পথটি দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একটি চিৎকারের আওয়াজ কানে এলে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেদিকে দৌড়ে গেলেন।

পাঁচ. অহঙ্কারী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়

যে ক্ষুদ্র নদীর তীরে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, সে স্থানটির নাম ছিল লাক্কা উপত্যকা। এর পাশ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে চলছে। লাগুন দে জান্দা নামক এই ছোট নদীটির পাশে মুসলমানরা বিরাট বিজয় লাভ করে। অদূরেই বিখ্যাত নদী গোয়াদেল কুইভার। সেটি পার হয়ে তারিক মুজাহিদদের তিনটি দলে বিভক্ত করলেন। একটি দল মুগীছ আর-রূমীর নেতৃত্বে কর্ডোভার দিকে যাত্রা করল; দ্বিতীয়টি তারিকের নেতৃত্বে টলেডোর দিকে আর তৃতীয় দলটি যায়দের নেতৃত্বে মালাগা[৯] যাত্রা করল। তখন বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেছে। নদ-নদী সব পানিতে ভরপুর। এসব মুসলমানদের অগ্রযাত্রার প্রতিবন্ধক হয়; কিন্তু মুসলমানরা কোনোরকম বাধাবিপত্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একের পর এক নদী-নালা পার হয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখল।

খ্রিষ্টানরা লাক্কার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাদের একটা অংশ কর্ডোভায় চলে গিয়েছিল। কিছু সৈন্য চলে যায় টলোডোয়। তবে বেশিরভাগ সৈন্যই মালাগা, আলোর ও ইসিতিজায় গিয়ে সমবেত হয়। পরাজিত ও পলায়নরত এই সকল খ্রিষ্টান সৈন্য যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের কাছে নিজেদের পরাজয়ের কাহিনি ও মুসলমানদের আগমনের কথা বলেছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়। লাগাতার বর্ণনায় জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে তারা মানুষ নয়। জনসাধারণের মধ্যে বিস্ময়কর গম্বুজের কাহিনিও বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, স্পেনের পতন অত্যাসন্ন। কেউ মুসলমানদের হাত থেকে এর পতন রোধ করতে পারবে না। তারা এ-ও শুনেছিল, সম্রাট রডারিক নিখোঁজ হয়ে গেছে। কোথাও তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে খ্রিষ্টানরা পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়েছিল। তাই তারা রডারিকের পরিণতি দেখতে পায়নি। অবশ্য জনসাধারণের ধারণা ছিল, সম্রাট রডারিক আত্মগোপন করেছেন। এক সময়ে তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করবেন এবং শত্রুদের হাত থেকে স্পেনকে পুনরুদ্ধার করবেন। বহুদিন পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। এ ধারণার কারণে খ্রিষ্টানরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে

---

৯. মালাগা স্পেনের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। বর্তমানে সেখানকার জনসংখ্যা ৪,৭৫,০০০। ফল-ফলাদি, মাছ ও যাইতুনে সমৃদ্ধ এক অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি।

মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে দেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। যদিও এ পদক্ষেপে তাদের মন সায় দিচ্ছিল না। একরকম ভীতি তাদের পেয়ে বসেছিল। মুসলমানদের নাম শুনলেই তারা আঁতকে উঠতো।

যায়দ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মালাগার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল মাত্র দুহাজার মুজাহিদ। লাক্কার যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের পরাজয়ের ফলে তাদের অনেক তাঁবু মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। মুসলমানরা সেসব তাঁবু ব্যবহার করে বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। তাঁরা যেদিক দিয়ে যেতো, সকল গ্রাম ও জনপদ শূন্য হয়ে পড়তো। লোকেরা মুসলমানদের ভয়ে নিজ নিজ আবাস ছেড়ে পালিয়ে যেতো। খ্রিষ্টান জনসাধারণ সবকিছু নিয়ে মালাগায় গিয়ে সমবেত হয়েছিল। মুজাহিদরা আশঙ্কা করলেন, খ্রিষ্টানরা একত্রে সমবেত হতে থাকলে মুসলমানদের জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তাঁরা যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে এগুতে লাগলেন।

এভাবে যায়দ মালাগায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে তিনি একটি উঁচু দুর্গ দেখতে পেলেন। এর চারিদিকের প্রাচীর ঘিরে আছে বহু খ্রিষ্টান সৈন্য। তিনি বুঝতে পারলেন, খ্রিষ্টানরা পালিয়ে এখানেই আশ্রয় নিয়েছে। প্রকৃত ঘটনাও ছিল তাই। চারিদিকের খ্রিষ্টানরা সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল।

সে সময় দুর্গের ভেতর ১৫ থেকে ১৬ হাজার সৈন্য অবস্থান গ্রহণ করেছিল; পক্ষান্তরে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র দুহাজার। খ্রিষ্টানদের ধারণা ছিল, মুসলমানরা যে কোনো সময় আক্রমণ চালাতে পারে। সেজন্য তারা ছিল অত্যন্ত শঙ্কিত ও চিন্তিত। কিন্তু তারা যখন দেখতে পেলো, মুলসমানদের সংখ্যা মাত্র দুহাজার, তখন তারা সাহসী হয়ে উঠল। তারা সিদ্ধান্ত নিল, খোলা মাঠেই তারা মুসলমানদের মোকাবিলা করবে।

যায়দ দুর্গ থেকে মাইল তিনেক দুরে তাঁবু ফেললেন। তিনি ভাবছিলেন, খ্রিষ্টানদের ভাষা বুঝতে পারে এমন কাউকে পাওয়া গেলে হয়তো প্রথমে সন্ধির প্রস্তব দিয়ে দেখা যেতো; কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না। তাই বাধ্য হয়ে যায়দ নিজেই কয়েকজন মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের কাছে গেলেন।

দুর্গের খ্রিষ্টানরা তাদের দেখতে পেলো। প্রথমে তারা মনে করেছিল, তীর ছুঁড়ে মুসলমানদেরকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু তারা এই ভেবে ক্ষান্ত রইলো, দেখা যাক না তারা কী বলতে এসেছে। কারণ, মুষ্ঠিমেয় কয়েকজনকে এগিয়ে আসতে দেখে তাদের মনেও ধারণা হয়েছিল, হয়তো তারা কোনো প্রস্তব নিয়ে এসেছে। তারা জানতো না, এ দলে মুজাহিদদের সেনাপতিও আছেন। জানলে হয়তো

তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করতো। মুসলমানরা দুর্গের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। যায়দের হাতে ছিল ইসলামি পতাকা। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তা বাতাসে উড়াচ্ছিলেন। যায়দ উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, খ্রিষ্টান ভাইয়েরা, আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। কিন্তু তিনি তাঁর ভাষায় বলছিলেন বলে খ্রিষ্টানরা তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারলো না।

দুর্গের ভেতরে কিছু ইহুদি ছিল, যারা আরবি ভাষা জানতো। খ্রিষ্টানরা একজন ইহুদিকে ধরে নিয়ে এলো। যে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এলো সে ছিল বৃদ্ধ, মুখে পাকা দাড়ি, পরনে রেশমি কাপড়ের জাতীয় পোশাক। সে এমন ভাব নিচ্ছিল যাতে মুসলমানরা তাকে কোনো সম্মানী ব্যক্তি মনে করে।

আরব দেশেও ইহুদিদের বসতি ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই সিরিয়া ও আফ্রিকায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল। তাই মুসলমানরা তাদের ভালোভাবেই চিনত। মুসলমানরা আগন্তুক বৃদ্ধকে দেখেই বুঝতে পারলো, সে একজন ইহুদি। ইহুদি চিৎকার করে বলল, তোমরা কী বলতে চাও?

যায়দ বললেন, তুমি কী বলতে চাও?

ইহুদিটি অনেকটা আফসোসের সুরে বললেন, আমি এক দুর্ভাগা ইহুদি।

যায়দ : তুমি কি জানো, খ্রিষ্টানরা তোমাদের কতটুকু হীন মনে করে?

ইহুদি : হ্যাঁ, ভালো করেই জানি।

যায়দ : মুসলমানরা তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে তা কী তুমি জানো?

ইহুদি : হ্যাঁ, সে সম্পর্কেও আমি অবহিত।

যায়দ : দুর্গের ভেতরে কী পরিমাণ সৈন্য আছে?

ইহুদি : সৈন্য আছে পনের হাজার। সাধারণ খ্রিষ্টানের পরিমাণও এমন হবে। তারা তোমাদের কম দেখে সাহসী হয়ে উঠলেও মনে মনে তারা ভীষণ ভীত।

যায়দ : তাদের জিজ্ঞেস করো, তারা সন্ধি করতে রাজি আছে কিনা? হয়তো এটাই তাদের জন্য ভালো হবে।

ইহুদিটি নীরবে পেছনে সরে গেল। যায়দ বুঝতে পারেন, সে খ্রিষ্টানদের মতামত জানতে গেছে।

কিছুক্ষণ পর ইহুদিটি ফিরে এলো। সে চেচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী শর্তের ওপর সন্ধি করতে হবে, খ্রিষ্টানরা তা জানতে চাচ্ছে।

যায়দ : কেবল জিযয়া দেয়ার শর্তেই সন্ধি হতে পারে।

ইহুদি : খ্রিষ্টানরা তা করতে রাজী নয়।

যায়দ : তাদের কী ইচ্ছে?

ইহুদি : তারা বলছে, তোমরা এখান থেকে চলে গেলে ওরা তোমাদের পিছে ধাওয়া করবে না।

মুসলমানরা তা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। যায়দ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে দেখেছ?

ইহুদি (আনন্দের সঙ্গে) : আমি নিজেও তো খুবই বিপদগ্রস্ত।

যায়দ : কী বিপদ তোমার?

ইহুদি : অত্যচারী রডারিক আমার কন্যা রাহীলকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গেছে।

যায়দ : তোমার কন্যা হয়তো টলোডোতে আছে।

ইহুদি : আমি সেখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো হদিস পাইনি।

যায়দ : তাহলে আর কোথায় থাকতে পারে?

ইহুদি : এতটুকু জেনেছি, একরাতে সে নাকি সেখান থেকে পালিয়ে গেছে।

যায়দ : খ্রিষ্টানরা মেরে কোথাও গুম করে ফেলেনি তো?

ইহুদি : এতটুকু জেনেছি যে, তাকে মেরে ফেলা হয়নি। সে রাজমহল থেকে পালিয়ে এসেছে। আমার ধারণা ছিল, হযতো এখানে চলে এসেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি।

যায়দ : আমি তোমাকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

ইহুদি : আমার ধারণা, আপনাদের সাহায্যে আমি তাকে ফিরে পাবো।

যায়দ : আমরা তাকে খুঁজে বের করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ইহুদি : আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি?

যায়দ : দুর্গে প্রবেশের কোনো গোপন পথ থাকলে আমাদের জানাতে পারো।

ইহুদি : তেমন রাস্তা তো ছিল; কিন্তু এখন সেসব বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বাইরে টহল দিচ্ছে। যে কোনো সময় আপনাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। আপনারা তাদের মোকাবিলার প্রস্তুতি নিন।

যায়দ : তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ইহুদি : জয়লাভের পর ইহুদিদের কথা ভুলে যাবেন না; তারা আসলেই মজলুম।

যায়দ : চিন্তা করো না। আমরা তোমাদের হেফাজত করবো ইনশাআল্লাহ।

এই বলে যায়দ ফিরে এসে সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদরা প্রস্তুত হতে না হতেই দুর্গের দরজা খুলে গেল। খ্রিষ্টান সৈন্যরা ঢলের বেগে বেরিয়ে মাঠে নামতে লাগল।

ছয়. মালাগা জয়

খ্রিষ্টানদের দেখামাত্র মুসলমানরাও নিজ নিজ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। তাঁরা রণাঙ্গনের দিকে এগুতে লাগলেন। খ্রিষ্টানরা ছিল খুবই জাঁকজকমপূর্ণ। তারা দ্রুত বেরিয়ে একের পর এক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। আস্তে আস্তে তাদের আসা বন্ধ হয়ে গেল।

মুসলিম মুজাহিদরা চার ফার্লং দূরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। উভয় দলই তখন একে অপরের মুখোমুখি। সূর্য অনেকটা উপরে উঠে গেছে। ময়দানজুড়ে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। আরোহীদের স্বচ্ছ শুভ্র তলোয়ার সূর্যালোকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কিছু খ্রিষ্টান সৈন্য তখনো পর্যন্ত দুর্গ-প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে আছে। এক সময় খ্রিষ্টান সৈন্যদলে রণবাদ্য বেজে উঠলো। ভয়ঙ্কর সুর গোটা ময়দানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর একজন খ্রিষ্টান সৈন্য একটি সবল ঘোড়ায় চড়ে সামনে এগিয়ে এলো। সৈন্যটির ভাবগতি দেখে মনে হচ্ছিল, সে তার শক্তিমত্তার ব্যাপারে অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী।

সে উভয় বাহিনীর ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। তার বর্শা ও তলোয়ার চকচক করছিল। সে চিৎকার করে বললো, যার মৃত্যুর সাধ আছে সে আমার সঙ্গে যুদ্ধে আসতে পারে। মুসলমানরা তার কথা বুঝতে পারলো না, তবে তার ভাবগতি দেখে এতদূর বোঝা গেল, সে মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

তাহির একজন তরুণ মুজাহিদ ও অত্যন্ত সাহসী। তিনি দ্রুত যায়দের কাছে গিয়ে বললেন, দয়া করে আমাকে যুদ্ধের অনুমতি দিন।

যায়দ তাঁকে অনুমতি দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমার সহায় হোন। তবে সকলের ওপর হামলা চালিয়ো না।

তাহির ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে গেলেন। খ্রিষ্টান সৈন্যটি তাঁকে দেখে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো,

তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে? কেন অযথা নিজের জীবনটা খোয়াতে চাচ্ছ। এর চাইতে সবল কাউকে পাঠাও।

তাহির তার কথা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

খ্রিষ্টানটি বুঝতে পারলো যে, যুবকটি যেতে রাজী নয়। সে কালবিলম্ব না করে সর্বশক্তি দিয়ে তাহিরের ওপর হামলা চালালো। খ্রিষ্টানটি তাঁকে খুবই হেয় মনে করেছিল; কিন্তু তাহির অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সে আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেন। এতক্ষণে খ্রিষ্টানটি বুঝতে পারলো, তাহির কোনো সাধারণ যোদ্ধা নন।

উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উভয় পক্ষের সৈন্যদল দাঁড়িয়ে তাদের যুদ্ধ দেখছিল। ঘোড়ার পায়ের নিক্ষিপ্ত ধূলোবালি দর্শকদের চোখ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। উভয়েই তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করছিল। প্রত্যেকেই একে অপরকে ক্ষিপ্রগতিতে আঘাত হানছে এবং একই গতিতে তা প্রতিরোধ করছে। হামলার চাপ ছিল অত্যন্ত প্রবল।

একসময় হঠাৎ খ্রিষ্টান সৈন্যের তলোয়ার মাটিকে পড়ে গেল। সে ঘাবড়ে গেল। দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে সে তাহিরকে জাপটে ধরল। তাহিরও তাঁর তলোয়ার মাটিতে ফেলে দিয়ে খ্রিষ্টানটির সঙ্গে শারীরিক শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। খ্রিষ্টানটি ভেবেছিল, সে প্রথম দফায়ই তাহিরকে উপরে ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও তাহিরকে নাড়াতে না পেরে সে ভীত হয়ে পড়ল।

অপরদিকে তাহির সমস্ত শক্তি দিয়ে খ্রিষ্টানটিকে জাপটে ধরলেন। আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে খ্রিষ্টানটিকে উপরে তুলে এক পাক ঘুরিয়ে জোরে মাটিতে আছাড় মারলেন। মাটিতে পড়ার সঙ্গে তার ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠলো এবং খ্রিষ্টানটিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। খ্রিষ্টানরা তাদের সঙ্গীর এ করুণ পরিণতি দেখে শোরগোল শুরু করলো। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সদলবলে এগিয়ে এলো।

তাহির মরা খ্রিষ্টানটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন; আওয়াজ শুনে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, খ্রিষ্টানরা তলোয়ার উঁচিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি মাটি থেকে নিজ তলোয়ারটি তুলে দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে বসলেন।

তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঠিক করে বসতে না বসতেই খ্রিষ্টানরা ঘিরে ফেলে তাঁর ওপর আক্রমণ চালালো। তাহির সেসব আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ চালালেন এবং বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ার চালাতে থাকলেন। তাঁর তলোয়ারের আঘাতে বেশ কয়েকজন খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হলো। খ্রিষ্টানরা তাদের এ অবস্থা দেখে ক্ষোভে দুঃখে মাথা কুটতে লাগলো।

খ্রিষ্টানরা ক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধ করছিল; তাদের ক্ষোভ-প্রচেষ্টা সবই ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের যে-ই তাহিরকে হামলা করতে এগিয়ে যাচ্ছে সে-ই নিহত হচ্ছে। নিছক একজন মুজাহিদের কাছে তাদের এ করুণ পরিণতি তাদেরকে আরো বেশি পীড়া দিচ্ছে। কারণ এখন পর্যন্ত সে মুজাহিদটি সামান্য আহত পর্যন্ত হয়নি। এবার খ্রিষ্টানরা

মরিয়া হয়ে তাহিরকে চতুর্দিকে থেকে ঘিরে ফেললো। তাহির একটুও না ঘাবড়ে একই গতিতে যুদ্ধ করে খ্রিষ্টানদের খতম করে চললেন।

এদিকে অন্য মুজাহিদরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে সামনে এগুতে লাগলেন। তাকবীর ধ্বনি শুনে খ্রিষ্টানরা আরো ভয় পেয়ে গেল। তারা দেখতে পেলো, অন্য মুসলমানরা তলোয়ার উঁচিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসেই মুসলমানরা একযোগে আক্রমণ চালালেন। প্রথম আক্রমণেই মুসলমানরা প্রত্যেকের কাছাকাছি অন্তত একজন করে খ্রিষ্টানকে হত্যা করলেন। এ দুর্দশা দেখে খ্রিষ্টানরা উত্তেজিত হয়ে আরো প্রবল বেগে আক্রমণ চালালো। কিন্তু মুসলমানরা যে সিসাঢালা প্রাচীর! খ্রিষ্টানদের কোনো আক্রমণেই তাদের ক্রিয়া করতে পারছে না। বরং পাল্টা এমন আক্রমণ চালাচ্ছে যে, খ্রিষ্টানরা মরা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ পাচ্ছে না।

ইতোমধ্যে ময়দানে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। রণাঙ্গন জুড়ে শুধু তলোয়ারের দ্রুত ওঠানামার দৃশ্য। চারিদিকে মারমার কাটকাট রব। মাটিতে বয়ে চলছে রক্তের স্রোত। শরীর থেকে হাত পা মাথা ছিন্ন হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।

এদিকে খ্রিষ্টানদের প্রাচীর-রক্ষীরাও শোরগোল শুরু করলো। আহতদের চিৎকার ধ্বনিত-মথিত হচ্ছে; কিন্তু মুসলমানরা সম্পূর্ণ নীরব। তাঁরা মাথা নুইয়ে শুধু যুদ্ধই করে যাচ্ছে। তাঁদের প্রতিজ্ঞা সকল শত্রু সৈন্য খতম না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত না হওয়া। তাদের লড়াই বিদ্যুৎগতি। একের পর এক খ্রিষ্টান সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। তাহির প্রথম স্থানটিতে দাঁড়িয়েই লড়ে চলছেন। চারিপাশে লাশের স্তূপ পড়ে গেছে; কিন্তু তাঁর আক্রমণের গতি এখনো স্তিমিত হয়নি। যেই তাঁর কাছে ভিড়ছে তাকেই তিনি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সমস্ত শরীর শত্রুদের রক্তে ভিজে গেছে। চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু কোনো দিকেই তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি কেবল লড়েই যাচ্ছেন।

কোনো একজন মুজাহিদ একজন খ্রিষ্টানকে হত্যা করেছে দেখলেই তাহির উদ্দীপ্ত হয়ে আরো প্রবল বেগে হামলা করছেন। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তিনি একাই সমস্ত শত্রু সৈন্য খতম করে ফেলবেন। সকল মুজাহিদই এমনটা আশা করতেন। সবারই ইচ্ছে ছিল, তিনি একাই সব শত্রু খতম করে ফেলবেন।

কিন্তু খ্রিষ্টানরাও তো রক্ত মাংসের মানুষ: বরং আরো সুস্থ সবল ও সশস্ত্র। অথচ তারা একের পর এক মার খেয়ে যাচ্ছে। আসলে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে পাহাড়সম বাধাকেও ভ্রুক্ষেপ করতেন না; বরং তা-ও উপড়ে ফেলতে সচেষ্ট হতেন। তা ছাড়া মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, জীবন-মরণ উভয় অবস্থাতেই

তাদের সফলতা আছে। মৃত্যুবরণ করলেও তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহে ধন্য হবেন। তাই তাঁরা মৃত্যুকে ভয় করতেন না। আসলে মৃত্যু মানুষের জন্য এক মহা ভীতিকর বিষয়। যে জাতি মৃত্যুকে ভয় পায় না, জগত তাদের ভয় পায়। মুসলমানদের অবস্থাও হয়েছিল তাই। তাঁরা মৃত্যুকে জীবনের উপরে প্রাধান্য দিতো। তাই কোনো জাতি তাদের মোকাবিলা করতে পারতো না।

যায়দ এক হাতে পতাকা অপর হাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যে শত্রু সারির দিকে ধাবিত হতেন, তাকে উল্টে দিতেন। যে ব্যক্তির দিকে এগিয়ে যেতেন, তাকে খতম না করে ক্ষান্ত হতেন না।

যায়দ অস্বাভাবিক ক্ষীপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। সামনে-পেছনে, ডানে-বামে সমানে আক্রমণ চালাতেন। তার আক্রমণের শিকার হয়ে চলছে অসংখ্য খ্রিষ্টান। হয়তো তিনিও আশা করছেন, সমস্ত শত্রু সৈন্য তিনি একাই খতম করবেন।

সূর্য তখন মধ্য গগনে। তাই রৌদ্রের তাপ অনেকটা বেড়ে গেছে। সৈন্যদের গা থেকে দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছে। এ তাপে মুজাহিদরাও তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাকবীর ধ্বনি দিয়ে প্রবল বেগে আক্রমণ চালালেন। এ আক্রমণে প্রায় দুজাহার খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হলো। অবস্থা দেখে খ্রিষ্টানরা ঘাবড়ে গিয়ে দুর্গের দিকে পালাতে লাগলো।

মুজাহিদরা তাদের পিছু ধাওয়া করে কচুকাটা করতে লাগলেন। ফলে দুর্গ পর্যন্ত খ্রিস্টনদের মরদেহ ছড়িয়ে পড়লো। খ্রিষ্টানদের দুর্গে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরাও দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। খ্রিষ্টানরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হচ্ছিল। তারা ভেবে পাচ্ছিল না, মুসলমানরা কেমন লোক যে লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না? দুর্গের ভেতরেও মুসলমানদের ঢুকে পড়তে দেখে খ্রিষ্টানদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। তারা অস্ত্র ফেলে দিল। এবার মুজাহিদরা আক্রমণ বন্ধ করে তাদের গ্রেফতার করতে লাগলেন।

সাত. হারানো প্রিয়তমা

চিৎকারের শব্দ শুনে ইসমাঈল সেদিকে দৌড়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এটি বিলকিসের শব্দ। তিনি দ্রুত ফল-ফুলের গাছ মাড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেলেন, একটি ফুল গাছের নিচে বিলকিস বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছে। ইসমাঈল হতবাক হয়ে গেলেন, বিলকিস এখানে কিভাবে এলো এবং কেনইবা বেহুঁশ হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, একটি কালো সাপ বিলকিসের দিকে ফণা তুলে আছে। তা দেখে ইসমাঈল ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মনে ভয় হলো, সাপটি হয়তো বিলকিসকে দংশন করেছে। ইসমাঈলের পায়ের শব্দ শুনে সাপটি তাঁর দিকে তেড়ে আসল। ইসমাঈল তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দিয়ে সাপটিকে দুটুকরো করে ফেললেন। একটি পাথর ছুঁড়ে মেরে সাপটির মাথা পিষে দিলেন। তারপর বিলকিসকে নিয়ে একটি সমতল স্থানে শুইয়ে দিলেন। বিলকিস তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। মুখ সাদা হয়ে গেছে। চোখ বুজে এসেছে। এতো আস্তে আস্তে শ্বাস নিচ্ছে যে, বুঝাই যাচ্ছে না।

ইসমাঈল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য কী করা উচিত ইসমাঈল কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন; কিন্তু বিলকিসের দিকে যতই তাকাচ্ছিলেন ততই অস্থির হয়ে পড়ছিলেন।

সাপে কাটার কি চিকিৎসা, এ সম্পর্কে ইসমাঈল ভাবতে লাগলেন। তিনি শুনেছিলেন যে, সাপে কাটলে নাকি বেশি ঘুম আসে। তাই তাকে ঘুমুতে না দেয়া উচিত। কেননা ঘুমালে সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু বিলকিস ঘুমিয়ে আছে না অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। সাপে কাটলে কোথায় কেটেছে, তা জানতে পারলে ইসমাঈল হয়তো সেখানে বেঁধে দিতে পারতেন। তিনি বিলকিসের শরীরে নাড়া দিলেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ইসমাঈল সিদ্ধান্ত নিলেন, বিলকিসের জামার আস্তিন খুলে প্রকৃত অবস্থা বুঝার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তিনি একজন মুসলমান। আর মুসলমানরা জানে, একমাত্র বিয়ে ছাড়া পর নারীর শরীর তো দুরের কথা চেহারাও দেখা অসিদ্ধ। কিন্তু এখন যে জীবন মরণ সমস্যা। এমতাবস্থায় শরীয়তের কোনো বিধিনিষেধ নেই।

অতএব, ইসমাঈল বিলকিসের আস্তিনের বোতাম খুলতে লাগলেন। কিন্তু বোতাম খুলতে না খুলতেই বিলকিসের জ্ঞান ফিরে এলো। ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগলো। তারপর চেহারাও উজ্জ্বল হতে লাগলোঅ সে ধীরে ধীরে চোখ খুললো।

ইসমাঈল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ডাক দিলেন, বিলকিস!

তখানো বিলকিসের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসেনি। সে শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার চাহনি দেখে মনে হচ্ছিল, সে ইসমাঈলকে চেনার চেষ্টা করছে। ইসমাঈলও বিলকিসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কিন্তু বিলকিসের মুখ থেকে তখন পর্যন্ত কোনো কথা বের হচ্ছে না; কারণ তখনও তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। ইসমাঈল মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর মনে সন্দেহ হচ্ছিল, সাপে যদি কেটে নাই থাকে, তবে এখনো তার মুখ থেকে কথা বেরুচ্ছে না কেন?

ইসমাঈল চাচ্ছিলেন তাকে সাপের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন; কিন্তু আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে এমন আশঙ্কায় কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তবে অত্যন্ত স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাক দিলেন, বিলকিস!

বিলকিসের মুখ থেকে এটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো; বললো, আপনি!

ইসমাঈল : হ্যাঁ, আমি! তোমার কী হয়েছে?

বিলকিস কোনো জবাব দিল না, কেবল মাথা নাড়ল।

ইসমাঈল : উঠতে পারবে?

বিলকিস : না, এখন বসতে পারবো না।

ইসমাঈল : কোথাও ব্যথাও হচ্ছে?

বিলকিস : না।

ইসমাঈল : কোনো আঘাত পেয়েছ কি? উঠতে পারছো না যে?

বিলকিস : খুব কষ্ট হচ্ছে।

ইসমাঈল : কেন? কী হয়েছে?

বিলকিস : বলতে পারবো না।

ইসমাঈল : পানি খাওনি?

বিলকিস : খেয়েছি, তবে ...

ইসমাঈল : তবে কিসের, কী হয়েছে!

বিলকিস : হয়তো বেশি খেয়ে ফেলেছি।

ইসমাঈল : কম খেলেই তো হতো।

বিলকিস : বেশি পিপাসা পেয়েছিল তো।

ইসমাঈল : তোমাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দেই?

বিলকিস : না, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবো।

ইসমাঈল : অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে কেন?

বিলকিস : বলছি, আমাকে সব মনে করতে দিন।

ইসমাঈল : ঘুম পাচ্ছে না তো?

বিলকিস : না।

ইসমাঈল : মাথাটা ভারী ভারী লাগছে?

বিলকিস : কিছুটা।

ইসমাঈল : বেশি পিপাসার পরে পানি পান করার কারণেই হয়তো এমন লাগছে।

বিলকিস : হয়তো।

ইসমাঈল : কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না তো?

বিলকিস : না।

ইসমাঈল : তাহলে উঠে বসে পড় দেখি।

বিলকিস : আহা, বসবো তো একটু পরে।

ইসমাঈল : কি জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে, তা কী মনে পড়েছে?

বিলকিস : আপনি এসব জানতে চাচ্ছেন কেন?

ইসমাঈল : কারণ, তোমাকে অজ্ঞান দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

বিলকিস : আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

ইসমাঈল : তোমার জন্য পানির খোঁজ করতে।

বিলকিস : আমাকে একলা ফেলে?

ইসমাঈল : এটা অবশ্য আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু ...

বিলকিস : কিন্তু কী?

ইসমাঈল : তোমার পিপাসার কষ্ট দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

বিলকিস : আমি যে একা, এ ব্যাপারে আপনার খেয়াল ছিল না।

ইসমাঈল : আসলে তোমার পিপাসার কষ্ট দেখে এসব আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

বিলকিস : আমি হলে তো এমনটা করতাম না।

ইসমাঈল : এমন পরিস্থিতি হলে তুমিও তাই করতে।

বিলকিস : তারপর পানি পেয়েছেন কি?

ইসমাঈল : হ্যাঁ, একটি ঝরনার সন্ধান পেয়েছি।

বিলকিস : পানি এনেছেন কি?

ইসমাঈল : না, তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে এসে দেখি তুমি সেখানে নেই। তাই হতভম্ব হয়ে তোমাকে খুঁজছিলাম।

বিলকিসের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বলে, কেন? আপনার হতভম্ব হওয়ার কী আছে?

ইসমাঈল : আমি আফসোস করছিলাম, আমার ভুলের জন্যই তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ। চিৎকার করে তোমাকে ডাকতে লাগলাম। তারপর তোমাকে দেখার জন্য একটি উঁচু টিলায় চড়লাম; কিন্তু পা ফসকে সেখান থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগলাম। কোনোমতে একটি গাছ আঁকড়ে ধরলাম; কিন্তু গাছটি একটি বিরাট ফাটলসহ উপড়ে আমার উপরই পড়তে লাগল। পরিশেষে ভাগ্য গুণে বেঁচে গেলাম।

বিলকিস সমবেদনার দৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনি বেঁচে গেছেন।

ইসমাঈল : আল্লাহর সর্বাধিক শুকরিয়া যে তোমাকে পাওয়া গেল।

বিলকিস : আপনি পানি খেয়েছেন?

ইসমাঈল : না।

বিলকিস (বিস্মিত হয়ে) : এখনো খাননি?

ইসমাঈল : তোমাকে না খাইয়ে তো আমি খেতে পারি না।

বিলকিস (আফসুসের সুরে) : আপনি খাননি অথচ আমি খেয়ে ফেলেছি?

ইসমাঈল : অনুতাপের কিছু নেই; তুমি বরং বলো, কেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।

বিলকিস : একটি কালো সাপ আমার দিকে ফণা তুলে আসতে দেখেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

ইসমাঈল : তোমাকে দংশন করেনি তো?

বিলকিস : না।

ইসমাঈল : আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমি ঠিক সময়েই এখানে এসেছিলাম।

বিলকিস : আপনি কী করেছেন?

ইসমাঈল : সাপটিকে দুটুকরা করে ফেলেছি।

বিলকিস : তাহলে ভালো করেছেন। এখন চলুন, আগে পানি খেয়ে নিন।

ইসমাঈল উঠে দাঁড়িয়ে বিলকিসকে সঙ্গে নিয়ে পানি খেতে চলে গেলেন।

আট. রূপের রানি বিলকিস

উপত্যকাটি স্বর্গতুল্য। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ আর সবুজের সমারোহ। চারদিকে শুধু ফল আর ফুল। ফুলের সুবাসিত ঘ্রাণ আশপাশ মোহিত করে তুলেছে। ফল-ফুলের নরম গাছ মাড়িয়ে তারা এমন একটি স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন যেখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল একটি ছোট ঝরনা, বয়ে যাচ্ছিল স্বচ্ছ পানি।

বিলকিস ইসমাঈলকে বলল, এখানে স্বচ্ছ মিষ্টি পানি আছে, খেয়ে নিন।

ইসমাঈল ঝরনার পার্শ্বে গিয়ে বসলেন। প্রথমে ওযু করলেন; তারপর পানি পান করলেন। পানি খেয়ে উঠে দেখেন অনতিদূরে বিলকিস দাঁড়িয়ে আছে, তার চারপাশে রঙবেরঙের ফুল। সূর্যের ডুবু ডুবু অবস্থা। অস্তপ্রায় সূর্যের নীলাভ আলোয় বিলকিসের উজ্জ্বল চেহারা আরো উজ্জ্বলতর মনে হচ্ছে।

বিলকিস পা ঝুলিয়ে একটি পাথরের উপর বসে আছে। তার পাশে প্রস্ফুটিত ফুল। সুন্দরী বিলকিসকে দেখে ওরাও যেন হেলেদুলে আনন্দ প্রকাশ করছে। ইসমাঈল তাঁর লাবণ্যময়ী চেহারার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বিলকিস তাতে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলো। ইসমাঈলের কাছে তাকে আজ আরো মোহনীয় বলে মনে হচ্ছিল। তিনি বিলকিসের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন, তুমি তোমার জাদুময়ী দৃষ্টি দিয়ে কাকে জাদু করছ?

বিলকিস লজ্জিত হয়ে মুচকি হাসল। বলল, জাদুময়ী দৃষ্টি আমার!

ইসমাঈল : হ্যাঁ, তোমার দৃষ্টিতে জাদু আছে।

বিলকিস ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে তো আর জাদু করিনি।

ইসমাঈল : আমাকে তো অনেক আগেই জাদু করে ফেলেছ।

বিলকিস (অভিমানের সুরে) : তার মানে আমি জাদুকর?

ইসমাঈল : রাগ করলে? তুমি জাদুকর না হলে জাদুকর আর কে?

বিলকিস : আমি তো অবলা, জাদু জানবো কী করে?

ইসমাঈল : তুমি জাদু না জানলে তবে ...

বিলকিস : তবে কী?

ইসমাঈল : তাহলে আমিই জাদুকর।

বিলকিস আনত দৃষ্টিতে ইসমাঈলকে দেখছিল আর স্মিত হাসছিল। তার এই মুচকি হাসি ইসমাঈলকে আরো ব্যাকুল করে তুলে। তিনি বললেন, এ যে এক সুন্দরী জাদুকন্যা।

বিলকিসের অবস্থাও তা হয়েছে। সে ইসমাঈলকে বলল, আমি যদি জাদুকর হয়ে থাকি তাহলে আপনার সাথে আমার আর কথা নেই।

ইসমাঈল ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বিলকিসের আরো কাছে গিয়ে বিনয়ের সুরে বললেন, তুমি কি আমার সাথে কথা বলবে না।

বিলকিস মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চারিপাশের ফুলগাছের দিকে তাকিয়ে রইল। ইসমাঈল হাত বাড়িয়ে বিলকিসের হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ওপর রাগ করলে?

বিলকিস : আপনার সাথে কি আর কোনো কথা থাকতে পারে?

ইসমাঈল : তাই তো জিজ্ঞেস করলাম, কী অপরাধ আমার?

বিলকিস : আমি তো মানুষ নই; জাদুকর।

ইসমাঈল : তুমিই বলে দাও, আমি তোমাকে কী বলবো?

বিলকিস ইসমাঈলের হাতের মুঠোয় থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ভার করে বসে রইল। ইসমাঈল তার দিক তাকিয়ে রইলেন। তিনি দেখছিলেন, অভিমানী ভাবটিও বিলকিসের আরোক রূপের প্রকাশ। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সতেজ গোলাপের নরম পাপড়ি। ইসমাঈল বিলকিসের হাত আবার নিজের হাতে তুলে নিলেন।

বিলকিস : আপনার সাথে কথা বলতে যায় কে?

ইসমাঈল : সেই মহীয়সী নারী যে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে।

বিলকিস স্মিত হাসলো। ইসমাঈল বললেন, কী জাদুকর মহিলাই না তুমি!

বিলকিস : আবার একই কথা শুরু করেছেন?

ইসমাঈল : তাহলে আমি কিছুই বলবো না।

বিলকিস : হ্যাঁ, এসব কথা আর বলবেন না।

ইসমাঈল : আচ্ছা ঠিক আছে, আর বলবো না।

বিলকিস ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলল, আচ্ছা আপনি কি তাহলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন?

ইসমাঈল : আমি ভয় পেলে তোমার কী?

বিলকিস : তাহলে তো দেখছি, সত্যিসত্যিই আপনাকে এবার ভয় পাইয়ে দিচ্ছি।

ইসমাঈল : ভয় তো পাবই, কারণ তুমি যা নির্মম।

বিলকিস হাসতে লাগলো। তার **স্বচ্ছশুভ্র** দন্তরাজি মোতির মতো ঝকঝক করছিল। হাসি যেন বিদ্যুৎ ছড়াচ্ছে। ইসমাঈল অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিলকিস বলল, অমন করে কী দেখছেন?

ইসমাঈল : তুমি যে কত সুন্দর!

বিলকিস : যা বলার একবারেই বলে ফেলেন।

ইসমাঈল : বলতে তো চাচ্ছি, কিন্তু পারছি না তো।

বিলকিস (আড় দৃষ্টিতে তাকিয়ে) : কেন?

ইসমাঈল : তোমার রাগের ভয়ে।

বিলকিস (প্রসঙ্গ পাল্টে) : দেখুন, এ জায়গাটি কত সুন্দর!

ইসমাঈল : স্থানটি যেন বেহেশতের একটি টুকরা। আর...

বিলকিস : আর?

ইসমাঈল : তুমি হচ্ছো এ বেহেশতের হুর।

বিলকিস লজ্জা পেলো। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী মনে হয়?

বিলকিস : আমার আর কী মনে হবে।

ইসমাঈল : আচ্ছা, তোমাকে যেখানে রেখে গিয়েছিলাম তুমি সেখান থেকে উঠে গিয়েছিলে কেন?

বিলকিস : আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে আপনাকে না দেখে খুব ঘাবড়ে গেলাম। আমার আশঙ্কা হলো, আপনি বিরক্ত হয়ে আমাকে ফেলে গেছেন।

ইসমাঈল : এটি তোমার নিছক ভুল ধারণা।

বিলকিস : পুরুষদের বিশ্বাস করা যায় না।

ইসমাঈল : আর মেয়েদের?

বিলকিস : মেয়েরা প্রতিশ্রুতিশীল।

ইসমাঈল : প্রতিশ্রুতিশীল?

বিলকিস (উচ্চস্বরে) : হ্যাঁ।

ইসমাঈল : যাক, তারপর কী করলে?

বিলকিস : আমি ভীত হয়ে সেখান থেকে উঠে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে পানির একটি ঝরনা দেখতে পাই। সেখান থেকে পানি পান করলাম। তারপর আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরে চলে যাই। আমি হঠাৎ একটি সাপ দেখতে পাই। সাপটি ফণা তুলে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমি ভয়ে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

ইসমাঈল : তুমি অনর্থক ভয় পেয়েছ।

বিলকিস : কেন?

ইসমাঈল : সাপটি তোমার কোনো ক্ষতি করতো না।

বিলকিস : কেন?

ইসমাঈল : সাপটিও তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বিলকিস লজ্জা পেয়ে গেল। ইসমাঈল বললেন, আমি এসে দেখি সাপটি ফণা তুলে তোমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন তোমার সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

বিলকিস প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, রাত তো হয়ে এলো। আমরা কি আজ এখানেই রাত কাটাবো?

ইসমাঈল : না। বসো, আমি আসরের নামায পড়ে নিই। এই বলে ইসমাঈল ওযু করে নামায পড়লেন। তারপর বিলকিসকে ঝরনার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। তার ধারণা ছিল, ঝরনাটি হয়তো উপত্যকা থেকে বেরিয়ে আরো দুর পর্যন্ত বয়ে গেছে। ঝরনার দুধারে সবুজের সমারোহ, প্রস্ফুটিত রাশি রাশি ফুল।

উভয়েই ধীরে ধীরে সামনে এগুতে লাগলেন। উপত্যকাটি ক্রমশ ঢালু হয়ে নিচের দিকে গিয়েছে। মাইল খানেক যাওয়ার পর দেখা গেল যে, ঝরনাটি আরো সরু হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং নিচে একটি টিলায় পতিত হয়েছে।

আরো এগিয়ে দেখা গেল, ঝরনার পাশে প্রায় দুফুট প্রশস্ত একটি খাড়া পথ। ইসমাঈল বললেন, আমরা এ খাড়া পথে নীচে নেমে যেতে পারবো।

বিলকিস : তাহলে চেষ্টা করে দেখা যাক।

ইসমাঈল : তুমি ভয় পাবে না তো?

বিলকিস : না।

ইসমাঈল : দেখো, আমরা অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছি। আর পথটিও অত্যন্ত সরু।

বিলকিস : আমার ব্যাপারে ভয় নেই।

ইসমাঈল : তাহলে আমার হাত ধরে পেছনে পেছনে মেনে এসো।

বিলকিস : আচ্ছা, ঠিক আছে।

ইসমাঈল বিসমিল্লাহ বলে এগুতে লাগলেন। বিলকিস পেছনে পেছনে যেতে লাগলো। পথটি ছিল অসমান, কখনো উঁচু আবার কখনো নিচু। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পথ। একটু ব্যতিক্রম হলেই গভীর খাদে পড়ে যেতে হবে। ইসমাঈল অত্যন্ত সাবধানে নিজে নামছিলেন এবং বিলকিসকেও নামাচ্ছিলেন। তারা এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। আল্লাহ আল্লাহ করে পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে এক সময় তারা নিচে সমতল ভূমিতে নেমে এলেন। তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। ইসমাঈল ওযু করে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

নয়. জিহাদী প্রেরণা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, খ্রিষ্টানরা লাক্কা উপত্যকায় নদীর তীরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কর্ডোভা, মালাগা ও অন্যান্য দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। তারিক তাঁর সৈন্যদলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। একটি দল তাঁর সঙ্গে ছিল। এই দলকে সঙ্গে করে তিনি স্পেনের তৎকালীন রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুগীছ আর-রূমীকে কর্ডোভার দিকে আর যায়দকে মালাগায় পাঠান। যায়দ মালাগা অধিকার করে ফেললেন। মুগীছ আর-রূমী কর্ডোভায় পৌছে দুর্গের অনতিদূরে শেকান্দা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

মুসলমানদের নীতি হচ্ছে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তাঁরা কোনো দেশ আক্রমণ করেন না। তাঁরা প্রথমে দূত পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে তবেই আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

সে নিয়ম অনুযায়ী মুগীছ প্রথমে কর্ডোভাবাসীদের কাছে একজন দূত পাঠালেন। কর্ডোভায় রডারিকের এক আত্মীয় ছিলেন দুর্গের অধিপতি। প্রথম থেকেই সেখানে অনেক সৈন্য প্রস্তুত রেখেছিল; তদুপরি পরাজিত অনেক খ্রিষ্টান সৈন্যও সেখানে গিয়ে জমায়েত হলো। ফলে দুর্গে সৈন্য সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল।

দুর্গটি ছিল খুবই মজবুত ও দুর্জয়। খ্রিষ্টানদের ধারণা ছিল, মুসলমানরা সহজে দুর্গটি অধিকার করতে পারবে না। তারা দুর্গের সকল দ্বার বন্ধ করে দিয়ে প্রাচীরের উপর সৈন্য মোতায়েন করলো।

মুসলিম দূত দুর্গের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার পরিধানে আরবি পোশাক, হাতে ইসলামি পতাকা। খ্রিষ্টানরা দূতকে দেখে শোরগোল শুরু করলো। সমস্ত খ্রিষ্টান জড়ো হয়ে আরব দূতকে দেখতে লাগলো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো এরাই সম্রাট রডারিকের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছে।

হইচই শুনে দুর্গের প্রধানও সেখানে উপস্থিত হয়ে দুর্গ-চূড়া থেকে দূতকে দেখতে লাগলো। সে ধারণা করেছিল, মুসলমানরা মানুষ নয়। কিন্তু এখন দূতকে দেখে সে বললো, এ তো দেখছি আমাদের মতোই মানুষ। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা মুশকিল কিসের?

তার পাশেই একজন খ্রিষ্টান সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। লাক্কা উপত্যকার যুদ্ধে সে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। সে বলল, সর্দার! দেখতে তো মানুষই মনে হয়, কিন্তু যুদ্ধ শুরু করলে তারা অতিমানব হয়ে যায়।

দুর্গাধিপতি মুখ ভার করে বলল, এ আবার কেমন কথা! ওরা তো আমাদের মতোই মানুষ। সুতরাং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এমন মুশকিল কী?

সৈনিক : যখন যুদ্ধ যাবেন, কেবল তখনই তাদের বুঝতে পারবেন।

দুর্গাধিপতি : আমি তাদের সবাইকে হত্যা করবো অথবা পালাতে বাধ্য করবো।

সৈনিক : দেখা যাক, কী হয়।

দুর্গাধিপতি (গর্বের সুরে) : দেখে নিও তা-ই হবে।

সৈনিক : লোকটি কী যেন বলছে বলে মনে হচ্ছে।

মুসলিম দূত খুব উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, আমি তোমাদের নেতার সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিন্তু খ্রিষ্টানরা তার কথা কিছুই বুঝতে পারলো না। দুর্গাধিপতি সৈনিকটিকে লক্ষ্য করে বলল, ইহুদিরা যে ভাষায় কথা বলে সে তো দেখছি সেই ভাষায় কথা বলছে। তাহলে কোনো ইহুদিকে ডেকে নিয়ে এসো।

তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোক দৌড়ে গিয়ে দুজন ইহুদিকে ডেকে নিয়ে এলো। দুর্গাধিপতি তাদের লক্ষ্য করে বলল, দেখো তো আগন্তুক কী বলতে চাচ্ছে?

একজন ইহুদি এগিয়ে দূতকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? কী জন্য এসেছ?

দূত : আমি একজন আরব মুসলমান ও দূত।

ইহুদি দুর্গাধিপতিকে দূতের পরিচয় জানালো। দুর্গাধিপতি বিস্ময়ের সুরে বলল, আরব মুসলমান! তারা তো সেই জাতি যারা রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে শামে পর্যুদস্ত করেছিল।

ইহুদি : জী হ্যাঁ, তারা সেই জাতি।

দুর্গাধিপতি : দূতকে জিজ্ঞেস করো, সে কী বলতে চায়?

ইহুদি চিৎকার করে দূতকে তার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলো।

দূত : তোমরা হয়তো শুনেছ, সম্রাট রডারিক পরাজিত ও নিহত হয়েছে এবং তার সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের আমিরের ইচ্ছে, আর কোনো প্রকার রক্তপাত না ঘটিয়ে দুর্গটি আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। আমরা তোমাদের নিরাপত্তার অঙ্গীকার করছি। তোমাদের ওপর যেসব কর আরোপ করা হয়েছে, সব মাফ করে দেয়া হবে। কেবলমাত্র খাজনা ও জিযিয়া দিলেই চলবে।

ইহুদি দুর্গাধিপতিকে দূতের কথা বুঝিয়ে দিল।

দূত : আর তোমরা যদি সন্ধি করতে রাজী না হও, তবে দুর্গের উপর হামলা করা হবে। বিজয়ের পর কাউকেই ক্ষমা করা হবে না।

দুর্গাধিপতি : তোমরা জেনে রাখ, একশ বছরেও দুর্গ জয় করতে পারবে না।

দূত : অহংকার করো না। সম্ভবত আল্লাহ্ আজকেই দুর্গটি আমাদের অধিকারে এনে দেবেন।

দুর্গাধিপতি : তাহলে তোমরা তোমাদের আল্লাহর সঙ্গে মিলে চেষ্টা কর।

দূত : তাই হবে। আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র সহায়।

দূত ফিরে এসে খ্রিষ্টানদের সাথে কৃত আলোচনার মুগীছকে জানালেন। মুগীছ আমামনকে ডেকে নিয়ে দুর্গে প্রবেশের কোনো গোপন পথ আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন।

আমামন : আমার জানা মতে কোনো গোপন পথ নেই।

মুগীছ : প্রাচীরের কোনো অংশ কি নিচু?

আমামন : জী না প্রাচীর খুবই উঁচু ও মজবুত। কিন্তু ...

মুগীছ : কিন্তু কী?

আমামন : প্রাচীরের একদিকে একটি ফাটল আছে। সেখানে একটি গাছও আছে। সে ফাটলটি যদি মেরামত করা না হয়ে থাকে, তবে দুর্গে প্রবেশের একটি পথ বের করা যেতে পারে।

মুগীছ : আমাদের তো চেষ্টা করতে হবে। তবে দিনে নয়; রাতে।

আমামন : সেটাই ঠিক হবে।

মুগীছ : সবাইকে জানিয়ে দাও, তারা যেন দিনেল বেলায় বিশ্রাম সেরে নেয়। রাতে অভিযানে বের হতে হবে।

মুজাহিদরা এ কথা শুনে আনন্দিত হলেন। তাঁরা নিজ নিজ তাঁবুর সামনে গিয়ে অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করতে থাকলেন। মুগীছ ভেবেছিলেন, মুজাহিদরা হয়তো দিনে বিশ্রাম নেবে; কিন্তু মুজাহিদরা জিহাদী প্রেরণায় এত উদ্দীপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা সবরকমের আরাম হারাম করে অস্ত্রের ধার পরীক্ষায় মত্ত হলো।

আসরের নামাযের পর দেখা গেল, আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে এবং প্রবল বেগে বাতাস বইছে। তখন বর্ষাকাল চলছে। মেঘের গর্জন দেখে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি বৃষ্টি নেমে এলো। মুগীছ সবাইকে সকাল সকাল খাবার সেরে নিতে নির্দেশ দিলেন। কারণ বৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা ছিল। চারিদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছিল। কালো মেঘ সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল।

খাবার তৈরি শেষ হতে না হতেই বৃষ্টি নামলো। তখন সবেমাত্র অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে; কিন্তু কোনো ছাউনি না থাকায় খাবার তৈরি তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তা সত্ত্বেও তারা আটা দিয়ে রুটি তৈরি করতে লাগল। ইতোমধ্যে মাগরিবের আযান হয়ে গেছে। সকলেই সমস্ত কাজ ফেলে নামাযে চলে গেলেন।

যার হাতে একটি মাত্র রুটি বাকী ছিল, তিনিও সেটি ফেলে নামাযে চলে গেলেন। ফরয নামাযে রত থাকা অবস্থায়ই প্রবল ধারায় বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, সেখানেও কোনো ছাউনি ছিল না। তাই মুসলমানরা বৃষ্টিতে ভিজে গেলেন এবং ভেজা অবস্থায়ই নামায আদায় করলেন।

ইতোমধ্যে উনুনের আগুনও নিভে গেল। মুজাহিদরা অতিকষ্টে আবার আগুন জালালেন। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই রুটি তৈরি করলেন। ভেজা কাপড় নিয়েই তারা রাতে আহার গ্রহণ করলেন। আহার শেষ হতে না হতেই ইশার আযান হলো। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই তারা ইশার নামায আদায় করলেন। নামায শেষ হলে মুগীছ সকলকে বললেন, ভাইয়েরা; যদিও এখন বৃষ্টি হচ্ছে এবং এমন সময় অভিযানে বের হওযা তোমাদের কাছে খারাপ লাগবে, তথাপি আমার ইচ্ছে, এ সময়ই আমরা অভিযানে বের হবো। তবে আমার সঙ্গে এক হাজার সৈন্য হলেই চলবে।

চারদিক থেকে সমানভাবে আওয়াজ এলো আমরা সকলেই এ বৃষ্টিতে বের হতে ইচ্ছুক। মুগীছ খুশি হলেন। বললেন, আমার বিশ্বাসও তাই ছিল। তোমরা সকলেই আমার সঙ্গে যেতে চাইবে। তবে আপাতত এক হাজার অশ্বারোহী হলেই চলবে।

মুসলিম মুজাহিদরা তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সকলকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখে মুগীছ বললেন, তোমরা সবাই কী যেতে চাচ্ছ?

কয়েকজন বললেন, না।

মুগীছ : তাহলে তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

একজন বললেন, কারা যাবে আপনি তো নির্দিষ্ট করে বলেননি, তাই আমরা সবাই এসেছিল। এখন আপনি যাদের বলবেন তারাই আপনার সঙ্গে যাবে।

তিনি নিজের ভুর বুঝতে পারেন এবং অযথা সকলকে কষ্ট দেয়ার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রথম দিকের এক হাজার সৈন্যকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর এক হাজার বীর মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের দিকে এগুতে লাগলেন।

দশ. দুঃসাহসিক অভিযান

মুগীছ এক হাজার সৈন্য নিয়ে দুর্গের উদ্দেশে বের হলেন। বৃষ্টি আরো বেড়ে গেল। বাতাসের গতিও বৃদ্ধি পেলো। মেঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। মুজাহিদরা যদিও বর্ম পরিহিত ছিল, কিন্তু বৃষ্টির পানিতে মাথা ভিজে গণ্ডদেশ বেয়ে সারা শরীর ভিজে গিয়েছিল। বাতাস ও বৃষ্টির গতি তখন এতোই বৃদ্ধি পেয়েছিল, মুজাহিদরা চোখ খুলতে পারছিলেন না। সামনে যেতে অত্যন্ত বেগ পেতে হচ্ছিল; কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলমানরা এসব উপেক্ষা করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এগুতে লাগলেন। একে তো অন্ধকার রাত, তদুপরি ঝড় বৃষ্টির সকল বাধা এড়িয়ে মুজাহিদরা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন।

প্রকৃতপক্ষে এতে অন্ধকার নেমে এসেছিল যে খুব কাছের জিনিসও দেখা যাচ্ছিল না। মুজাহিদরা কেবল অনুমানের ওপর নির্ভর করে সামনে এগুচ্ছিলেন। বিদ্যুৎ চমকানো আলোতে তারা তাদের পথ দেখে নিতেন। এভাবে তারা একসময় দুর্গ প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছলেন।

আমামনও তাদের সাথে ছিলো। ক্রমাগত ভেজার কারণে তার সর্দি লেগে গিয়েছিল। তার শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারো মুখেই কথা নেই, সবাই একইভাবে ভিজছে। কিন্তু মুসলমানরা বেপরোয়া কোনো কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই। অনবরত মেঘ গর্জন, ঘনঘন বিদ্যুতের চমক এবং প্রবল বায়ু প্রবাহের ফলে ঘোড়ার পদধ্বনি প্রাচীররক্ষীদের শোনার সম্ভাবনা নেই। মুসলমানরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে প্রবল বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে কোনো খ্রিষ্টানই প্রাচীর পাহারায় থাকবে না।

প্রাচীররক্ষীরা সকলেই মিনার কিংবা নিকটস্থ ব্যারাকে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মনে ভরসা ছিল, প্রাচীরে কোনো ফাটল বা সুরঙ্গ পথ নেই। তাছাড়া তারা ভেবেছিল, এ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে মুসলমানরা কোনোমতেই তাঁবু থেকে বের হবে না।

মুগীছ আমামনকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রাচীরটি কোন দিকে?

আমামন ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

মুগীছ : তোমার তো দেখছি খুবই ঠান্ডা লেগে গেছে।

আমামন : জী হ্যাঁ।

মুগীছ : আমরা এ বৃষ্টির মধ্যে তোমাকে এনে খুবই ভুল করেছি।

আমামন : এ বৃষ্টির মধ্যে আমাদের বের হওয়াই ঠিক হয়নি।

মুগীছ : তা হয়তো ঠিক। কিন্তু বৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ হয়তো আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা যদি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করি, তাহলে আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে!

আমামন : আপনারা কিসের তৈরি, তা আমার বুঝে আসে না। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় কোনো কিছুই আপনাদের ওপর প্রভাব ফেলে না। শত্রুর আধিক্যও আপনাদের পিছপা করতে পারে না।

মুগীছ : মুসলমানরা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তারা বেপরোয়া হয়ে থাকে। তাই মুসলমানরা যখন কোনো কিছু ইচ্ছা করে, তখন আল্লহর উপর ভরসা করেই করে। ফলে তারা কখনো সে ইচ্ছে থেকে সরে দাঁড়ায় না। আল্লাহও তাদের সাহায্য করেন। তাই তারা সফলতা লাভ করে।

মুগীছ : ঘনঘন বিদ্যুৎ জমকাচ্ছে, ফাটলটি কোন দিকে তা বুঝার চেষ্টা করো।

আমামন : তাই করছি।

প্রতিটি মেঘ গর্জনের পরই বিদ্যুৎ চমকাতো। মুসলমানরা সেসময় পথ দেখার চেষ্টা করতেন এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করতেন। এবার বিদ্যুৎ চমকালে মুগীছ জিজ্ঞেস করলেন, কিছু কি আন্দাজ করতে পেরেছ?

আমামন : জী না, বিদ্যুতের ঝলক আমার চোখ বন্ধ করে দিয়েছে।

মুগীছ : ফাটলের কোনো চিহ্ন কি তোমার মনে আছে?

আমামন : হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ফাটলের কাছে একটি গাছ আছে।

মুগীছ : বেশ তাতেই হবে।

অতঃপর মুগীছ সকলকে বললেন, মুসলমান ভাইসব! তোমরা প্রাচীরের কাছে একটি গাছের তালাশ করবে। তারপর তিনি সামনে এগুতে লাগলেন। সৈন্যরা তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এক সময় তারা উত্তর পার্শ্বে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে প্রাচীরের কাছে কয়েজন মুজাহিদ একটি গাছ দেখতে পেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, গাছটি এখানে হুজুর! মুগীছও গাছটির কাছাকাছি দাঁড়ানো ছিলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারের জন্য তিনি গাছটিকে ভালো দেখতে পাচ্ছিলেন না। ইতোমধ্যে আবার বিদ্যুৎ চমকালে তিনি গাছটি দেখতে পেয়ে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক, এটিই সেই গাছ। এবার ফাটল তালাশ করো।

মুগীছ সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে সকল সৈন্যদলই সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলের চোখই তখন প্রাচীরের দিকে। সকলেই প্রাচীরের ফাটলটির অন্বেষণে। কিন্তু গাছের পাতা বেয়ে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার জন্য

উপরে তাকানো যাচ্ছে না। তথাপি কয়েকজন উৎসাহী যুবক চোখে হাত রেখে উপরে তাকানোর চেষ্টা করেন এবং বিদ্যুতের আলোতে সে ফাটলটি দেখতে পেলেন। তারা মুগীছকে জানালেন, আমরা ফাটলটি দেখেছি।

মুগীছ : কোথায় ফাটলটি?

একজন মুজাহিদ বললেন, গাছের বৃহৎ যে ডালটি প্রাচীরের দিকে গিয়েছে ফাটলটি সোজাসুজি এর ওপরে।

আমামনও সেখানেই দাঁড়ানো ছিল। সে বলল, হ্যাঁ ফাটলটি ডালের সোজা সামনে।

মুগীছ : ডাল কি ফাটলটি পর্যন্ত পৌঁছেছে?

আমামন : জী না, ফাটলটি ডাল থেকে তিন চার ফুট দূরে। শেষের ডালটি এতোই নরম যে, কোনো মানুষের ভার বহন করতে পারে না।

হালকাপাতলা গড়নের একজন মুজাহিদ বললেন, আমার ভার বহন করবে। সকলের মধ্যে আমি সবচাইতে হালকা।

আমামন : না না আপনি উঠার চেষ্টা করবেন না, তাহলে নিচে পড়ে মরে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

মুজাহিদ : মৃত্যুই তো আমাদের কাম্য।

আমামন : আপনাদের এ মনোবলই আপনাদের সফলতার কারণ।

মুগীছ : তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে উঠে পড়ো; কিন্তু যেখান থেকে নরম ডালটি শুরু হয়েছে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করো। বিদ্যুৎ চমকালে ডালটি তোমার ভার বহন করবে কিনা এবং ফাটল পর্যন্ত যেতে পারবে কি না, তা দেখে নেবে।

আমামন : দুটিই অসম্ভব ব্যাপার।

মুগীছ : তোমার কী মনে হয়?

আমামন : ডালটিও তার ভার বহন করবে না এবং ফাটলটি পর্যন্তও পৌঁছতে পারবে না।

মুগীছ : আল্লাহ ভরসা, তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন। যুবকটি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গেল। নিচে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে গিয়েছিল। তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যুবকটি পানি ভেঙ্গে গাছটির নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। গাছটি সম্পূর্ণ ভেজা হওয়ায় তাতে উঠা সহজ ছিল না। কিন্তু যুবকটি বিসমিল্লাহ বলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাছে উঠতে লাগল। ডাল থেকেও টপটপ করে বৃষ্টি পড়ছিল; কয়েকবার পা ফসকে যাওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু তাতেও সে ভয় না পেয়ে বরং যথারীতি উঠতে লাগলো এবং একসময় উঠে গেল।

উপরে উঠেই প্রাচীরের দিকে যে ডালটি গিয়েছিল তাতে আরোহণ করল। গোড়ার দিকটা যথেষ্ট মোটা ছিল। তাতে একজন মানুষ সহজেই আসা যাওয়া করতে পারবো; কিন্তু ডালটি যতই সামনে গিয়েছে, ততই সরু হয়েছে। যুবকটি সামলে এগুতে লাগলো। বিদ্যুৎ চমকানোর সময় সে প্রাচীর দেখে নিচ্ছিল। অন্তরে সফলতার আনন্দের সুর বেজে উঠছিল। এভাবে প্রাচীরের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌছল; কিন্তু ক্রমে ঝুলে পড়ছিল। বিদ্যুৎ আলোয় দেখতে পেলো যে, প্রাচীরের ফাটলটি আর মাত্র পাঁচ-ছয় ফুট দূরে। সে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বিসমিল্লাহ বলে এক লাফ দিয়ে ফাটলটির ঠিক ভেতরে গিয়ে বসে পড়ল। যেন, কেউ তাকে তাতে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। একটু উপরেই ছিল প্রাচীরের একটি আংটা। যুবকটি সে আংটা ধরে প্রাচীরের উপরে উঠে গেল।

প্রাচীরের উপরে উঠে যুবকটি দেখতে পেলো, সমস্ত প্রাচীর একেবারে জনশূন্য। কোথাও কোনো খ্রিষ্টান সৈন্যের লেশমাত্র নেই। সে তাড়াতাড়ি নিজ পাগড়ি খুলে নিচে লটকিয়ে ধরল এবং উচ্চস্বরে বলতে লাগল, আমি প্রাচীরের উপরে উঠে এসেছি এবং পাগড়ি লটকে দিয়েছি। আপনারা শীঘ্রই উপরে উঠতে শুরু করুন।

আমামনের বিশ্বাস ছিল যে, যুবকটি কোনোমতেই প্রাচীরে উঠতে পারবে না; কিন্তু প্রাচীরের উপর থেকে যখন তার আওয়াজ শুনতে পেলো, তখন সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। বলল, অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার!

মুগীছ : এটা আল্লাহর মেহেরবানি।

অতঃপর সকল মুজাহিদ ঘোড়া থেকে নেমে প্রাচীরের নিকটবর্তী হলো এবং একের পর এক ওপরে উঠে যেতে লাগল। এভাবে প্রায় পাঁচশত মুজাহিদ প্রাচীরের উপর উঠে গেলেন। মুগীছ অবশিষ্টদের উঠতে বারণ করলেন। তিনি বাকীদের সদর দরজায় গিয়ে দরজা খোলার অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিলেন।

দুজন মুজাহিদকে কেবল দরজা খোলার দায়িত্ব দেয়া হলো। অশ্বারোহী পাঁচশত সৈন্যকে দরজার দিকে পঠিয়ে দিয়ে মুগীছ নিজে প্রাচীরে উঠে গেলেন। প্রাথমিক এ সফলতার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

এগার. দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদীন

তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টিতে ভেজার ফলে মুজাহিদদের সর্দি লেগে গিয়েছিল এবং ঠাণ্ডায় কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। মুগীছ তার সামনেই একটি বুরুজ দেখতে পেলেন। তিনি মাত্র ৫০ জন সৈন্য নিয়ে সে বুরুজে ঢুকে পড়লেন। প্রথম কক্ষটি যথেষ্ট প্রশস্ত। ভেতরে আলো জ্বলছিল্। সেখানে অনেক খ্রিষ্টান সৈন্য ঘুমিয়ে ছিল। মুগীছ সেখানে ঢুকেই আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন। এই ধ্বনি শুনে খ্রিষ্টানরা ঘুম থেকে উঠে পড়ে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই সামনে সশস্ত্র মুজাহিদদের দেখে ঘাবড়ে যায়। তারা দ্রুত অস্ত্র তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। মুগীছ তাদেরকে ধমকে বললেন, তোমরা ভালো চাও তো অস্ত্র ফেলে দাও। কিন্তু খ্রিষ্টানরা তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারল না। বরং অস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

মাত্র পঞ্চাশজন মুসলমানকে বুরুজের ভেতর দেখতে পেয়ে খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারলো না কিভাবে এই স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ভেতেরে প্রবেশ করেলো। অথচ বুরুজের ভেতরে খ্রিষ্টানের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন শতের মতো। তাই তারা সাহসী হয়ে উঠল। তারা ভাবল, হয়তো তারা এ স্বল্প সংখ্যক মুসলমানকে মেরে ফেলবে নয়তো প্রাচীর থেকে নিচে ফেলে দেবে।

খ্রিষ্টানরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে মুসলমানদের উপর হামলা চালালো। এতে মুসলমানরাও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল। তারা তলোয়ার নিয়ে খ্রিষ্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং একের পর এক খ্রিষ্টনদের হত্যা করতে লাগল। খ্রিষ্টানরা প্রাণপণে চেষ্টা করছিল এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তলোয়ার চালাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হলো না; অপরপক্ষে মুসলমানদের কোনো আক্রমণই লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছিল না; বরং তাদের প্রতিটি আক্রমণ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানছিল। মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের মৃতদেহ প্রাচীরের নিচে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছিল।

মুগীছ ওপরে ওঠার সিড়ি তালাশ করতে লাগলেন; কিন্তু গভীর অন্ধকারে সন্ধান করা গেল না। এমনি করতে করতে তারা অপর আরেকটি বুরুজের কাছে এসে গেলেন। মুগীছ সে বুরুজের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পান, সেখানেও খ্রিষ্টান সৈন্য রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জাগ্রত; বাকীরা ঘুমিয়ে। মুগীছ অল্প

কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। তাঁদের দেখেই খ্রিষ্টানরা কাঁপতে লাগল এবং জিন এসছে বলে চিৎকার শুরু করল।

সত্য কথা বলতে কি মুসলমানরা জিনের মতোই কাজ করছিল। ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁরা যেভাবে কর্ডোভা দুর্গে এসে হামলা করেছিল, তা কোনো মানুষের পক্ষেই হয়তো অসম্ভব ছিল না। যাক, ভীত খ্রিষ্টানদের শোরগোলে ঘুমন্ত খ্রিষ্টানরাও জেগে উঠল। মুগীছ চিৎকারে করে বলতে লাগলেন, খ্রিষ্টানরা, তোমরা অনর্থক মৃত্যুকে ডেকে এনো না, ভালো চাও তো অস্ত্র ফেলে দাও।

খ্রিষ্টানদের কেউই তাঁর কথা বুঝতে পারলো না। ফলে তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র তুলে নিল এবং মুসলমানদের সামনে এসে দাঁড়ালো। মুসলমানরা তাদেরকে এমতাবস্থায় দেখেই ক্ষীপ্ত হয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফলে উভয় পক্ষের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল; খ্রিষ্টানরা এতোই ভীত ছিল যে, তারা কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। এভাবেই তারা মরতে লাগল।

যেসব খ্রিষ্টান চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল, তারাও উঠে এলো; কিন্তু মুসলমানদের তীব্র আক্রমণের মুখে তারা টিকতে পারলো না। মুজাহিদরা তাদেরও খতম করতে লাগলেন।

এ অবস্থা দেখে খ্রিষ্টানরা চিৎকার করতে করতে বুরুজের বাইরে চলে এলো; কিন্তু বেরিয়ে এসে বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলো, আরো বহু মুসলমান প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে তারা ভেবেছিল যে, মুসলমানদের সংখ্যা হয়তো বুরুজে যে কয়েকজন প্রবেশ করেছে এ পর্যন্তই। তাই তারা আত্মরক্ষার জন্য বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু বাইরে এসে আরো বহু মুসলমান প্রাচীরের উপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো দেখে তখন তারা চিৎকার করতে করতে বুরুজের অন্যদিকে চলে গেল।

বুরুজের বাইরে যেসব মুজাহিদ দাঁড়ানো ছিল, তারা খ্রিষ্টানদের পালাতে দেখে পিছু ধাওয়া করেন। মুসলসমানরা তাদের পিছু দৌড়াচ্ছে আর খ্রিষ্টানরা চিৎকার করতে করতে দ্রুত পালাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে খ্রিষ্টানরা সিড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলো। মুসলমানরাও তাদের পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। খ্রিষ্টানরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল আর সাহায্য চাচ্ছিল।

ব্যারাকগুলো ছিল প্রাচীরের নিচে তাদের চিৎকার ধ্বনি অন্যান্য ঘুমন্ত খ্রিষ্টানকে জাগিয়ে তুলেছিল। ব্যারাকের খ্রিষ্টানরা সঠিক অবস্থা বুঝার জন্য ব্যারাকের ভেতর থেকে দরজায় উঁকি দিল। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে। তবে প্রবলতা অনেকটা কমে এসেছে। মেঘের গর্জনও অনেকটা কমে গেছে। তবে অন্ধকার থখনও কাটেনি। ফলে চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

প্রাচীরের উপর থেকে খ্রিষ্টানরা যখন চিৎকার করতে করতে দৌড়াচ্ছিল, তখন ব্যারাকের খ্রিষ্টানরাও তা শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু কী ঘটছে কারোই বাইরে এসে তলিয়ে দেখার সাহস ছিল না। বরং যেসব ব্যারাকে বাতি জ্বলছিল, তারাও ভয়ে আলো নিভিয়ে দিল। তাদের ভয়, মুসলমানরা যদি ভেতরে এসে পড়ে তবে তো ব্যারাকে হামলা চালাতে পারে।

বুরুজ থেকে বেরিয়ে যারা পালানো চেষ্টা করছিল তাদের অনেকেই নিহত হলো, যারা জীবিত ছিল, তারাও চিৎকার করতে করতে এদিক সেদিক দৌড়াতে লাগল। আসলে তাদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তাই চিৎকার করে মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। তারা যদি চুপিচুপি সিড়ি বেয়ে কোনো ব্যারাকে আত্মগোপন করতো, তবে হয়তো মুসলমানদের পক্ষে তাদের পিছু ধাওয়া করা সম্ভব হতো না; কিন্তু চিৎকার করে তারা পিছে ধাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

অতএব ফল দাঁড়ালো যে, এক এক করে সকল খ্রিষ্টানকে হত্যা করা হলো। এক সময় খ্রিষ্টানদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেলে মুসলমানরা ধরে নিল যে সকল খ্রিষ্টান নিহত হয়ে গেছে, যদিও কেউ কেউ দুর্গের ভেতরে আত্মগোপন করেছিল।

কিন্তু অন্ধকার এতো ঘন ছিল যে, দুর্গের ভিতর কোথায় ব্যারাক, কোন দিকে সদর দরজা কিছু বুঝা যাচ্ছিল না। মুজাহিদরা দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, এখন তারা কি করবেন কোনদিকে যাবেন। মুগীছ এখনো আসেননি, মুজাহিদরা তাঁর জন্যও অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর মুগীছও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই জোরে তাকবীর ধ্বনি লাগালেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরাও খুব জোরে ধ্বনি দিলেন। দুর্গের চারদিকে এ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এতে খ্রিষ্টানরা আরো ভীত হয়ে পড়ল। তারপর মুগীছ সামনে এগুতে লাগলেন। মুজাহিদরা তাঁর পেছনে পেছনে চললেন। সদর দরজাও তাঁর সামনে পড়ে গেল। তখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশও পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকারও কমে গেছে। এক সময় তারা দরজার কাছে এসে পৌছলেন। দরজার সামনে পাঁচশত খ্রিষ্টান সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিল। সম্ভবত তারা মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। তারা অত্যন্ত প্রস্তুত হয়ে দাড়িয়ে ছিল। মুসলমানদেরকে দেখা মাত্রই সে সকল খ্রিষ্টান সৈন্য যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। মুজাহিদরাও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল এবং তলোয়ার বের করে সামনে এগুতে লাগল। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের এগুতে দেখেই আক্রমণ চালালো। মুসলমানরা পাল্টা আক্রমণ চালাল। তাদের আক্রমণ ছিল আরো তীব্রতর। প্রথম আক্রমণেই প্রথম সারির প্রায় সকল সৈন্য নিহত হলো। পরক্ষণেই তাঁরা দ্বিতীয় সারির উপর

হামলা চালালেন। সারা রাতের বৃষ্টিভেজা মুজাহিদরা অত্যন্ত ক্ষীপ্ত হযে উঠেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেক আক্রমণে পঞ্চাশ ষাটজন করে হত্যা করতে লাগলেন।

খ্রিষ্টানরাও জোর আক্রমণের চেষ্টা করছিল; কিন্তু ভাগ্য ছিল তাদের প্রতি অপ্রসন্ন। তাই কোনো আক্রমণই মুসলমানদের মধে কোনো প্রভাব ফেলতে পারলো না; বরং মুসলমানরা কচুকাটার করে একের পর এক খ্রিষ্টানদের হত্যা করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অধিকাংশ খ্রিষ্টান সৈন্য মারা গেল; বাকীরা বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গেল। কয়েকজন মুজাহিদ দরজায় এগিয়ে গিয়ে তালা ভেঙ্গে সদর দরজা খুলে দিলেন।

মুগীছ যে পাঁচশ সৈন্যকে দরজার বাইরে অপেক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তারাও সামনেই উপস্থিত ছিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভেতরে চলে এলো। তখন সুবহে সাদিক হয়ে এসেছে। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোর রেখা ফুটে উঠেছে।

পাঁচশত অশ্বারোহী একসঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেই দুর্গের চতুর্দিকে চক্কর দেয়ার ইচ্ছা করলেন। ইতোমধ্যে বাইরেও তাকবীর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুসলমানরা বুঝতে পারেন যে, তাদের সকল সৈন্য এসে গেছে। অতএব তারাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি লাগালেন। সকল মুজাহিদ ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলেন। মুগীছ তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বার. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

কর্ডোভার খ্রিষ্টানরা রাতের ঝড় বৃষ্টির ভয়ে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে ছিল এবং তন্দ্রায় ঝিমুচ্ছিল। হঠাৎ আল্লাহু আকবারের গগনবিদায়ী আওয়াজ শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা জানতে পেরেছিল, গতকাল সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম দূত এসেছিল; কিন্তু তারা ফিরিয়ে দিয়েছে।

খ্রিষ্টানদের ধারণা ছিল, পুরো এক বছর অবরোধ করলেও মুসলমানরা তাদের পরাস্ত করতে পারবে না; কিন্তু আজ তাকবীর ধ্বনি শুনে তাদের সবকিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেল। বাস্তাবে কী ঘটছে তা দেখার জন্য তারা ব্যারাক .থকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে বেরিয়েই তারা দেখতে পেলো, মুসলমানরা বুরুজের সকল খ্রিষ্টানকে হত্যা করে ফেলেছে এবং এদিক ওদিক তাদের মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ইতোমধ্যে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বাকাশে সুর্যোদয়ের উপক্রম। কোথাও কোনো অন্ধকার নেই। মুসলমানরা ফাটল পেরিয়ে একটু এগিয়ে এসে ব্যারাকের সৈন্যদেরকে দেখতে পেলেন তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

খ্রিষ্টানদের মোকাবিলা করার কোনো মানসিকতা ছিল না; কিন্তু মুসলমানরা হামলা চালালে তারাও আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনে এরূপ ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুসলমানদের সামনে এসেই তারা হতচকিত হয়ে পড়তো। যেমনভাবে বাঘের সামনে পড়লে মানুষ হতচকিত হয়ে পড়ে।

খ্রিষ্টানদের এ অবস্থা মুসলমানদেরকে আরো সাহসী করে তুলে। তারা সেখানে খ্রিষ্টানদেরকে হত্যা করতে থাকে। অনন্যোপায় হয়ে খ্রিষ্টান সিপহিরা চিৎকার করে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। তারা সাহায্যের আহ্বান জানাতে থাকে। তাদের চিৎকার ধ্বনি চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে; কিন্তু মুসলমানদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। কোনো পরোয়া নেই্ তাদের তলোয়ার দ্রুত আন্দোলিত হচ্ছে। আর একের পর এক খ্রিষ্টানকে শেষ করছে।

দুর্গাধিপতি হইচইয়ের শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলো। প্রহরীদের জিজ্ঞেস করল, হইচই কীসের? সৈন্যরা চিৎকার করছে কেন?

একজন প্রহরী : দুর্গের ভেতর মুসলমানরা ঢুকে গেছে সর্দার!

দুর্গাধিপতি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল, বলল–

মুসলমানরা দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়েছে!

প্রহরী : জী হ্যাঁ, সর্দার!

দুর্গাধিপতি : তুমি দেখেছ?

প্রহরী : না সর্দার!

দুর্গাধিপতি : তাহলে কি করে জানলে?

প্রহরী : ব্যারাকের একজন সিপাহি পালিয়ে এসে বলে গেছে।

দুর্গাধিপতি : সে কি মুসলমানদের দেখেছে?

প্রহরী : জী হ্যাঁ, দেখেছে। সে বলল, মুসলমানরা ভেতরে ঢুকে ব্যারাকের সিপাহিদের হত্যা করছে।

দুর্গাধিপতি : দুর্গে প্রবেশ করল কি করে?

প্রহরী : ওরা তো জিন হুজুর। জিনদের তো কোথাও আসা যাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই।

দুর্গাধিপতি : তারা জিন বা অন্য কিছুই হবে। তারা মানুষ নয়। মানুষ হলে যেখানে পশুপাখি ঢুকতে পারে না। সেখানে ওরা আসে কীভাবে?

প্রহরী : যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে জলদি সেখানে চলুন সর্দার!

দুর্গাধিপতি : হ্যাঁ, যাচ্ছি; তুমি সৈন্যদের একত্র কর, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

প্রহরী : সেটাই ভালো সর্দার।

দুর্গাধিপতি চলে গেল। প্রহরী সকল সিপাহিকে একত্র করল। ইতোমধ্যে দুর্গাধিপতিও প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এসেই জিজ্ঞেস করল। সকল সিপাহি এসেছে তো?

প্রহরী : জী হ্যাঁ।

দুর্গাধিপতি : তোমরা সবাই আমার সঙ্গে এসো।

দুর্গাধিপতি সেখান থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করল এবং দুর্গ-প্রাচীরের দিকে এগুতে থাকল।

মুসলমানরা তাদের সৈন্যদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একভাগ ব্যারাকের সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন। দ্বিতীয়ভাগ বুরুজ থেকে বেরিয়ে আসা সৈন্যদের উপর আক্রমণ করছেন। তৃতীয়ভাগ শহর থেকে আগত সেই সকল খ্রিষ্টানদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন যারা দেশ ও জাতি-বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

খ্রিষ্টানরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা অত্যন্ত মনোবল নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ আক্রমণই ব্যর্থ হচ্ছে। খ্রিষ্টানদের যারাই মুসলমানদের আক্রমণ করতে এগিয়ে যাচ্ছে তারাই তলোয়ারের আঘাতের শিকার হচ্ছে।

খ্রিষ্টানদের শক্তি-সাহস কিছুই কাজে আসছে না। মুসলমানরা খ্রিষ্টানরা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের যবনিকাপাত ঘটাচ্ছে।

মুসলমানদের তলোয়ার যেন একেকটি মৃত্যুদানব, যাদেরই স্পর্শ করছে তারাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। শত্রুদের রক্তে মুসলমানদের শরীর ভিজে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন রক্তের নদী থেকে ডুব দিয়ে এসছে। তাঁরা এমনভাবে ঘোড়া চালাচ্ছেন যে, যেদিকেই ছুটছে সেদিকেই মৃত্যুর হিড়িক পড়ে যাচ্ছে।

স্থানে স্থানে ছিন্ন হাত পা, মাথা স্তূপাকারে পড়ে আছে। জমে আছে স্তূপকৃত মৃতদেহ। ইতোমধ্যে ব্যারাকের সৈন্যরাও বেরিয়ে আসছে এবং মরণপণ যুদ্ধ করছে। কিন্তু তারা পদাতিক আর মুসলমানরা অশ্বারোহী; তবে খ্রিষ্টানরা সংখ্যায় অনেক। তবুও তারা মুসলমানদের মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারছে না। ফলে তারা অধিক পরিমাণে নিহত হচ্ছে।

খ্রিষ্টানরা চাচ্ছিল তারা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে অথবা দুর্গ থেকে বের করে দেবে; কিন্তু এটা ছিল সাধ্যাতীত। যদিও কিছু মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন, তবে তা সংখ্যায় অতি নগণ্য। কদাচিৎ কোনো মুসলমান শহীদ হচ্ছেন। কিন্তু খ্রিষ্টানরা বহুল পরিমাণে নিহত হচ্ছে আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। আহতরা আরো জোরে চিৎকার করছে। তাদের আর্তচিৎকারে চারিদিক ভারী হয়ে উঠেছে। স্থানে স্থানে জমাট বাধা রক্ত। এসব দেখে খ্রিষ্টানরা আরো ভীত হয়ে পড়ল।

অনেক বেলা হয়ে গেছে। হাঙ্গামা শুনে আশপাশের খ্রিষ্টানরা তাদের ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। তারা দৌড়ে সংঘর্ষের স্থানে আসতে লাগলো। কিন্তু মুসলমানদের দেখামাত্র ভয়ে দমবন্ধ করে এক পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

ইতোমধ্যে অনেক সৈন্য নিয়ে দুর্গাধিপতিও এসে যুদ্ধে উপস্থিত হলো। সে প্রথমেই মুগীছের বাহিনীর উপর হামলা চালালো। মুসলমানরাও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে এবং খুব জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল। তাদের এ ধ্বনি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। শত্রু সৈন্যরা তাতে থমকে গেল।

তাকবীর দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা তীব্র আক্রমণ চালালেন এবং খ্রিষ্টানদের কচুকাটা করতে লাগলেন। মুগীছ দুর্গাধিপতির ওপর হামলা চালালেন। মুগীছের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র দুইশত। আর খ্রিষ্টান সেনাপতির সৈন্য সংখ্যা ছিল দু'হাজার। কিন্তু মুসলমানরা সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপই নেই। বরং তারা অত্যন্ত শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তাঁদের তলোয়ারের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের প্রাণবায়ু উড়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ খ্রিষ্টানদের মধ্যে এ জন্য ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল যে, কোনো মুসলমানই মৃত্যুবরণ করছে না এবং দুর্গও ত্যাগ

করছে না; বরং নিজ নিজ অবস্থান থেকেই এক নাগাড়ে যুদ্ধ করে চলছে। যারাই তাদের তলোয়াদের নাগালে এসেছে তারাই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ছে। খ্রিষ্টানদের ইচ্ছে ছিল যে করেই হোক মুসলমানদের নিঃশেষ করে দেয়া কিংবা তাদের দুর্গ থেকে বের করে দেয়া। কিন্তু তা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। তারা মুসলমানদের তলোয়ারেই নিজেদের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত শুধু জান বাঁচানোর চেষ্টা করলো।

যেসব মুজাহিদ শহর থেকে আসা খ্রিষ্টানদের মোকাবিলা করছিলেন তারা যুদ্ধের সমাপ্তি টানার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। খ্রিষ্টানরা যদিও তাদের গতিরোধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল কিন্তু মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। রক্তের স্রোত বয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে শহরের খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারলো, আর যদি কিছুক্ষণ এভাবে যুদ্ধ চলে তবে মুসলমানরা কোনো খ্রিষ্টানকেই প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেবে না। সুতরাং তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করতে থাকল। মুজাহিদদের ইচ্ছা হচ্ছিল সকল খ্রিষ্টানকেই খতম করে দেয়া; কিন্তু প্রধান সেনাপতি তারিকের আদেশ তাদের মনে পড়ে গেল 'তোমরা নিরস্ত্র মানুষের উপর হাত তুলবে না।'

সুতরাং মুজাহিদরা তলোয়ার খাপে পুরে খ্রিষ্টানদের বন্দী করতে লাগলো। এসব খ্রিষ্টান ভাবল, তাদের সঙ্গে অনরাও আত্মসমর্পণ করবে। বন্দী খ্রিষ্টানরা মাতম জুড়ে দিল। তাদের কান্নাকাটির শব্দ শুনে ব্যারাক থেকে আগত সৈন্যরাও ভীত হয়ে পড়ল। যুদ্ধ করার মতো তাদের আর মনোবল রইলো না।

তারা করুণ দৃষ্টিতে মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুজাহিদরা বুঝতে পারলেন, যুদ্ধ করার মতো তাদের আর শক্তি নেই। তারা এখন প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় লিপ্ত। অতএব, মুজাহিদরা এবার এক তীব্র আক্রমণ চালালেন। এ হামলায় এক হাজার খ্রিষ্টান নিহত হলো। রণাঙ্গন মৃতদেহে ভরে গেল।

এই অবস্থা দেখে অবশিষ্টরা অস্ত্র ফেলে দিল এবং হাত জোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। মুসলমানরা আক্রমণ বন্ধ করে দিল। কিছু কিছু মুজাহিদ বন্দী করার কাজে নিয়োজিত হলো। কিছু সৈন্য মুগীছের দলকে সাহায্য করার জন্য সেখানে গেল। সেখানে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই তারা তখন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে আরো কিছু মুজাহিদ এসে মুগীছের দলে যোগ দিলেন একযোগে তীব্র আক্রমণ করলেন। এক আক্রমণেই বহু খ্রিষ্টান নিহত হলো। দ্বিতীয় আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টানরা ভয়ে পালাতে লাগলো। সবার আগে পালালো স্বয়ং দুর্গাধিপতি। মুজাহিদরা তার পিছু ধাওয়ার ইচ্ছা করলে মুগীছ তাদের নিষেধ করে সবাইকে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর সমস্ত মুজাহিদ এক জায়গায় সমবেত হলেন।

তের. কর্ডোভা বিজয়

মুজাহিদরা সারারাত ভিজেছেন আবার এক নাগাড়ে যুদ্ধ করেছেন। তাই মুগীছের ভয় ছিল, আরো বেশিক্ষণ ভেজা কাপড়ে থাকলে মুজাহিদরা হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। এজন্য তিনি মুজাহিদদেরকে সেনাপতির পিছু নিতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি সকলকে কাপড় বদলে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সমস্যা এই দাঁড়ালো যে, কারো সঙ্গে অতিরিক্ত কোনো কাপড় ছিল না। কারণ সকলেই কাপড় চোপড় তাঁবুতে রেখে এসেছিলেন।

অবস্থা দেখে মুগীছ পাঁচশ মুজাহিদকে তাঁবু থেকে কাপড় চোপড়সহ সকল জিনিসপত্র নিয়ে আসতে পরামর্শ দিলেন। বাকী সৈন্যদের গায়ের কাপড় খুলে শুধু পাজামা পরে রৌদ্রে বসে থাকতে বলেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সকলেই গায়ের কাপড় খুলে রোদ পোহাতে লাগলো। আসলেও সে সময় এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অনেক মুজাহিদই অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে মুজাহিদদের তাঁবুর সকল জিনিসপত্র নিয়ে আসা হলো। মুজাহিদরা শুকনো কাপড় পরে প্রাচীরের কাছাকাছি তাঁবু ফেললেন। কয়েদীদেরকে তাঁবুতে রাখা হলো এবং দুশ মুজাহিদকে পাহরার দায়িত্ব দেয়া হলো। বাকী সকলকে বিশ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। মুজাহিদরা তাঁবুতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

সে যুগের মুসলমানদের জীবন যাপন পদ্ধতিই ছিল বিস্ময়কর। তাঁদের শোবার ও খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখনই সময় পেতেন শুয়ে পড়তেন; আবার যখনই সময় পেতেন খেয়ে নিতেন। সে যুগের মুসলমানদের মধ্যে এমন ত্যাগ ও ধৈর্য ছিল বলেই তাঁরা গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

কিন্তু আজ আমরা এতোই আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছি যে, গ্রীষ্মকালে গরমের ভয়ে আমরা মসজিদে যেতে চাই না, নামায ছেড়ে দেই। বর্ষাকালে বৃষ্টির বাহানা করি, শীতে ঠান্ডার ওজর দেখাই। আমরা খবর রাখি না, কিয়ামতের দিন আমাদের নামায সম্পর্কেই সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে।

হাশর তো পরকালে; কিন্তু দুনিয়ার অবস্থা তো সবারই জানা। প্রথম যুগের মুসলমানদের সম্মান ছিল, কারণ তাদের মধ্যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল। তারা একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করতো। অথচ আমাদের মধ্যে সে নিষ্ঠাও

নেই, একাগ্রতাও নেই। তাই আল্লাহও আমাদের প্রতি সন্তুস্ট নন। আমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত। অসহায়ভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। আমরা যদি নিষ্ঠাবান হতে পারি, একাগ্র চিত্তে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হতে পারি, তাহলে আমরা আবার আল্লাহ সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হবো, সমগ্র পৃথিবী আবার আমাদের পদতলে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

যাক সে কথা, মুজাহিদরা জোহরের সময় ঘুম থেকে উঠলেন এবং নামায পড়ে দুপুরের আহার গ্রহণ করলেন। মুগীছ দুর্গের জিনিসপত্রের হিসাব নিবেন ঠিক করলেন। ইতোমধ্যে আমামনও দুর্গে ফিরে এলেন। তিনি তার ঘরের অবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন। তার সব জিনিসপত্র ঠিকঠাকই ছিল। আমামন মুগীছকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

মুগীছ : দুর্গটি ঘুরে দেখতে যাচ্ছি।

আমামন : এখনো একটি স্থান আপনাদের জয় করা হয়নি।

মুগীছ : সেটি কোথায়?

আমামন : গির্জা।

মুগীছ : আমরা তো গির্জা-উপাসনালয়ে হামলা করি না।

আমামন : কিন্তু সেখানে যে শত্রুরা লুকিয়ে নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মুগীছ : কারা?

আমামন : দুর্গের অধিপতি চারশ সৈন্য নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।

মুগীছ : আমরা মনে করেছিলাম যে তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে।

আমামন : না, তারা গির্জায় থেকে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে।

মুগীছ : গির্জাটি কোথায়?

আমামন : চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মুগীছ পাঁচশত মুজাহিদসহ গির্জার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কয়েকটি গলিপথ পেরিয়ে তারা একটি বিরাট গির্জার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। গির্জার দেয়ালাগুলো ছিল উঁচু উঁচু। মুগীছ গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে খ্রিষ্টানদের উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, এটি একটি ইবাদতখানা। এতে লুকানো তোমাদের উচিত হয়নি। তোমরা যেহেতু এতে আশ্রয় গ্রহণ করেছ, আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কাছে সমর্পণ করে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পার। কেউ তোমাদের বাধা দেবে না।

দুর্গের সেনাপতি প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে জবাব দিল, আমাদের একজন সৈন্য জীবিত থাকতে আমরা এখান থেকে নড়ব না। মুগীছ তাতে রাগন্বিত হলেন এবং

হামলা চালানো নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদরা সামনে অগ্রসর হলে খ্রিষ্টানরা তাদের উপর তীর বর্ষণ করতে শুরু করে। তাতে বহু মুজাহিদ আহত হয়।

এ অবস্থা দেখে মুগীছের মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হলো। তিনি এক হাতে পতাকা ও আরেক হাতে ঢাল নিয়ে গির্জার ফটকের দিকে এগুতে লাগলেন। অন্য মুজাহিদরাও অত্যন্ত বীরদর্পে তাঁকে অনুসরণ করলেন। তারা ঢাল আড়াল করে সামনে এগুচ্ছিলেন। খ্রিষ্টানরা প্রবলভাবে তীব বর্ষণ করতে লাগলো। তাতে মুজাহিদরা আহত হলো; কিন্তু পিছপা হলো না। তাঁরা গির্জাটির ফটকের কাছাকাছি এসে গেলেন। মুগীছ বর্শা দিয়ে ফটকে আঘাত হানলেন; কিন্তু এটি খুবই মজবুত হওয়ায় কিছু হলো না। পরিশেষে ৫০-৬০ জন মুজাহিদ একসঙ্গে দরজায় চাপ দিলে ফটকটি ভেঙ্গে গেল। মুজাহিদরা তলোয়ার উঁচিয়ে গির্জার ভেতরে ঢুকে গেলেন। মুসলমানদের ভেতরে ঢুকতে দেখে খ্রিষ্টানরা প্রাচীরের উপর থেকে নেমে এলো। তারা ঘোড়ায় চড়ে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের জন্য গির্জার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে গেল। মুজাহিদরা তাদের দেখামাত্রই অত্যন্ত প্রবল বেগে হামলা চালালেন।

খ্রিষ্টানরাও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মুসলমানদের হামলা প্রতিরোধ করলেন এবং পাল্টা আক্রমণ চালালেন। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। মুজাহিদরা যতই আহত হতেন, ততই ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতেন। তাঁরা খ্রিষ্টানদের একটি সারি সম্পূর্ণ শেষ করে দ্বিতীয় সারির উপর হামলা চালালোন। খ্রিষ্টানরাও মরণপণ যুদ্ধ করতে লগালো। কোনো মুজাহিদকেই তারা হত্যা করতে পারলো না; কিন্তু মুজাহিদরা একাধারে খ্রিষ্টানদের হত্যা করে যাচ্ছিলেন। মুগীছ এতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁর প্রত্যেক আক্রমণেই কোনো না কোনো খ্রিষ্টান নিহত হচ্ছিল। এইভাবে তিনি অনেক খ্রিষ্টান সৈন্য হত্যা করলেন। এক সময় দুর্গের অধিপতির কাছে এসে পৌছলেন। সে তাঁকে বলল, মুসলিম নেতা! মৃত্যু তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। মুগীছ তার কথা বুঝতে পারলেন না। তিনি প্রশ্ন করেন তুমি কি আশ্রয় চাচ্ছ?

দুর্গাধিপতি বলল, তুমি দুর্গ ছেড়ে যাবার অঙ্গীকার করলে তোমাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

মুগীছ : তাহলে কি তুমি যুদ্ধ করতে চাচ্ছ?

উভয়েই নিজ নিজ ভাষায় কথা বলছিলেন; কিন্তু কেউই কারো কথা বুঝতে পারছিলেন না। অবশেষে সেনাপতি আক্রমণ চালালো। মুগীছ সে আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ চালান। তাঁর তলোয়ার সেনাপতির ঢাল ভেঙ্গে

শিরে দিয়ে আঘাত হানলো। সেনাপতি এক বিকট চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মুগীছ চারপাশে তাকিয়ে দেখেন, মুজাহিদরা সকলকেই মেরে সাফ করে ফেলেছে। একজন খ্রিষ্টানও আর বেঁচে নেই।

মুগীছ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ভেতরে আরো কোনো শত্রু লুকিয়ে রয়েছে কিনা, তা দেখার জন্য ভেতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে কোনো সৈন্য খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি সকল মুজাহিদকে নিয়ে বেরিয়ে দুর্গের তাঁবুতে ফিরে এলেন। এভাবে কর্ডোভার অজেয় দুর্গটি মুজাহিদরা অধিকার করে নিলেন।

চৌদ্দ. অদ্ভুত কৌশল

ইসমাঈল এবং বিলকিস দুজনেই পাহাড় থেকে নামতে পেরে খুবই আনন্দিত হলেন। ইসমাঈল মাগরিবের নামায শেষ করে বিলকিসকে বললেন, আমরা পাহাড় থেকে কোন দিকে নেমে এলাম বলতে পারো?

বিলকিস : আমি বলতে পারব না।

ইসমাঈল : তুমি কি এই এলাকার সঙ্গে পরিচিতি নও?

বিলকিস : মোটেও না।

ইসমাঈল : আমাদের হয়তো এখানেই রাতটা কাটাতে হবে।

বিলকিস : নাহয় রাতে আমরা যাব কোথায়?

ইসমাঈল : কিন্তু এখানে খাবারের কী ব্যবস্থা হবে?

বিলকিস (স্মিত হেসে) : খুবই ক্ষুধা পেয়েছে বুঝি?

ইসমাঈল : আমি তো আরব। আমরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারি।

বিলকিস : তবে খাবারের কথা চিন্তা করছেন কেন?

ইসমাঈল : তোমার জন্য।

বিলকিস (হেসে) : আমার জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না।

ইসমাঈল : তুমি কতই না সুন্দরী! তুমি হাসলে তোমার চেহারা অপরূপ সৌন্দর্যে ভরে উঠে।

বিলকিস (মৃদু হেসে) : বড্ড বাড়িয়ে বলতে পারেন আপনি।

ইসমাঈল : বাড়িয়ে বললাম কোথায়?

বিলকিস : ক্ষুধার কথা বলতে গিয়ে অন্য আলোচনায় চলে গেলেন কেন?

ইসমাঈল : আল্লাহর কসম, আমি চাই সারা দুনিয়ার শান্তি তোমার জন্য নিয়ে আসি; কিন্তু কেন এমনটি হয়, তা আমি বলতে পারব না।

বিলকিস দেখল, ইসমাঈল তার দিকে অত্যন্ত মায়াবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সে লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে বিলকিস?

বিলকিস আনত দৃষ্টিতে বললেন, যেখানে আপনি নিয়ে যাবেন।

ইসমাঈল (বিস্ময়ের সুরে) : আমি যেখানেই নিয়ে যাব, সেখানেই যাবে?

বিলকিস (লাজুক ভঙ্গিতে মুখে খানিকটা হাসি ফুটিয়ে) : হ্যাঁ, সেখানেই যাব।

ইসমাঈল : আমি তো এই বেহেশতী পাহাড়েই তোমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম।

বিলকিস : তা হলে নেমে এলেন যে?

ইসমাঈল : কেবল এজন্যই যে, আমি এসেছি জিহাদ করতে। জিহাদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নিতে পারি না।

বিলকিস : আপনি কি তাহলে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবেন?

ইসমাঈল : হ্যাঁ।

বিলকিস : আর আমি?

ইসমাঈল : তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে মুসলিম বাহিনীতে যেতে পারবে।

বিলকিস : কিন্তু আমি চাই, আপনি আর যুদ্ধে না যান।

ইসমাঈল : তা কেমন করে সম্ভব!

বিলকিস : কেন সম্ভব নয়?

ইসমাঈল : তাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন।

বিলকিস : তাহলে আমি নিষেধ করবো না।

ইসমাঈল : রাত তো অনেক হয়ে যাচ্ছে। তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা উচিত।

বিলকিস (মৃদু হেসে) : শুধু আমারই জন্য না কি আপনার জন্যও।

ইসমাঈল : আমার জন্য তো কিছুরই প্রয়োজন নেই। আমি প্রস্তরময় ভূমিতেও নিশ্চিন্তে শুতে পারি।

বিলকিস : আর আমি?

ইসমাঈল : তোমরা তো এতোই নাজুক যে, ফুলের বিছানায় শুয়েও তোমাদের ঘুমুতে কষ্ট হয়।

বিলকিস : আচ্ছা, আমিও পাথরের উপরই শুতে পারব। তাহলে আমারও অভ্যাস হয়ে যাবে।

ইসমাঈল : তোমার জন্য কিছু করতে না পারলে আমি মনে শান্তি পাব না।

বিলকিস : বটে, আপনার ইচ্ছা কি?

ইসমাঈল : আমার ইচ্ছা তোমার খেদমত করা।

বিলকিস : মাফ করবেন, আমার খেদমতের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই আপনার খেদমত করার প্রত্যাশী।

এই কথা বলে বিলকিস লজ্জা পেয়ে গেল। ইসমাঈল আদরের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার খেদমত? আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। এটি স্বপ্ন না বাস্তব?

বিলকিস : স্বপ্ন নয়; বাস্তব।

ইসমাঈল : তাহলে আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান।

তারা নিকটস্থ একটি স্থানের ছোট ছোট নরম ঘাসের উপর রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানে চলে এলেন। ইসমাঈল ইশার নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম থেকে উঠে ওযু করে ফজরের নামায পড়তে শুরু করলেন। পবিত্র কুরআন থেকে কিরাত আরম্ভ করলেন। বিলকিসও ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল। সে ইসমাঈলের কুরআন পাঠ শুনতে থাকল। ইসমাঈল সুললিত কণ্ঠে পাঠ করছেন,

> وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَ
> كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝١٦٤ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ
> لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝١٦٥
>
> 'অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি আবার অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা তোমাকে বলিনি এবং মূসার সঙ্গে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন। সুসংবাদবাহী সাবধানকারী রাসূল আমি প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। বস্তুত আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (৪ : ১৬৪-১৬৫)

বিলকিস অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তার কুরআন পাঠ শুনছিল। ইসমাঈলের নামায শেস হলে বিলকিস তার কাছে এসে বলল, আপনারা কি মূসাকেও নবী বলে স্বীকার করেন?

ইসমাঈল : নিশ্চয়ই।

বিলকিস : তা হলে আপনারা ইহুদি হয়ে যান না কেন?

ইসমাঈল : কারণ, হযরত মূসা (আ.) যে তাওরাত নিয়ে এসেছিলেন, বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতরা তাতে অনেক রদবদল করে ফেলেছে। এই জন্য তাঁর পরে আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)-কে ইনজিল দিয়ে পাঠিয়েছেন; কিন্তু মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের মতো খ্রিষ্টানরাও ইনজিলে অনেক রদবদল সাধন করেছে। এই জন্য আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বশেষ নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আজ অবধি তাঁর শরীয়তই জারি রয়েছে।

বিলকিস : আজকে আপনি নামাযে যে অংশটুকু পাঠ করেছেন, তা আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

ইসমাঈল : তা হলো আল্লাহর বাণী। একে কুরআন বলা হয়। তুমি যদি মুসলমান হয়ে যেতে?

বিলকিস : আমাকে একটু ভাবতে দিন।

ইসমাঈল : নিশ্চয়ই ভাববে। ধর্ম এমন জিনিস নয় যে, জোরজবরদস্তি করে পরিবর্তন করা যায়।

বিলকিস : আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন এখান থেকে যেতে পারি।

ইসমাঈল : আমিও তাই ভাবছি; কিন্তু কোন দিকে যাব, তা এখানো ঠিক করতে পারছি না। আমি তো এই অঞ্চরের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে একদম অজ্ঞ।

বিলকিস : আমিও তো তাই।

ইসমাঈল : আমার ধারণা, মুসলিম বাহিনী হয়তো রাজধানী টলেডোর দিকে গিয়েছে এবং তা উত্তর দিকে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আমাদের সেদিকেই যাওয়া উচিত।

বিলকিস : কোনদিকে আমাদের যাওয়া উচিত তা হয়তো বলতে পারব না। তবে এটা অবশ্যই বলব যে, এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়া উচিত।

ইসমাঈল : তা হলে চলো।

উভয়ই উত্তর দিকে যেতে লাগলেন। সারাদিন পথ চলতেন, রাত হলে যাত্রা বিরতি করে রাত্রি যাপন করতেন। অতি প্রত্যুষেই আবার পথ চলা শুরু করতেন। পথিমধ্যে ফলদার গাছ পেলে তা থেকে ফল পেড়ে খেতেন। তারা কোথায় যাচ্ছেন, তা যদিও তাদের জানা ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি তাদের কর্ডোভার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। ক্রমাগত কয়েকদিন পথ চলার পর তারা একটি জঙ্গলে এসে পৌছলেন। সেখানে প্রচুর গাছপালা। তারা সেখানে রাত্রিযাপন করলেন। ভোরে আবার পথ চলার ইচ্ছে করলে বিলকিস বলল, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার পক্ষে আর এক মাইল পথ চলাও সম্ভব না।

উভয়েই হেঁটে যাচ্ছিলেন; কিন্তু দীর্ঘ পথ চলার ফলে বিলকিসই বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ইসমাঈল বললেন, আমি তো তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি কিন্তু কি করব, অঞ্চলটি তো এতোই জনশূন্য যে, এখান থেকে বাহন যোগাড় করাও সম্ভব নয়। আমি তোমাকে কোলে নিতে চাইলেও তো তুমি তা পছন্দ করবে করবে না।

বিলকিস : হ্যাঁ, আমি তা পছন্দ করি না।

ইসমাঈল : চলো, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাই, তারপর দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা।

বিলকিস : চলুন, আমিও চেষ্টা করি। দেখা যাক কতদূর যেতে পারি।

এই বলে তারা যাত্রা শুরু করেন। বহুদূর পর্যন্ত সারি সারি গাছ। তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলেন, একজন খ্রিষ্টান একটি ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। ইসমাঈল বিলকিসকে সেখানেই চুপ থাকতে বলে তিনি নিজে দ্রুত আরোহীর দিকে ছুটে গেলেন। ঘোড়াটিও ছিল সাধারণ গতিসম্পন্ন। তিনি ঘোড়াটির লেজ চেপে ধরলেন, ফলে ঘোড়াটি থেমে গেল। কিন্তু ঘোড়াটি কেন দাঁড়িয়ে পড়ল আরোহী তা টের পেলো না। সে ঘোড়ার পিঠে জোরে চাবুক মারল, কিন্তু ঘোড়া দাঁড়িয়েই রইল। একটও এগুতে পারল না।

হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে যখন পেলো, এক মুসলিম ঘোড়ার লেজ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে কোনোমতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়িমরি করে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এ দৃশ্য দেখে ইসমাঈলের হাসি পেল। তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে তা বিলকিসের কাছে নিয়ে এলেন। বিলকিস মুখ চেপে হাসছিল; কিন্তু কিছুতেই হাসি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। এবার সে সশব্দে হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। চোখ থেকে বিদ্যুৎ ঝরছিল।

ইসমাঈল বললেন, আজকে তোমার এতো হাসি পাচ্ছে যে?

বিলকিস হাসি থামিয়ে বলল, আল্লাহই জানেন, আরোহী খ্রিষ্টান আপনাকে কি মনে করেছে। আপনাকে দেখামাত্রই সে ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে পালাল।

ইসমাঈল : মুসলমানদের বিজয় খ্রিষ্টানদের মনে গভীর ভয়ের সৃষ্টি করেছে। এজন্য সে আমাকে দেখামাত্রই অত্যন্ত ভয়ে পালিয়ে গেছে।

বিলকিস : আপনিও তো কম করেননি। ঘোড়ার লেজ ধরে একদম থামিয়ে দিয়েছেন।

ইসমাঈল : তা না করে সামনে গিয়ে ধরার চেষ্টা করলে হয়তো ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়ে যেতো, অথবা আমার উপর হামলা চালাত।

বিলকিস : হ্যাঁ, আপনি যথার্থ কৌশলই অবলম্বন করেছেন।

ইসমাঈল : সাহসিকতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এখন এসে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসো দেখি।

বিলকিস : আর আপনি!

ইসমাঈল : আমি তোমার পেছনে পেছনে যাবো।

বিলকিস : কিন্তু আমি ঘোড়ায় চড়ব আর আপনি হেঁটে যাবেন, তা কি ঠিক হবে?

ইসমাঈল : আমি পুরুষ, আমি হেঁটে যেতে পারব, আমার জন্য কোনো চিন্তা নেই।

বিলকিস : আমরা উভয়েই কি চড়তে পারি না?

ইসমাঈল : হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে। আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ব, তখন নিশ্চয়ই উঠব।

বিলকিস : আচ্ছা, তাহলে আমাকে চড়িয়ে দিন।

ইসমাঈল বিলকিসকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলেন এবং ধীরে ধীরে ঘোড়ার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলেন।

পনের. ফরমান

তারিক টলেডোর দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, একই সময়ে মুসলমানরা সমগ্র স্পেনে ছড়িয়ে পড়বে। তাতে খ্রিষ্টানদের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে আরো ভয়ের সৃষ্টি হবে। তাঁর সেই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হলো। একদিকে যায়দ অভিযান শুরু করেন, অপরদিকে মুগীছ আর-রূমী বিজয় যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। তৃতীয় দিকে অভিযান পরিচালনা করেন তারিক নিজে। যে অঞ্চল দিয়ে তিনি গমন করছেন, সে অঞ্চলই প্রায় জনশূন্য দেখতে পাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করে জানা যায়, মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকাবাসী তাদের ধনসম্পদ ও আত্মীয় স্বজন নিয়ে পালিয়ে গেছে। মুসলিম বাহিনী টলোডোর পাহাড়ের কাছে পৌঁছে তাঁবু ফেললেন। সেখানে তারা জোহরের নামায আদায় করেন এবং খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হলেন। খাবার গ্রহণ শেষ হলে তারা দেখতে পান যে, আলোরের দিক থেকে একটি সৈন্যদল এগিয়ে আসছে।

মুসলমানরা তাদের দেখে সতর্ক হয়ে পড়েন। তারা ধারাণা করেন, খ্রিষ্টান সৈন্যদল হয়তো টলেডোর অধিবাসীদের সাহাযার্থে এগিয়ে আসছে। তাদের জানা ছিল, সম্রাট রডারিকের সেনাপতি থিওডমির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা এ-ও জানতেন, দেশে থিওডমিরের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে।

মুসলমানরা মনে করলেন যে, থিওডমির হয়তো এই সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে আসছে। তারিক সকলকে অস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই দলটিও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। দলটি কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরোহীদের দেখা যাচ্ছে। মুসলমানরা দেখতে পেলেন, আগন্তুক দলের আরোহীরাও মুসলমান। ইসলামি পতাকা উড়িয়ে তাঁরা এগিয়ে আসছেন। মুসলমানরা তাদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। আগন্তুক মুজাহিদরাও তাকবীর ধ্বনি দিলেন। দলটি খুবই কাছে এসে পড়লে তারিক চিনতে পারলেন, সে দলের অধিনায়ক যায়দ। যিনি মুজাহিদদের আগে আগে পতাকা বহন করে এগিয়ে আসছেন।

যায়দ মালাগা জয় করে ইস্তিজার উপর হামলা চালিয়েছিলেন। তা-ও অধিকার হলে তিনি আলোর আক্রমণ করেন। কিন্তু আলোরের অধিবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়। চুক্তিপত্র সম্পদনের পর যায়দ টলেডোর দিকে যাত্রা করেন। কারণ তারিক তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যেন সেসব অঞ্চল জয় করে টলোডোয় চলে আসেন। তাহলে উভয়ে মিলে রাজধানী আক্রমণ করবেন।

সুতরাং যায়দ সেসব অঞ্চল জয় করে প্রধান সেনাপতির কথামতো টলোডো চলে আসনে। তারিক ও তাঁর সৈন্যদল সেই বিজয়ী বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানালেন। এক সেনাপতি অপরজনকে জড়িয়ে ধরলেন। এক অফিসার অন্য অফিসারকে, এক সিপাহি অন্য সিপাহিকে অভিবাদন জানালেন। সকলে মিলে একাকার হয়ে গেলেন। আসরের সময় হওয়ায় তারা প্রথমেই আসরের নামায আদায় করলেন। এরপর তারিক যায়দকে নিয়ে নিজ তাঁবুতে চলে গেলেন। তাঁর কাছে যুদ্ধের সব ঘটনা জিজ্ঞেস করলেন। যায়দ তারিকের কাছে মালাগা, ইস্তিজা ও আলোরের সব ঘটনা বর্ণনা করেন।

সবকিছু শুনে তারিক অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সব বিজয়ের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। ইতোমধ্যে অন্যান্য অনেক অফিসারও সেখানে এসে জড়ো হলেন। এমনি মুহূর্তে একজন অশ্বারোহী এসে তারিককে সালাম জানালেন। তারিক সালামের জবাব দিয়ে তাকে বসতে বললেন। আগন্তুক বসে পড়লে তারিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোত্থেকে এসছে?

আগন্তুক বললেন, আমি দূত। কায়রো থেকে এসেছি।

তারিক : কায়রোর সংবাদ ভালো?

দূত : আল্লাহর রহমতে সবই ভালো। কায়রোর সকল মসজিদে আপনাদের বিজয়ের জন্য দোয়া করা হচ্ছে।

তারিক : মূসা ইবনে নুসায়র ভালো আছেন?

দূত : জী হ্যাঁ, তিনি ভালো আছেন। আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং এই ফরমান পাঠিয়েছেন।

দূত পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে তারিকের হাতে দিলেন। তারিক চিঠিটি হাতে নিয়ে চুম্বন করে পড়তে শুরু করলেন।

প্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের শাসক আল্লাহর বান্দা মূসা ইবনে নুসায়রের পক্ষ থেকে স্পেনে পাঠানো বাহিনীর সেনাপতি তারিক ইবনে যিয়াদের প্রতি।

হামদ ও সালাতের পর সমাচার এই যে, তোমার বিজিত গনিমতের এক পঞ্চমাংশ ইতোমধ্যে এসে পৌছেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, তুমি অসীম

সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ। আল্লাহ তোমাকে সমগ্র স্পেন জয় করার শক্তি দান করুন। আমীন। তবে এই প্রথমবারের মতো পরাজিত হয়ে খ্রিষ্টানরা হয়তো প্রতিশোধ স্পৃহায় অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা হয়তো তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চারিদিক থেকে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে। তোমার অধীনে বর্তমানে যে পরিমাণ সৈন্য রয়েছে, তা দ্বারা খ্রিষ্টনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই পরবর্তী অভিযান মূলতবি করে আপনি যেখানে আছেন, সেখানেই অপেক্ষা করো। আপনার সাহায্যার্থে আঠার হাজার সৈন্য নিয়ে আমি নিজেই এগিয়ে আসছি। সকলকে নিয়ে এক সাথে আমরা সামনে অগ্রসর হবো। মুজাহিদদের কাছে আমার ও সকল মুসলমানের সালাম রইল।[১০]

ইতি
মূসা ইবনে নুসায়র
কায়রো

চিঠি পড়ে তারিক দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি থাকতেই কি মূসা রওয়ানা দিয়েছেন? দূত বলল, না। আমি তাঁকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় দেখে এসেছি।

তারিক চিঠিটি যায়দের হাতে দিলেন। তিনি চিঠিখানা পড়ে বললেন, মূসা মুসলমানদের ভালোবাসেন বলেই তাদের কোনেরকম বিপদের কথা চিন্তা করে তিনি হয়তো তা লিখেছেন।

তারিক : কিন্তু আমাকে তো তাঁর নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে।

যায়দ : খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আপনার যদি কোনোরূপ আশঙ্কা থাকে তবে তো অবশ্যই পালন করবেন।

তারিক : আমার মতে অনুরূপ কোনো ভয়ের কারণ নেই।

---

১০. একজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক লিখেছেন, তারিকের এই অবিশ্বাস্য বিজয়ে মূসার মনে হিংসার উদয় হয়েছিল। তাই তিনি তারিককে আর সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই বর্ণনা ঠিক নয়। মূসার ধারণা ছিল, অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ক্ষিপ্ত খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে তারিক হয়তো অবিচল থাকতে পারবেন না। তাতে হয়তো মুসলমানদের জান-মালের ক্ষতি হবে। এজন্য মূসা তারিককে সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিলেন। এটা ছিল মুসলমানদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার প্রতীক, হিংসাপ্রসূত নয়। –লেখক

একজন অফিসার বললেন, এখন মুসলমানদের সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের মনে ভীষণ ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের সম্পর্কে এখন তারা খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত। এমতাবস্থায় মুসলমানরা যদি তাদের অভিযান বন্ধ করে দেয়, তা হলে খ্রিষ্টানরা হয়তো নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করবে।

অপর একজন অফিসার বললেন, এটাই ঠিক। মূসা এখান থেকে অনেক দূরে। এখন অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দিলে মুসলমানদের যে কী ক্ষতি হবে তা হয়তো তিনি জানেন না।

যায়দ বললেন, আমার মতে আমাদের অগ্রযাত্রা বন্ধ করা হয়তো ঠিক হবে না। আল্লাহর রহমতে আমরা জয়লাভ করব।

তারিক : কিন্তু তাতে যে কর্তৃপক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করা হয়।

প্রথমোক্ত অফিসার : আমরা তো কারো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এমনটা করছি না; বরং ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থেই করতে যাচ্ছি। আমার মনে হয় না, তাতে কোনো দোষ হবে।

যায়দ : মূসা তাঁর চিঠিতেই এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে তার আশঙ্কা হচ্ছে, খ্রিষ্টানরা চারিদিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে পারে। বস্তুতপক্ষে এখানে এরূপ কোনো আশংকাই নেই।

দ্বিতীয় অফিসার : আমার মনে হয়, আমরা যদি এখন সামনে অগ্রসর না হই এবং মূসা এখানে এসে জানতে পারেন যে, আমরা যদি আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতাম, তাহলে আমাদের জয় সুনিশ্চিত ছিল, তবে তিনি হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন।

যায়দ : নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন; বরং এটাই ঠিক যে, অভিযান অব্যাহত রাখা হোক এবং রাজধানী অধিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

তারিক : আচ্ছা, তাহলে সেটাই হবে।

ইশার আযান হলে মুজাহিদরা সকলেই নামায পড়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। খুব সকলেই ঘুম থেকে উঠে তাঁরা ফজরের নামায পড়লেন। তারপর টলোডোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এখন টলোডো তাদের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। ওই তো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের অপরপ্রান্তেই রাজধানী টলেডো। এরইমধ্যে তারা পাহাড়ে পৌঁছে গেছে। এক রাত তারা পাহাড়ের একটি খোলা উপত্যকায় অবস্থান করলেন। সকাল হতেই পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। কয়েকটি গিরিপথ ও উপত্যকা পেরিয়ে তারা টেগাস নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নদীর

অপর তীরেই টলেডো শহর। শহরের কারুকার্যময় ইমারত ও উঁচু প্রাচীরগুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে।

শহরটি সুন্দর ও সুদৃঢ় উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। পাহাড় কেটে শহরের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল এবং টেগাস নদীটি টলোডোর চারিদিক বেষ্টন করে বয়ে চলছে। ফলে একটি শহরের চতুর্দিকে প্রাকৃতিক পরিখার সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের দেখতে পেলো। তারা প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকল। তারিক সেদিন তাঁর সৈন্যদলকে নদীর তীরেই অবস্থান করতে নির্দেশ দিলেন। ফলে সৈন্যরা নদীর তীরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তাঁবু ফেললো।

ষোল. টলেডো বিজয়

আগেই বলা হয়েছে, টলেডো শহরের অবস্থান পাহাড়ের পাদদেশে। এর প্রাচীর প্রস্তুর নির্মিত। টেগাস নদী শহরটিকে বেষ্টন করে অধিকতর নিরাপদ ও সুরক্ষিত করে রেখেছে। শহরবাসীরা তাদের দুর্গতুল্য শহরটির ব্যাপারে এতোই নিশ্চিত ছিল যে, এখানে মুসলনামরা আসতে পারে তা কখনো কল্পনাও করেনি। তাই তারা নিশ্চিন্তে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তারিক সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে সেখানে দূত পাঠালেন। তারা অবজ্ঞাভরে দূতকে ফিরিয়ে দেয়। অবশেসে তারিক বাধ্য হয়ে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন। নদীর ওপর এক বিরাট সেতু। কিন্তু সেতুটির উভয় পার্শ্বেই সামরিক চেকপোষ্ট বসানো এবং সেখানে বহু সৈন্যের অবস্থান। ফলে মুসলমানদের পক্ষে সেতু অতিক্রম কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। নদী পার হওয়ার বিকল্প কোনো পথও নেই। কারণ স্পেনের প্রায় সব নদীই খুব নিচে দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাছাড়া এগুলোর উৎস হচ্ছে পাহাড়। ফলে নদীর পাড় ছিল খুবই উঁচু। তার ওপর এগুলো বেশ প্রশস্ত। গভীরতাও যথেষ্ট। তাই সেতু ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে নদীটি অতিক্রম করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তারিক প্রতিদিন নদীর তীরে গিয়ে কোনো উপায় বের করার চেষ্টা করতেন; কিন্তু সেতু ছাড়া কোনো বিকল্প পন্থা আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। অপরদিকে খ্রিষ্টান সৈন্যরা প্রতিদিন প্রাচীরের উপর উঠে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করত এবং সদাসতর্ক থাকত। পরিশেষে তারিক সেতু আক্রমণ করবেন বলে ঠিক করলেন। একদিন ভোরে ফজরের নামায পড়ে দুজাহার অশ্বারোহী নিয়ে তিনি সেতুর দিকে অগ্রসর হলেন। খ্রিষ্টান চৌকির সৈন্যরাও মুসলমানদের দেখে বুঝতে পারে, তারা সেতু আক্রমণ করবে। তারাও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে। সেতুর উভয় তীরে ছিল শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি। ঘাঁটি দুটি ছিল যথেষ্ট উঁচু ও সুদৃঢ়। পাহাড় কেটে ঘাঁটি দুটির দেয়াল নির্মিত হয়েছিল। উভয় ঘাঁটির চৌকি দুটো ছিল বুরুজের মতো গোলাকার। প্রত্যেক চৌকিতে দুহাজার করে সৈন্য মজুদ ছিল। প্রয়োজনবোধে কখনো কখনো সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো হতো। মুসলমানদের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে আরো এক হাজার করে সৈন্য বাড়িয়ে দেয়া হলো। সেতুটির মধ্যভাগে ছিল লৌহ নির্মিত একটি সুদৃঢ় তোরণ। তোরণটি বন্ধ করে দেয়া হলে কারো পক্ষে সেতু পার হওয়া সম্ভব হতো না। মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে তোরণটি বন্ধ করে দেয়া হলো। চৌকির প্রহরীরা দেয়ালের উপর আরোহণ করল। তারিক বুঝতে পারলেন, তাঁরা অগ্রসর হলেই প্রহরীরা

তাদের উপর তীর বর্ষণ করবে। তিনি আরো বুঝতে পারেন, এমতাবস্থায় যদি অশ্বারোহীদের নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহলে ঘোড়াগুলো আহত হয়ে যেতে পারে এবং আরোহীরাও তীরবিদ্ধ হয়ে নিচে পড়ে যেতে পারে। এজন্য তিনি পদাতিক সৈন্যদের অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। দুহাজার মুজাহিদের মধ্যে এক হাজারের নেতৃত্ব দিলেন যায়দের উপর। আর এক হাজারের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তারিক নিজে। দুহাজার সৈন্য একই সঙ্গে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে সেতুর দিকে অগ্রসর হরে চৌকির দেয়ার উপর আরোহী প্রহরীদের মধ্যে এতো হইচই শুরু হয় যে, সারা চৌকিজুড়ে তা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আগ্রহী শহরবাসীরা যুদ্ধের তামাশা দেখার জন্য দেয়ালের উপর আরোহণ করে।

এদিকে চৌকির সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকল। মুসলিম মুজাহিদরা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। তাঁরা উঁচু টিলাগুলো পেরিয়ে ধীরে ধীরে নিচু টিলায় আরোহণ করতে শুরু করেন। কিন্তু চৌকির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছতেই সৈন্যরা তাদের দিকে বৃষ্টির মতো তীর ছুড়তে আরম্ভ করে।

খ্রিষ্টান সৈন্যরা এতো বেশি তীর নিক্ষেপ করে যে, অনেক মুসলিম মুজাহিদ তাতে আহত হয়; কিন্তু তাতেও তারা পিছপা না হয়ে এগুতে থাকল। তাঁরা আহত হয়েছে বলে খ্রিষ্টান সৈন্যরা যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে। খ্রিষ্টানরা তাঁদের এ বেপরোয়া ভাব দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল।

প্রথমে খ্রিষ্টানরা মনে করেছিল যে, প্রবল তীব ছোঁড়ার মুখে মুসলমানরা এক পা-ও এগুতে পারবে না; তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে; কিন্তু মুসলমানদের রীতিমতো এগিয়ে আসতে দেখে তারা বুঝতে বাধ্য হলো যে, তাদের তীর কোনো কাজে আসছে না। তাতে তারা আরো ভীত হয়ে পড়ল। ইতোপূর্বে খ্রিষ্টানরা শুনেছিল, মুসলমানরা এক বিস্ময়কর জীব। আগুন বা পানি তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। অস্ত্রকে তারা কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। এখন তারা স্বচক্ষে দেখতে পেলো, তারা তীর নিক্ষেপ করছে। আর মুসলমানরা তা এড়িয়ে যথারীতি সামনে অগ্রসর হচেছ। তাতে খ্রিষ্টানদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাল, মুসলমানরা হয়তো চৌকি দখল করে ফেলবে এবং তাদের হত্যা করবে। সুতরাং তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে চৌকির সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলল, মুসলমানদের উপর তীর কোনো কাজ করছে না। তারা যেভাবে এগিয়ে আসছে, হয়তো আমাদের ধরেই ফেলবে।

টলেডোরে গভর্নরও প্রাচীরের ওপর দাঁড়ানো ছিল। সে সৈন্যদের লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলতে লাগল, তোমরা সাহস না হারিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাও। কিন্তু

সৈন্যরা এতোই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, তারা শুরুতে যেভাবে তীর নিক্ষেপ করছিল, এখন আর সেভাবে পারছিল না। মুসলমানরা তা বুঝতে পারলেন। ফলে তাঁরা আরেকটু দ্রুত গতিতে এগুলো লাগলেন। তারিক ছিলেন সর্বাগ্রে, মুজাহিদরা তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। যারা তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন, তারা গা থেকে তীর খুলে ছুঁড়ে মারছিলেন এবং আরো প্রবল বেগে সামনে এগুচ্ছিলেন। এক সময় তারা সেতুর ফটকের কাছে গিয়ে পৌঁছে তা ভাঙ্গতে শুরু করে দিলেন। এ সময় চৌকির সৈন্যরা প্রাণ ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিল। তারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে অন্য সৈন্যদের তাদের সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকে। কিছুসংখ্যক মুজাহিদ ফটক ভাঙ্গতে থাকে আবার কেউ কেউ প্রাচীরের উপর উঠতে থাকে।

কিন্তু চৌকির সৈন্যরা তাদের দেখতে পেলো না। তারা মুসলমানদের ওপর তীর নিক্ষেপও বন্ধ করে দেয়। তারা কেবল ভয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। মুসলিম মুজাহিদদের জন্য এটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে নিয়ে কাজে লাগালো। ইতোমধ্যে কিছু মুজাহিদ চৌকিতে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়েই তাঁরা খ্রিষ্টানদের উপর তলোয়ার চালাতে থাকল।

প্রাচীরের পাশ থেকে খ্রিষ্টানরা পালিয়ে গেলে একের পর এক মুজাহিদ চৌকিতে প্রবেশ করতে লাগলেন। সেখানে গিয়েই তাঁরা তলোয়ারের আক্রমণ শুরু দিলেন। খ্রিষ্টানরাও যথাসম্ভব তাদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে তারা নব উদ্যমে আক্রমণের চেষ্টা করলেও সুযোগ হয় না। কিন্তু মুসলমানরা ক্ষিপ্রভাবে তাদের কচুকাটার করে চললেন।

দুর্গের ভেতরের খ্রিষ্টানরা তাদের এ অবস্থা দেখতে পেয়ে সাহায্যলাভের আশায় দুর্গের ফটক খুলে সেতুর দিকে দৌড়াতে লাগল। এদিকে মালাগা ও অন্যান্য অঞ্চলে বিজয়ে যায়দের বিশিষ্ট সঙ্গী মুজাহিদ তাহির একটি উঁচু টিলায় বসে মুসলমানদের অবস্থা অবলোকন করছিলেন। তিনি মুসলমানদের ফটকের কাছে পৌঁছে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি অন্য মুজাহিদদের কাছে ফিরে আসেন এবং সবাইকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে সেদিকে রওনা দিলেন। তখন যেহেতু কোনো তীর নিক্ষেপের ভয় ছিল না, তাই সকলেই ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলেন।

প্রায় তিনশত মুজাহিদ চৌকিতে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা খ্রিষ্টানদের খতম করে অপর পাশে গিয়ে পৌঁছল। তারিকও তাঁর অধীনস্থ মুজাহিদদের নিয়ে সেতুর ফটকটি ভাঙ্গছিলেন। অবশেষে তারা ফটকটি ভাঙ্গতে সক্ষম হলেন।

যে সময় ফটকটি ভাঙ্গা হলো, ঠিক তখনই তাহির অশ্বারোহীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তারিকের ঘোড়াটিও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ

ঘোড়ায় চড়ে পদাতিক সৈন্যদের সেখানে রেখে অশ্বারোহীদের নিয়ে সামনে আগে বাড়লেন। ফটক পার হয়ে অপর দিকে গিয়ে দেখতে পেলেন, খ্রিষ্টান সৈন্যরা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এসব খ্রিষ্টান সৈন্য চৌকির সৈন্যদের সাহায্যার্থে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

তারা ছিল পদাতিক। তারিক এবং মুজাহিদরা দ্রুত ঘোড়া ছোটালেন। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের চেহারা দেখামাত্র চিৎকার করে পালাতে লাগল। কিন্তু তারা পালাবে কেমন করে? পেছন থেকে মুজাহিদরা তাদের ধরে ধরে খতম করতে লাগল। এ সময় দুই স্থানে যুদ্ধ চলছে। চৌকির ভিতরে আর সেতুর ওপরে। উভয় স্থানেই খ্রিষ্টান সৈন্যরা তলোয়ারের আঘাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।

অল্প সময়ের মধ্যে সহস্রাধিক খ্রিষ্টান নিহত হলো। মুজাহিদরা তাদের মারতে মারতে দুর্গের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। খ্রিষ্টানরা এতোই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল যে, দুর্গের ফটক বন্ধ করার খেয়ালই করেনি। খোলা ফটক দিয়ে মুজাহিদরা দুর্গে পৌঁছে চারিদিক থেকে খ্রিষ্টানদের ওপর হামলা চালালেন। খ্রিষ্টানদের মধ্যে কোনো প্রকার নিয়ম শৃঙ্খলা বালাই নেই। সংখ্যার দিক দিয়ে তারা মুসলমানদের ছয় সাত গুণ বেশী হলেও তারা এতোই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, সকলে নিজেদের জান বাঁচানোর ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুজাহিদরা তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করতে লাগলেন। দুর্গজুড়ে খ্রিষ্টানদের মরদেহের স্তূপ পড়ে গেল। অনেক মুজাহিদও আহত হলেও কেউই শহীদ হননি। খ্রিষ্টানরা বুঝতে পারল, আর লড়ে লাভ নেই। তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে এবং শান্তি শান্তি বলে চিৎকার করতে লাগল। তারিক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন।

অল্প সময়ের ভেতরেই সকল খ্রিষ্টান সৈন্যকে গ্রেফতার করা হলো। পাদরিদের একটি প্রতিনিধিদল তারিকের সঙ্গে সাক্ষাত করে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল। তারিক বলেন, দুর্গটি অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত সন্ধির দরজা খোলা ছিল; কিন্তু আমরা যখন যুদ্ধ করে তা জয় করেছি, তখন সন্ধির প্রস্তাব বাতুলতা মাত্র। একজন পাদরি বলল, সন্ধি না করতে চাইলে না করুন, তবে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ তো করবেন। তারিক বললেন, তোমরা এমন জাতি, যারা কারো প্রতি দয়া করতে জান না; কিন্তু আমরা মুসলমান। মুসলমানরা সবসময়ই দয়া করে। আমরাও দয়া করব।

পাদরি : তাহলে সেটা হবে আপনার অনুগ্রহ ও মহানুভবতা।

তারিক : এমন কথা বলা পাপ। অনুগ্রহের মালিক তো কেবল আল্লাহ।

পাদরি : তাহলে আপনার মেহেরবানি তো নিশ্চয়ই।

তারিক : হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে এর জন্য কয়েকটি শর্ত মানতে হবে, শহরে যেসব অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তা আমাদের কাছে সোপর্দ করতে হবে; যার কাছে তা অপছন্দনীয় মনে হবে, সে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে। তবে কোনো সহায় সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। যারা এখান থাকতে চায় তারা নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে। তাদের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। উপাসনালয় যথারীতি থাকবে। ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না। এসবের জন্য তাদের কেবল এক প্রকার কর (জিযিয়া) দিতে হবে।

পাদরি : দেশে কোন আইন প্রচলিত থাকবে?

তারিক : কোনো প্রকার নতুন আইন প্রবর্তিত হবে না। পুর্বের আইনই বলবৎ থাকবে। খ্রিষ্টান ও ইহুদিরাই শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। কেবল উচ্চ আদালতের বিচারক হবেন মুসলমান।

পাদরি বিস্ময়ের সুরে বললেন, ইহুদিরাও দায়িত্ব পালন করবে? ইহুদিদের উপদ্রব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন জনাব!

তারিক : তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমরা ইহুদিদের অথবা ইহুদিরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

পাদরি : তাই হোক জনাব! আমরা আপনার সকল শর্ত মেনে নিলাম।

পাদরিরা চলে গেল। ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে লাগল। তারিক কিছু সৈন্যকে তাঁবুতে পাঠিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। রাতে তারিক শাহী মহলে গমন করলেন। সেসময় মহল সম্পূর্ণ জনশূন্য। জানা গেল, নায়লা মুসলমানদের আসার খবর পেয়ে মহল ছেড়ে মারিটা চলে গেছে। তারিক মহলটি দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। এতো বড় ও এতো সুন্দর মহল ইতোপূর্বে তিনি আর দেখেননি। একটি কক্ষ তিনি বেছে নিয়ে সেখানে অবস্থান করলেন। বাকী কক্ষগুলোতে অন্য অফিসারগণ অবস্থান করলেন। সারাদিন কর্মক্লান্ত থাকায় ইশার নামায পড়েই তিনি শুয়ে পড়েন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে চোখ খুলে তিনি এক সুন্দরী রমণীকে সামনে দাঁড়ানো দেখতে পান। রমণীটি ছিল অপরূপ সুন্দরী। রূপের ঝলকে তার মুখের দিকে তাকানো যেতো না। সে তার কমনীয় চোখে তারিকের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারিক রমণীকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। তিনি ধারণা করলেন, তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখছেন। এ ধারণা নিয়ে তিনি এক দৃষ্টিতে যুবতীটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সতের. সুন্দরী রাহীল

তারিক চোখ ভরে রমণীকে দেখছিলেন। রমণীটিও তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর রমণীটি বলল, সুহৃদ সেনাপতি, আপনি কি ঘুমিয়ে আছেন? যুবতীর শব্দ শুনে তারিক বিশ্বাস করলেন, তিনি জেগে আছেন এবং জাগ্রত অবস্থায়ই তিনি সুন্দরী যুবতীটিকে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি উঠে বসে পড়ে বললেন,

যুবতী! আমি জেগেই আছি। সামনে এসে বল তো তুমি কে?

যুবতী আকর্ষণীয় ভঙ্গে তারিকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে আফসোসের সুরে বলল, আমি এক দুর্ভাগা সম্প্রদায়ের কন্যা।

তারিক : দুর্ভাগা জাতি কোনটি?

সুন্দরী : ইহুদি।

তারিক : তোমার নাম কি?

সুন্দরী : রাহীল।

তারিক : তুমি কি টলেডোর অধিবাসী?

রাহীল : না, আমি মালাগার অধিবাসী।

তারিক : এখানে কিভাবে এসেছ?

রাহীল : পাপিষ্ঠ রডারিক জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

তারিক : তুমি কি এই মহলেই ছিলে?

রাহীল : জী হ্যাঁ।

তারিক : আমরা যখন মহল তল্লাশী করেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

রাহীল : ভূ-গর্ভস্থ কামরায় ছিলাম হুজুর।

তারিক (বিস্ময়ের সুরে) : ভূ-গর্ভস্থ কামরায় ছিলে?

রাহীল : জী হ্যাঁ।

তারিক : কেন?

রাহীল : নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য।

তারিক : রডারিকই কি তোমাকে ভূ-গর্ভস্থ কামরায় রেখেছিল?

রাহীল : জী না, রডারিক হয়তো সে সম্পর্কে জানতো না। আমি নিজেই ইজ্জত্ব রক্ষার জন্য সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। রডারিকের এ কক্ষটির খবরই ছিল না।

তারিক : আফসোস, রডারিক তোমাদের মতো নিরপরাধ যুবতীদের ওপরও জুলুম করেছে!

রাহীল : শুধু আমি কেন অসংখ্য সুন্দরী যুবতী তাঁর পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছে।

তারিক : তাহলে তো খুবই পাপিষ্ঠ ছিল সম্রাট রডারিক।

রাহীল : পাপিষ্ঠ তো নিশ্চয়ই। সে কি মারা পড়েছে?

তারিক : হ্যাঁ, প্রথম যুদ্ধেই আমরা তাকে হত্যা করেছি।

রাহীল (আকাশের দিকে তাকিয়ে) : ঈশ্বর! তোমাকে হাজার হাজার ধন্যবাদ। তুমি সেই জালিমকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে কত নিষ্পাপকেই না তার জুলুম থেকে রক্ষা করেছ।

এতক্ষণ রাহীল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বরছিল। তারিক তাকে বললেন, বসো রাহীল।

রাহীল : প্রথমে বলুন, যারা এই শহর জয় করেছে আপনি কি সে দলের সেনাপতি?

তারিক : হ্যাঁ, মানুষ আমাকে তাই মনে করে।

রাহীল : আপনার নাম কি?

তারিক : আমার নাম তারিক।

রাহীল : বিস্ময়কর নাম তো আপনার। আপনি কে?

তারিক : আমি তারিক।

রাহীল : তা তো বুঝলাম। এছাড়া আপনার পরিচয়?

তারিক : আমি একজন মানুষ।

রাহীল (আনমনা হয়ে) : মানুষ তো সবাই।

তারিক (মুচকি হেসে) : তুমিও কি মানুষ?

রাহীল : মানুষ তো বটেই।

তারিক : তুমি হয়তো মানুষ নও।

রাহীল (নিষ্পাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) : তাছাড়া আর কী হবো?

তারিক : হয়তো হুর।

রাহীল লজ্জা পেয়ে গেল। তারিক তার লাজনম্র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, আমাকে মাফ করো। মনে হয় কোনো খারাপ কথা বলে ফেলেছি।

রাহীল জাদুময়ী চোখ তুলে বলল, কই, আপনি তো বললেন না যে, আপনি কে?

তারিক : বললাম তো, আমি একজন মানুষ, নাম তারিক।

রাহীল : আমি জানতে চাচ্ছি, আপনি কোন ধর্মের লোক?

তারিক : আমি মুসলমান।

রাহীল : তাহলে কি আরবের অধিবাসী?

তারিক : না, আমার দেশ আরবের বাইরে।

রাহীল : তাহলে আপনি মুসলমান হলেন কী করে?

তারিক : আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাই আমি মুসলমান হতে পেরেছি।

রাহীল : তবে কি আরবরা জবরদস্তি করে আপনাকে মুসলমান করেছে?

তারিক : না, আমি নিজেই মুসলমান হয়েছি। মুসলমানরা কাউকে জোর করে মুসলমান বানায় না।

রাহীল : থাক, আপনি যাই হোন। আমাদের প্রতি দয়া করবেন তো?

তারিক : বলো, তোমাকে কি করতে পারি।

রাহীল : আমি কি আপনাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি?

তারিক : হ্যাঁ, তুমি নির্দ্বিধায় বলতে পার, আমি তা পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

রাহীল : তাহলে আপনি আমাকে মালাগায় পৌঁছে দিন।

তারিক : হ্যাঁ, প্রস্তুত আছি। যখন বলবে নিয়ে যাব।

রাহীল : তাহলে তো আপনি অত্যন্ত ভালো লোক দেখছি।

তারিক : আমরা মুসলমান। মুসলমানরা কখনো কারো ওপর অত্যাচার করে না; বরং অত্যাচারিতকে সাহায্য করে।

রাহীল : আমি অন্ধকার কামরায় থাকতে থাকতে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

তারিক : এখন তোমাকে অন্ধ কুঠুরিতে যেতে হবে না। এ মহলের যে কক্ষে ইচ্ছা তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর। কেউ তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে না।

রাহীল : ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি এক অত্যাচারী সম্রাটের বদলে আপানদের মতো সদয় ও চরিত্রবান লোক প্রেরণ করেছেন।

তারিক : ঘুমে তোমার চোখ বুজে আসছে? তুমি হযতো এখন পর্যন্ত ঘুমাওনি?

রাহীল : না, মোটেও চোখ বুজিনি।

তারিক : তাহলে তুমি এ বিছানায় শুয়ে পড়ো।

রাহীল : আর আপনি?

তারিক : আমি শুতে পারব।

এই বলে তারিক বিছানা ছেড়ে উঠে গেলেন। রাহীলও বিছানায় যাওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল। তারিক মেঝেতে বসে পড়লেন। ঘরে যথেষ্ট আলো ছিল। তিনি

রাহীলের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাহীল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তারিক মনে মনে ভাবলেন, তাঁর তো রাহীলের চেহারার দিকে তাকানোর কোনো অধিকার নেই। সে একাকীই শুয়ে আছে। অন্য কেউ হয়তো দেখছে না কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা তো নিশ্চয়ই দেখছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে ফেলেন এবং কিছুক্ষণ পর মেঝের ওপরই শুয়ে পড়েন।

সকালে ফজরের আযানের সময় ঘুম থেকে উঠে পড়লেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার পর ফজরের আযান হলো। তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে গেলেন। নামায শেষে পুনরায় ফিরে এলেন। রাহীল তখনো ঘুমিয়ে। তারিক এক কোণে বসে আস্তে আস্তে কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। সূর্য সম্পূর্ণরূপে উদিত হয়ে গেলে তিনি তিলাওয়াত শেষ করলেন। এ সময় রাহীল পাশ ফিরে উঠে বসল এবং তারিককে দেখতে পেলো। সে নিজেই লজ্জিত হলো এবং বিছানা থেকে উঠে এসে তারিকের কাছে বসল। তারিক বললেন ঘুম হলো?

রাহীল : হ্যাঁ, অনেক দিন পর আজ আরামে ঘুমানোর একটু সুযোগ পেলাম।

তারিক : যাও, হাত মুখ ধুয়ে সবকিছু সেরে এসো।

রাহীল চলে গেল। সে দেখতে পেলো যে, মহলে কোনো নারী কিংবা বালিকার চিহ্নও নেই। সে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে ফিরে এলো।

তারিক : তুমি কখন দেশে যেতে চাচ্ছ?

রাহীল : কেন, আপনি কি শিগগিরই আমাকে পাঠাতে চাচ্ছেন?

তারিক : আমার কখনোই তোমাকে বিদায় দেয়ার ইচ্ছা নেই; কিন্তু তোমার হুকুম তো পালন করতেই হবে।

রাহীল : আরে সুবোধ ব্যক্তি! আমার যখন ইচ্ছে হয় তখন আমি নিজেই চলে যাব।

তারিক : সেটাই ভালো।

রাহীল : এ কক্ষের নিচে একটি কক্ষ আছে। সেখানে অনেক মুকুট সংরক্ষিত আছে।

তারিক : কাদের মুকুট।

রাহীল : মৃত রাজাদের।

তারিক : চলো তো দেখি।

রাহীল : চলুন।

উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারিক অফিসার যায়দ আর তাহিরকেও ডেকে আনলেন। তারা রাহীলের সঙ্গে একটি অন্ধকার দরজা দিয়ে একটি কক্ষে ঢুকে

পড়লেন। সেখানে চব্বিশটি মুকুট সংরক্ষিত দেখতে পেলেন। তাঁরা মুকুটগুলোকে তুলে নিয়ে ওপরের কামরায় রাখলেন। মুকুটগুলো বহু মূল্যবান পাথরে খচিত এবং প্রত্যেক মুকুটে রাজাদের নাম লিখিত। এসব মুকুট ছিল গথিক রাজাদের। তারা রাজা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। সেই বংশের নিয়ম ছিল, প্রত্যেক রাজার জন্য নতুন নতুন মুকুট বানানো হতো এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেটিতে তার নাম লিখে এই নিচের কক্ষে রেখে দেয়া হতো। সে সময় পর্যন্ত গথিক রাজবংশের চব্বিশজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। অতঃপর তারিক সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন মহলের সব জিনিসপত্র একস্থানে এনে জমা করেন। কেউ কেউ রাজভাণ্ডারে প্রবেশ করল। কেউ কেউ প্রাসাদের বিভিন্ন কামরায় প্রবেশ করে মূল্যবান জিনিসপত্র বের করে নিয়ে আসে। এমন সময় পাদরিরা এসে উপস্থিত হলো। তারা অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানিয়ে দেয়, কোনো লোকই দেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না। তারা সবাই তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়েছে। জিযিয়া দিতেও তারা সম্মত আছে। তারিক যায়দকে পাদরিদের কাছ থেকে জিনিসপত্র বুঝে নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

ইতোমধ্যে কোষাগার ও মহলের সকল জিনিসপত্র চত্বরে এনে জড়ো করা হলো। তারিক সকল জিনিসপত্রের এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট চার অংশ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। রাহীল যেহেতু মুকুট সম্পর্কে সন্ধান দিয়েছিল, তাই তাকেও অংশ দেয়া হলো। তবে মুকুটগুলো খলিফার কাছে পাঠানোর জন্য পৃথক করে রাখা হলো।

কিছুক্ষণ পর যায়দও ফিরে এলেন। তিনি জানালেন যে, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র বুঝে নেয়া হয়েছে। এমন সময় একজন আরব এসে উপস্থিত হলেন। মনে হচ্ছিল, সে অনেক দূর থেকে এসেছে। সালামের পর সে তারিককে জানালো, মূসা ইবনে নুসায়র স্পেনে এসে পৌঁছেছেন। তিনি আপনাকে সামনে অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং মূসার নির্দেশে তিনি আর অগ্রসর হলেন না। অন্য সৈন্যদেরও সেখানেই অবস্থানের নির্দেশ দিলেন।

রাহীল আর মালাগায় ফিরে গেল না। মুসলমানের সঙ্গে টলেডোতেই থেকে গেল।

আঠার. বিচ্ছিন্নদের পুনর্মিলন

মুসলমানরা এখন কোথায় কী অবস্থায় আছে, খ্রিষ্টানদের সঙ্গে তাদের কোনো যুদ্ধ হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কারা জয়লাভ করেছে, এসব সম্পর্কে ইসমাঈল ও বিলকিসের কিছুই জানা ছিল না। তারা উভয়ই বিপদে পড়েছিল। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তারা সে বিপদ থেকে রেহাই পেয়েছিল।

ভাগ্যক্রমে তারা একটি ঘোড়া হস্তগত করায় তাতে বিলকিসের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়েছিল বটে, কিন্তু ইসমাঈলকে হেঁটেই যেতে হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও বিলকিসের জন্য একটি ঘোড়া যোগাড় করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন। অবশ্য বিলকিস চাচ্ছিল, ইসমাঈলও ঘোড়ায় চড়ুক; কিন্তু ইসমাঈল তাতে রাজি হচ্ছিলেন না। তাদের জানা ছিল না, তারা কোন দিকে যাচ্ছেন। তাদের নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যস্থলও ছিল না। কেবল পথ চলাই যেন তাদের লক্ষ্য। তাই তারা শুধু পথ চলছেন আর চলছেন। এভাবে চলতে চলতে এক সময় তারা এক উপত্যকায় এসে পৌঁছালো। এখানেই রডারিকের সৈন্যদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছিল। তখনো পর্যন্ত স্থানে স্থানে খ্রিষ্টানদের বিকৃত মরদেহ স্তূপাকারে পড়ে ছিল। তাদের গলিত দেহগুলো এমন দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছিল যে, সে দিক দিয়ে পথ চলাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসব দেখে ইসমাঈল বললেন, মনে হচ্ছে যে, এখানে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছে এবং তাতে মুসলমানরা জয়ী হয়েছে। বিলকিস বলল, খ্রিষ্টানদের মরদেহ দেখে তো তা-ই মনে হচ্ছে; কিন্তু মুসলমানরাই যে জয় লাভ করেছে তা কী করে বুঝলেন?

ইসমাঈল : কেননা খ্রিষ্টানরা জয়লাভ করলে তাদের মৃতদেহ এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকতো না। দেখছ না, একজন মুসলমানের লাশও আমাদের নজরে পড়েনি?

বিলকিস : হ্যাঁ, মুসলমানের কোনো লাশ তো দেখিনি।

ইসমাঈল : মুসলমানদের রীতি হলো তারা তাদের মৃতদেহ দাফন করে রাখে।

বিলকিস : আপানার ধারণা তো ঠিকই মনে হচ্ছে।

ইসমাঈল : হ্যাঁ, আমি তাই বুঝতে পারছি।

বিলকিস : বড় দুর্গন্ধ আসছে যে।

ইসমাঈল : চল, তাড়াতাড়ি সরে পড়ি। নচেৎ হয়তো কোনো অসুখ হয়ে যেতে পারে।

বিলকিস : কিন্তু যাব কোথায়? বহুদূর পর্যন্ত কেবল লাশ দেখা যাচ্ছে।

ইসমাঈল : দ্রুত ঘোড়া চালাও। যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে চলে যাও।

বিলকিস : কিন্তু আপনি?

ইসমাঈল : আমার ব্যাপারে কোনো চিন্তা করো না।

বিলকিস : কারণ, আপনি পুরুষ তাই তো?

ইসমাঈল : তাই বটে।

বিলকিস : দুর্গন্ধ তো মহিলা-পুরুষ সবার জন্যই ক্ষতিকর।

ইসমাঈল : তা তো ঠিক, কিন্তু তুমি মহিলা কিনা, তাই তা তোমাদের তাড়াতাড়ি ক্রিয়া করে।

বিলকিস : এবং আপনার ওপরও।

ইসমাঈল : আমি তো বলছি আমার জন্য কোনো চিন্তা নেই।

বিলকিস : এটা কি সম্ভব?

ইসমাঈল : আবার অসম্ভব কিসের?

বিলকিস : আপনিও ঘোড়ায় চড়ে বসুন।

ইসমাঈল : ঘোড়াটি আমাদের দুজনকে নিয়ে যেতে পারবে না।

বিলকিস : অবশ্যই পারবে। আমাদের ওজনই বা কত!

ইসমাঈল : তোমার ওজন হয়তো কম; কিন্তু আমার ...

কথার ইতি টেনে বিলকিস বলল, আপনার অনেক ওজন এই তো?

ইসমাঈল : হ্যাঁ।

বিলকিস : ঠিক আছে, আপনি উঠে পড়ুন। প্রয়োজন হলে আস্তে আস্তে যাব।

ইসমাঈল : না, না, তোমার অসুখ হয়ে যাবে যে।

বিলকিস : আমার অসুখের ব্যাপারে কোনো চিন্তা নেই।

ইসমাঈল : তুমি তো বড় জেদী দেখছি।

বিলকিস : আপনি তো আরো বেশি নয় কি?

ইসমাঈল : দেখ, দুর্গন্ধে মাথা বিগড়ে যায় কিন্তু।

বিলকিস : আপনি ঘোড়ায় উঠুন তো।

ইসমাঈল : আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আমি উঠছি।

এই কথা বলে তিনি পেছনে উঠে পড়েন এবং দ্রুত ঘোড়া চালালেন। কিছু দূর গিয়ে বিলকিস বলল, আপনি জেদ ধরেছিলেন, আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়বেন না কিন্তু ...

ইসমাঈল : কিন্তু জেদের পরাজয় হলো আর আমি চড়তে বাধ্য হলাম।

বিলকিস : পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে জিততে পারে না।

ইসমাঈল : তুমি ঠিকই বলছ।

বিলকিস : আপনি আর কখনো জেদ ধরবেন না তো?

ইসমাঈল : জেদের সুযোগই আসবে না।

বিলকিস : কেন?

ইসমাঈল : কারণ, তুমি তো তোমার বাবার সঙ্গে চলে যাবে।

বিলকিস : নিশ্চয়ই যাব।

ইসমাঈল : তাহলে জেদ ধরার সুযোগ পাব কোথায়?

বিলকিস : তাহলে আপনি কি আমাকে ছেড়ে যাবেন?

ইসমাঈল : আমি তো কখনো ছেড়ে যেতে চাই না।

বিলকিস : কিন্তু ...।

ইসমাঈল : কিন্তু তুমি চলে যাবে, তাই তো।

বিলকিস : বিশ্বাস রাখুন, আমি আমার ওপর দয়াকারীকে ছেড়ে যাব না।

ইসমাঈল : তবে কি তুমি আমার সঙ্গে মুসলিম দলে থাকবে?

বিলকিস : আপনি নিলে আমি অবশ্যই থাকব।

ইসমাঈল : তোমার বাবা যদি নিষেধ করেন।

বিলকিস : তিনি কখনো নিষেধ করবেন না।

ইসমাঈল : কেন নিষেধ করবেন না?

বিলকিস : কারণ আমাদের সমাজের নিয়ম ...

বিলকিস চুপ হয়ে পড়লেন। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, বলো কী নিয়ম?

বিলকিস : মেয়েরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে।

এখন তারা গোয়াদেল কুইভার নদী তীরে এসে গেল। বিলকিস বললেন, আমরা মনে হয় কর্ডোভার কাছাকাছি এসে গেছি।

ইসমাঈল : কী করে বুঝলে?

বিলকিস : এটা হলো গোয়াদেল কুইভার নদী। এটা আমি চিনি। এর কাছেই কর্ডোভা শহর

ইসমাঈল : কর্ডোভা শহরে যদি খ্রিষ্টান সৈন্য কিংবা পুলিশ থাকে?

বিলকিস : বিশ্বাস করুন, আমি পথ দেখিয়ে দেব।

ইসমাঈল : আরে বুদ্ধিমতি সুন্দরী, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। যেখানে নিয়ে যাও, সেখানেই যাব।

বিলকিস (স্মিত হেসে) : আপনি আমার সঙ্গে না আমি আপনার সঙ্গে?

ইসমাঈল : তুমি যদি সারা জীবন আমার সঙ্গে থাকতে।

বিলকিস (মৃদু হেসে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে) : এ কথার অর্থ কি?

ইসমাঈল : অর্থ স্পষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

বিলকিস চুপ হয়ে গেলেন। ইসমাঈল ঘোড়া নদীর তীরে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। এভাবে রাতে বিশ্রাম আর দিনে পথ চলে তারা কর্ডোভায় পৌছে গেলেন। ইসমাঈল বললেন, বিলকিস বলতে পারো, দুর্গে কী পরিমাণ সৈন্য আছে তা কার থেকে জানতে পারব? বিলকিস দুর্গের প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বলল, দেখুন খ্রিষ্টানদের পতাকার পরিবর্তে দুর্গে মুসলমানদের পতাকা উড়ছে।

ইসমাঈল ভালোভাবে দেখে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ; চল এখন আর কোনো ভয় নেই।

বিলকিস : মুসলমানদের ব্যাপারে আমারও কোনো ভয় নেই।

ইসমাঈল : কেন ভয় নেই।

বিলকিস : কারণ আমি তো আপনার সঙ্গেই আছি।

ইসমাঈল : না, সে জন্য নয়; মুসলমানরা কোনো স্ত্রীলোক, বালিকা, অসুস্থ বা ধর্মীয় নেতাদের কিছু বলে না।

বিলকিস : আচ্ছা, তাহলে চলুন।

উভয়েই এগিয়ে গেলেন। আসরের সময় তারা দুর্গে গিয়ে পৌছলেন। ফটকের মুখেই মুগীছ আর-রূমীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি ইসমাঈলকে দেখে সালাম দিলেন এবং গলা জড়িয়ে ধরলেন।

ইসমাঈল সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া, আপনি এখানে আছেন।

মুগীছ আর-রূমী আলিঙ্গন মুক্ত হতে হতে বললেন, এটাও আল্লাহর দয়া, তুমি এসে গেছ। তুমি তাদের কাছ থেকে কীভাবে ছুটে এলে?

ইসমাঈল সংক্ষেপে মুগীছ আর-রূমীকে সব ঘটনা খুলে বললেন। মুগীছ আর-রূমী বলেন, এই যুবতী তাহলে তোমার অনেক সাহায্য করেছে।

ইসমাঈল : জী হ্যাঁ।

মুগীছ আর-রূমী : সে সকল মুসলমানদের প্রতি দয়া করেছে।

বিলকিস লাজুক কণ্ঠে বলল, না তিনিই বরং আমার প্রতি দয়া করেছেন। এমন সময় আমামন সেখানে এলেন। বিলকিস তার দিকে দৌড়ে গেল। আমামনও

তাকে দেখামাত্রই দৌড়ে এসে কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল, মেয়ে আমার! ঈশ্বরকে লক্ষ কোটি ধন্যবাদ যে, তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাকে আমার বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আনন্দের আতিশয্যে বিলকিসের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছিল। আমামন বললেন, কেঁদো না মেয়ে আমার। এখন তো কাঁদার সময় না; বরং আনন্দের সময়। সেই জালিমদের হাত থেকে কে তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে?

বিলকিস ইসমাঈলের দিকে আঙ্গুল ইশারা করে বললেন, এই সহৃদয় মুসলমান।

আমামন ইসমাঈরের কাছে দিয়ে বললেন, আমি আপনার কাছে বহু কৃতজ্ঞ। আপনি আমার উপর নেহায়েত দয়া করেছেন।

ইসমাঈল : না, না, দয়ার কি আছে? আমার যা দায়িত্ব ছিল, আমি তাই করেছি।

আমামন : আমি সারাজীবন আপনার কৃতজ্ঞ থাকব।

অতঃপর তিনি বিলকিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, চল মা, ঘরে চল। তোমার অভাবে আমার ঘর এখন শূন্য। বিলকিস লজ্জিত হয়ে বলল, বাবা, এই সহৃদয় মুসলিম যুবককেও নিয়ে চলো।

আমামন : আমি তাকে আমার গৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আমি খুবই খুশি হবো।

মুগীছ আর-রূমী : এখন ইসমাঈলকে আমার সাথে যেতে দিন।

আমামন : আচ্ছা, তাই ভালো।

তারপর আমামান বিলকিসকে নিয়ে আর মুগীছ আর-রূমী ইসমাঈলকে নিয়ে চলে গেলেন।

উনিশ. বিজয়ের বন্যা

মূসা ইবনে নুসায়েরের পুত্র আবাদুল আযীয যখন থেকে স্পেনের একটি সুরক্ষিত দুর্গ, একটি উঁচু সেতু, অদ্ভুত প্রস্তর মূর্তি ও পরমা সুন্দরী মহিলাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন তখন থেকেই এসব জিনিস বাস্তবে দেখার জন্য তিনি অত্যন্ত উন্মুখ হয়েছিলেন। এমন জিনিস বাস্তবেও স্পেনে আছে বলে কাউন্ট জুলিয়ানের প্রত্যয়নের ফলে তাঁর আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। তিনি ভাবছিলেন পিতাকে বলে কয়ে স্পেনে যাওয়ার অনুমতি লাভ করবেন।

কিন্তু মূসা ইবনে নুসায়ের তারিককে স্পেন অভিযানের নেতা মনোনীত করায় তাঁর সে আশা ভেস্তে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি মনে মনে এই ধারণা পোষণ করেছিলেন, একদিন না একদিন তিনি জাগ্রত অবস্থায় তা দেখবেনই। তবে কখন এবং কীভাবে হবে, তা জানা ছিল না। তিনি দিন রাত এ চিন্তাতেই বিভোর থাকতেন। একদিন দেখা গেল, তারিকের বিজয় সংবাদ নিয়ে একজন দূত কায়রো এসেছে। শোনামাত্রই তাঁর মনে এক বিস্ময়কর অনুভূতির উদয় হলো। তা কি বিজয়বার্তার আনন্দে, না এক জানা হিংসার প্রতিক্রিয়া তা বলা মুশকিল ছিল। এর পরপরই তিনি শুনতে পেলেন, মূসা শীঘ্রই তারিকের সাহায্যার্থে অপর একটি সৈন্যদল প্রেরণ করবেন। তার মনে আবার আশার আলো দেখা দিল। তিনি পিতার কাছে তাঁর স্পেনে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু পিতা মূসা জানালেন, তিনি নিজেই তাঁর অপর দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও মারওয়ানকে নিয়ে স্পেনে যাচ্ছেন। খোদ আবদুল আযীযকে কায়রোর শাসনকার্যের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হবে।

আবদুল আযীযের ছোট দুই ভাই। একজনের নাম আবদুল্লাহ, অপরজনের নাম মারওয়ানা। মূসা তাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে স্পেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবদুল আযীয এ ভেবে কষ্ট পেলেন যে, এবারও তার ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে না। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তাঁকে বলছিল, তুমি অবশ্যই স্পেনে যাবে এবং সেখানকার সবকিছুই তুমি দেখতে পাবে। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি স্বপ্ন দেখছেন; কখন কীভাবে যাবেন তা তিনি জানতে পারছিলেন না।

পরিশেষে তাঁর পিতা মূসা দশ হাজার অশ্বারোহী ও আট হাজার পদাতিকসহ মোট আঠার হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পুত্র আবদুল্লাহ ও মারওয়ান ছাড়াও তার সঙ্গে ছিলেন আলী ইবনে রাবী, হাব্বাব ইবনে তামীমী, ইবনে আবদুল্লাহ আত-তাবীলসহ প্রমুখ খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ।

মূসা সৈন্যসহ স্পেনের উপকূলে পৌঁছলে কাউন্ট জুলিয়ান ও পাদরি স্ক্যাফ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মূসার নির্দেশের তোয়াক্কা না করে তারিক সামনে বেড়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফেলেছেন জেনে মূসা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি কিছুটা রাগান্বিত হলেন। কাউন্ট জুলিয়ান অত্যন্ত সুচতুর ব্যক্তি। তিনি বুঝতে পারলেন, মূসা তারিকের প্রতি নাখোশ হয়েছেন।

মূসা : তারিক আমার নির্দেশ মান্য করেনি।

জুলিয়ান : তিনি অবশ্য অগ্রসর হতে চাননি; কিন্তু ...

মূসা : তাহলে আপনি তাঁকে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন?

জুলিয়ান : জী না।

মূসা : তাহলে কে পরামর্শ দিয়েছে?

জুলিয়ান : তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ।

মূসা : কী কারণে?

জুলিয়ান : কারণ, বীর যোদ্ধা তারিক লাক্কা উপত্যকার নিকটে সম্রাট রডারিককে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলে খ্রিস্টনদের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে ভীষণ ভীতির সৃষ্টি হয়। তখন তারিক একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তাঁর সৈন্যদলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে একটি দল কর্ডোভায়, দ্বিতীয় দল মালাগায় এবং তৃতীয় দলটি টলোডো প্রেরণ করেন। তিনটি দলই তাদের অভিযানে সফলতা অর্জন করেন। এতে খ্রিষ্টানরা আরো ভীত হয়ে পড়ে।

মূসা : তাহলে তো তারিক অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।

জুলিয়ান : এটা সত্য যে, তারিক বিজয় ও সফলতার এক বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

মূসা : আমি তাঁর বিজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু ...

জুলিয়ান : কিন্তু কিসের জনাব!

মূসা : আমার নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর কর্তব্য ছিল।

জুলিয়ান : তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তিনি অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দিলে খ্রিষ্টানদের মন থেকে ভয় উঠে যেতো। তারা আবার সংঘটিত হয়ে মুসলমানদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করত।

মূসা : আমি সবই বুঝতে পারছি। আমি জানি যে সে সময় অগ্রসর হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। তবে তার সমস্ত অবস্থা আমাকে অবহিত করা উচিত ছিল।

জুলিয়ান : এটা অবশ্যই তাঁর ভুল হয়ে গেছে।

মূসা : এ জন্য তাকে অবশ্যই জবাবদেহি করতে হবে।

জুলিয়ান : এখন আপনার কোনদিকে যাওয়ার ইচ্ছে জনাব!

মূসা : আমি তো এদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আপনিই বলুন, আমি এখন কোনদিকে যাব?

জুলিয়ান : উত্তর দক্ষিণের সমগ্র অঞ্চল তারিক জয় করে ফেলেছেন। আপনি বরং পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে পারেন। সেভিল এবং বুসটেনিয়ার ব্যাপক উর্বর অঞ্চল এখনও জয় হয়নি।

মূসা : তাহলে সেটাই করি।

জুলিয়ান : আপনার সঙ্গে কি পরিমাণ সৈন্য আছে?

মূসা : আঠার হাজার।

জুলিয়ান : সে অঞ্চল জয়ের জন্য সৈন্য সংখ্যা নেহায়েতই কম।

মূসা : কম কেন হবে? আপনি তারিককে দেখেননি? তাঁর সঙ্গে তো মাত্র বার হাজার সৈন্য আছে।

জুলিয়ান : তা অবশ্য ঠিক। তবে সেভিল অঞ্চলের দুর্গগুলো অপেক্ষাকৃত মজবুত এবং খ্রিষ্টানরা সংখ্যায় অনেক বেশী।

মূসা : চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর ওপর আমাদের ভরসা আছে। একমাত্র তিনিই বিজয় দানের মালিক।

জুলিয়ান : ভালো, ঠিক আছে।

দ্বিতীয় দিন মূসা সৈন্যদল নিয়ে সেভিলের দিকে অগ্রসর হলেন। খ্রিষ্টানরা ইতোপূর্বেই তারিকের বিজয় কাহিনি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। তারা জেনেছিল, মুসলমানরা যে শহরেই আক্রমণ চালায়, তা বিজিত না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হয় না। এই জন্য মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের মনে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। তাই তারা তাদের অঞ্চলে মূসার আগমনবার্তা জানতে পেরে সে অঞ্চলের সকল খ্রিষ্টান মূসার সামনে গিয়ে হাজির হলো এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল। মূসা সহজ শর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি স্থাপনে রাজি হলেন এবং তাদের সঙ্গে নম্র আচরণ করলেন। মূসার এই নম্র আচরণে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে খ্রিষ্টান এসে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এভাবে কোনো রক্তক্ষয় ছাড়াই সমগ্র অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে এসে গেল। অঞ্চলটি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ঈসা ইবনে আবদুল্লাহকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেখানে দুহাজার সৈন্য রেখে মূসা নিজে ফারমুনিয়া শহরের দিকে অগ্রসর হলেন। মূসা শহরটির নিকটবর্তী হয়ে দেখতে পেলেন, তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর দুর্গটি খুবই মজবুত ও সুদৃঢ়। মূসা দুর্গ অবরোধ করলেন। পরদিন ফজরের নামায পড়ে মুজাহিদদের সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই সময় তিনি

দেখতে পেলেন, দুর্গের ফটক খুলে দেয়া হয়েছে এবং কিছু লোক সাদা পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

সাদা পতাকা শান্তির প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়। এজন্য মূসা তাঁর সৈন্যদের আগন্তুকদের ওপর হামলা করতে নিষেধ করলেন। পতাকাধারীরা মূসার কাছে এসে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল। মূসা সেভিলের অনুরূপ শর্তের ভিত্তিতে তাদের সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির শর্তাবলি এমন–

১. খ্রিষ্টানরা মুসলিম তথা ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত থাকবে। কখনো বিরোধিতা করবে না বা কোনোরকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না।
২. ধর্মীয় ব্যাপারে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।
৩. খ্রিষ্টানদের যে আইন প্রচলিত রয়েছে, তাই বলবৎ থাকবে।
৪. পুরাতন গির্জাগুলো যথারীতি প্রতিষ্ঠিত থাকবে; তবে নতুন গির্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের অনুমতি নিতে হবে।
৫. মুসলিম বিচারকের আদালতে প্রতিটি মামলার আপিল হবে। তাঁর রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৬. প্রত্যেক খ্রিষ্টান স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের পক্ষ থেকে জনপ্রতি দুই দিনার করে বার্ষিক জিযিয়া দিতে হবে।
৭. কোনো খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে অবশ্যই ইসলামি আইন কানুন পালন করতে হবে। খ্রিষ্টান আইনের কোনো বিষয় তার ওপর প্রযোজ্য হবে না।

উপরোক্ত শর্তাবলির ভিত্তিতে মূসা খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হলো। এর চাইতে সহজ শর্ত আর কী হতে পারে? তাই খ্রিষ্টানরাও খুশি হয়ে শর্তগুলো মেনে নিয়ে এবং সেভিল ও ফারমুনিয়ার অধিবাসীরা নিজ নিজ অঞ্চল ও দুর্গ মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিল। মূসা মাত্র আড়াইশ সৈন্যসহ একজন অফিসারকে সেখানে রেখে তিনি নিজে বুসটিনিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। বুসটিনিয়া ছিল স্পেনের পশ্চিমাঞ্চল। মূসা সেদিকে যেতে যেতে সর্বপ্রথমে তিনি সুবলা শহরে গিয়ে পৌছেন। তিনি সেখানে পৌছার আগেই তাঁর সম্পর্কে ভীষণ ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শহরবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। মূসা তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন এবং এখানেও কিছু সৈন্য রেখে তিনি আসুনিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন।

আসুনিয়ার দুর্গটিও খুবই মজবুত ও প্রশস্ত হলেও এর অধিবাসীরা খুবই ভীত ছিল। তাই মূসার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীরা তাঁর কাছে এসে সন্ধির

আবেদন করে। তাদের সঙ্গেও সন্ধি স্থাপিত হয়। মূসা সেখানেও কিছু সৈন্য রেখে সেখান থেকে মরতাবিসের দিকে অগ্রসর হলেন। কোনো যুদ্ধ বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হওয়ায় তাঁর বিজয় আকাঙ্খা আরো বেড়ে যায়। মূসা মারতাবিসে পৌঁছলে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে স্বাগত জানায় এবং সন্ধি স্থাপন করে তাঁর হাতে নিজেদের দুর্গটি সোপর্দ করল। মূসা সেখানেও কিছু সৈন্য রেখে নিজে বেযাদ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু কিছু সৈন্য রেখে যাওয়ায় তাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক কমে এসেছিল; কিন্তু খ্রিষ্টানরা সহজেই সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হওয়ায় অতিরিক্ত সৈন্য তলবের আর প্রয়োজন হয়নি। বেযাদের অধিবাসীরাও সন্ধি স্থাপন করে। তারপর মূসা সামনে অগ্রসর হয়ে মারিডা গিয়ে পৌঁছলেন।

শহরটি ছিল এতোই সুন্দর যে, মূসা ও মুজাহিদরা তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। শহরটির অবস্থান পাহাড়ের পাদদেশে। এর প্রাচীর যেমন উঁচু তেমনি মজবুত। তা দেখে মনে হয়, শহরটির প্রতিষ্ঠাতা যেন বড় বড় পাথর কেটে প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। মারিডার অধিবাসীরা দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল এবং সৈন্যরা প্রাচীরের উপর উঠে এসেছিল। মূসা বুঝতে পারলেন, সৈন্যরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে। সুতরাং তিনি তার নিজের দলের সৈন্য সংখ্যার হিসেব নিলেন। দেখা গেল তার সৈন্যসংখ্যা দশ হাজার।

কাউন্ট জুলিয়ানের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন, এই দুর্গে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য আছে। এ অবস্থা দেখে মূসা তাঁর পুত্র আবদুল আযীযের কাছে একজন দূত প্রেরণ করেন। তাকে লিখে দিলেন যে, আবদুল আযীয যেন একটি সৈন্যদল নিয়ে তাঁর সাহাযার্থে দ্রুত এগিয়ে আসেন।

অপরদিকে তিনি মারিডাবাসীর কাছে তাদের সন্ধিস্থাপনে উৎসাহিত করতে একজন দূত পাঠালেন। দূত তাদের সন্ধির পরামর্শ দিলে খ্রিষ্টানরা তাতে রাজি হয়নি। তাদের এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলল, তোমাদের দাম্ভিক নেতাকে বলে দাও, সে যেন শহর জয়ের আশা ত্যাগ করে চলে যায়। নাহয় সে এবং তাঁর সমস্ত সৈন্যদল লাশ হয়ে প্রাচীরের নিচে পড়ে থাকবে।

দূত বললেন, তোমরা অনর্থক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছ। রাজধানীসহ সমস্ত অঞ্চল আমরা জয় করে ফেলেছি। তোমাদের সকল নেতৃবৃন্দ আমাদের আনুগত্য স্বীকার করেছে। এরপরও তোমরা কার ভরসায় যুদ্ধে কথা বলছ?

দুর্গের খ্রিষ্টান ব্যক্তিটি জবাব দিল, আমরা দুর্গের দৃঢ়তা ও আমাদের সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের উপর ভরসা করেই বলছি। তাছাড়া সম্রাট রডারিকের স্ত্রী

নায়লা এখানে আছেন। তিনি যতক্ষণ এখানে থাকবেন, আমরা তাঁকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করব।

মুসলিম দূত ফিরে গিয়ে মূসাকে খ্রিষ্টানদের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করলেন। মূসা রাতেই সকল সৈন্যকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। পরদিন মারিডা আক্রমণ করা হবে। এটাই মূসার বাহিনীর শক্তি পরীক্ষার প্রথম সুযোগ। কারণ তাঁরা যে শহর কিংবা দুর্গেই গিয়েছেন সেখানকার অধিবাসীরা আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।

বিশ. তাকর যুদ্ধ

মূসা এশার নামায আদায় করে শুয়ে পড়লেন। শেষ রাতে উঠে ওযু করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন। নামায শেষে সেজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে আরজ করেন, হে আল্লাহ! এই পৃথিবীতে একমাত্র মুসলমানরাই একাগ্রচিত্তে তোমার ইবাদতে লিপ্ত আছে। তারা সেই জাতি, যারা তোমার হাবীব মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশিত পথে চলার প্রয়াসী। যদিও কে তোমার ইবাদত করছে, কে তোমার নির্দেশের অনুসরণ করছে এবং কে তোমার বাণীর প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত রয়েছে, তুমি তার মুখাপেক্ষী নও, তথাপি মুসলমানরা তোমারই ওপর নির্ভরশীল। মুসলমানরা যা করে সব তোমার জন্যই। অতএব তুমি তাদেরকে সাহায্য কর; অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা কর। তুমি তোমার কালামে ঘোষণা করেছ–

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۝

> হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী! তুমি যাকে ইচ্ছে ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছে ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছে তুমি পরাক্রমশালী কর আর যাকে ইচ্ছে তুমি হীন কর। কল্যাণ তো তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩ : ২৬)

অবশিষ্ট রাত তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর কাছে দোয়া করে কাটিয়ে দিলেন। ভোরে ফজরের নামায আদায় করে মুসলমানদের অস্ত্র সজ্জিত হয়ে দুর্গের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা দ্রুত নিজ নিজ তাঁবুতে গিয়ে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁরা সারিবদ্ধ হচ্ছিলেন।

মুসলিম মুজাহিদরা সারিবদ্ধ হতে না হতেই দুর্গের ফটক খুলে দেয়া হলো এবং খ্রিষ্টান অশ্বারোহীরা স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে থাকল। মূসা এবং মুজাহিদরা বুঝতে পারেন, সংখ্যাধিক্যের ওপর তাদের অহঙ্কার রয়েছে। তারা তাদের সাজসরঞ্জামেরর উপর ভরসা করে অত্যন্ত দম্ভ ভরে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

মূসা অনেক লম্বা সারি করে মুসলমানদের দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং ডান বাম ও আগেপিছে করে সকলকে বিন্যস্ত করেন। মুজাহিদরা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। খ্রিষ্টানরাও মুসলমানদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। তাঁদের অধিনায়করা তাদের সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিল। ইতোমধ্যে বেলা হয়ে এসেছে, সূর্যের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নাঙ্গা শুভ্র তলোয়ার সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে। মূসা দেখতে পেলেন, দুর্গের ফটকে খুবই সুন্দর একটি আসন এবং কয়েকটি চেয়ার পাতা আছে। একটি চেয়ারে রেশমী পোশাক ও দামী অলঙ্কার পরা একজন সুন্দরী রমণী উপবিষ্ট। কাউন্ট জুলিয়ান তখন মূসার পাশেই আছেন। মূসা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ফটকে বসা সুন্দরী রমণীটি কে? জুলিয়ান ভালোভাবে দেখে বললেন, উনিই সম্রাট রডারিকের অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী নায়লা। ইতোমধ্যে খ্রিষ্টান সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ভয়ঙ্কর আওয়াজ চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি হতে লাগল।

মূসা দেখলেন পঞ্চাশ হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য তাঁর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দুর্গের প্রাচীরের উপরও অসংখ্য সৈন্য অপেক্ষা করছে। অল্পক্ষণ পরে খ্রিস্টন সৈন্যরা ধীরে ধীরে সামনে এগুতে লাগল। তা দেখে মূসা তাঁর সৈন্যদের সামনে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদরা উত্তাল তরঙ্গের মতো সামনে এগুতে লাগলেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, এখনই শত্রু সৈন্যদের পদদলিত করে তারা বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়বে। খ্রিষ্টান সৈন্যরাও একই গতিতে সামনে আসতে লাগল। উভয় দলই খুব কাছাকাছি এসে পড়ল। খ্রিষ্টানরা তলোয়ার বের করে হাতে তুলে নিল। মুসলমানরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন।

উভয় দলে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। তৃষ্ণার্ত তলোয়ার মানুষের রক্ত পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং তা থেকে বাঁচার জন্য ঢাল ব্যবহৃত হতে লাগল। উভয় দলই তীব্রভাবে যুদ্ধে মত্ত হয়ে পড়েছে। হামলা আর পাল্টা হামলা চলছে। মানুষের কর্তিত হাত পা, মস্তক এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। শুভ্র তলোয়ার রক্তে রঞ্জিত হয়ে লাল হয়ে যাচ্ছে। খ্রিষ্টান সৈন্যরা জোরে জোরে বাজনা বাজাচ্ছে। আহত খ্রিষ্টানদের আর্তচিৎকারে ময়দান জুড়ে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা হয়ে গেল। প্রথম সারিটি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ততদূর পর্যন্ত যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

খ্রিষ্টানরা চেষ্টা করছিল যতশীঘ্র সম্বব মুসলমানদেরকে হত্যা করে জয়লাভ করতে; মুসলমানরাও অত্যন্ত ক্ষীপ্ত হয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ করে চলছে।

মুসলিম মুজাহিদরা যে খ্রিষ্টানের ওপর আক্রমণ চালায়, তাকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হয় না। মুজাহিদরা খ্রিষ্টানদের প্রথম সারিটিকে ইতোমধ্যেই খতম করে দ্বিতীয় সারির ওপর হামলা চালালো। মূসা এক হাতে তলোয়ার ও অন্য হাতে পতাকা ধরে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে এগুতে লাগলেন। সমানে শত্রু-সৈন্যদের খতম করতে লাগলেন।

মূসা বয়সে বৃদ্ধ। দাড়ি বরফের মতো সাদা। কিন্তু অন্তরে যৌবনের উদ্দীপনা; যৌবনের তেজ নিয়ে তিনি শত্রু সৈন্যের মোকাবিলা করছেন। তিনি যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছেন, সেদিকেই শত্রু সৈন্যদের পিছে হটিয়ে দিচ্ছেন। যাদের ওপরই আক্রমণ চালাচ্ছেন তাদেরই মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিচ্ছেন। তাঁর শুভ্র তলোয়ারের দ্রুত সঞ্চালণে দেখে মনে হচ্ছে, মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

তাঁর আক্রমণের তীব্রতা লক্ষ্য করে অন্য মুজাহিদরাও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলেন। ফলে মুজাহিদদের আক্রমণের গতি তীব্রতর হয়ে উঠল; কিন্তু নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় কিছু সংখ্যক মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করলেন।

খ্রিষ্টানদের প্রথম ও দ্বিতীয় সারির প্রায় সমস্ত সৈন্য নিহত হলো। মুজাহিদদের প্রথম সারির মাত্র কয়েকজন সৈন্য শাহাদাতবরণ করলেন। যেসব খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হলো, তাদের ঘোড়াগুলো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। ফলে অন্য অনেক অশ্বারোহীও ধরাশায়ী হলো। কয়েকজন মুজাহিদ কয়েকটি ঘোড়াকে পাকড়া করলেন। বাকী কয়েকটিকে জখম করে শত্রুদের দিকে তাড়িয়ে দিলেন। এই জখম ঘোড়াগুলো খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলো যে, সেগুলো সামলানোই তাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

খ্রিষ্টানরা যখন সেই জখম হওয়া ক্ষেপা ঘোড়াগুলোকে সামলানোর চেষ্টায় লিপ্ত সেই মুহূর্তে মুজাহিদরা তীব্র আক্রমণ চালালেন। ফলে খ্রিষ্টানরা দ্বিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হলেন। একদিকে ঘোড়াগুলো ছুটাছুটি করে তাদের আহত করছে, অপরদিকে মুজাহিদরা তাদের হত্যা করে চলছে। খ্রিষ্টানরা ঘাবড়ে গেল। মুজাহিদরাও তাদের দুর্বলতা আঁচ করে আরো তীব্র হামলা চালালেন। তাতে অসংখ্য খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হলো। চারিদিকে শুধু লাশ আর লাশ। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও মুসলমানদের প্রতিরোধ করতে পারলো না। মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে সবই ভেস্তে গেল। তারা সংখ্যায় এতোই বেশি ছিল যে, বিপুল সংখ্যক সৈন্য মৃত্যুবরণ করলেও তাদের সংখ্যায় কোনোরূপ ঘাটতি দেখা দিল না। যারা বেঁচে ছিল তারা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল।

যুদ্ধে মুসলমানরা গভীরভাবে লিপ্ত ছিল। তাদের দেখে মনে হচ্ছে, এই হয়তো তারা যুদ্ধের সমাপ্তি টানবে; এখনই হয়তো যুদ্ধের চরম ফায়সালা হয়ে যাবে।

খ্রিষ্টানরা এই ভেবে ক্ষুব্ধ হচ্ছে, মুসলমানরা সংখ্যায় খুবই কম। এরপরও তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে; অথচ মৃত্যুবরণ করছে খুবই কম।

খ্রিষ্টান সেনাপতি এই বলে তার সৈন্যদের উৎসাহিত করছে, মুসলমানরা সংখ্যায় খুবই কম; অতএব তোমাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই; তোমরা আরো জোরে আক্রমণ চালাও। খ্রিষ্টান সৈন্যরা কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু মুসলমানদের আক্রমণের শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে; এভাবে একের পর এক খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হচ্ছে।

মুজাহিদরা এ কথা ভুলেই গেছে যে, তারা খ্রিষ্টানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত; তাদের আত্মরক্ষা করে করে এগুতে হবে। তাদের সামনে কেবল একটি মাত্র প্রতিজ্ঞা, এ লড়াইয়ে জিততে হবে, ইসলামি পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। এদিকে দুপুর হয়ে এসেছে। মওসুমটা আবার গ্রীষ্মকাল। গরমে তারা ঘেমে নেয়ে গেছে; কিন্তু কোনো দিকেই কোনো পরওয়া নেই; রৌদ্রতাপ, পিসাসা সবকিছুই তারা আজ ভুলে গেছে।

নায়লা দুর্গের ফটক থেকে যুদ্ধ দেখছিল। সে এতোই সুন্দরী ছিল যে, দূর থেকে তাকে চাঁদের মতো উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। ওদিকে মূসাও অত্যন্ত উদ্যম ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলছেন। তিনি নিজে অসংখ্য শত্রু সৈন্য হত্যা করেছিলেন। তাঁর একপাশে পুত্র আবদুল্লাহ, অপর পাশে মারওয়ান। তাঁরাও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। মূসা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মুজাহিদরাও সমস্বরে ধ্বনি তুলে আরো তীব্রভাবে হামলা চালালেন। এতে খ্রিষ্টানরা অত্যন্ত ভীত হয়ে দুর্গের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে।

মুজাহিদরা পেছনে ধাওয়া করে খ্রিষ্টানদের কচুকাটা শুরু করলেন। তাদের ইচ্ছা ছিল, তাঁরা খ্রিষ্টানদের সঙ্গেই দুর্গে প্রবেশ করবেন। তাঁরা খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের নিকটে পৌছতেই দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়া হলো। ফলে মুসলিম মুজাহিদরা দুর্গে প্রবেশ করতে পারলেন না। বহুসংখ্যক খ্রিষ্টান তখনো দুর্গের বাইরে রয়ে গেছে। মুজাহিদরা তাদের খতম করতে লাগলেন। অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, একজন খ্রিষ্টানও মুজাহিদদের হাত থেকে রেহাই পেলো না।

দুর্গের ফটকটি অত্যন্ত মজবুত হওয়ায় সহজে ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। এজন্য মূসা সকলকে ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং মুজাহিদরা সবাই নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে এলেন।

[illegible]

বিপুলসংখ্যক খ্রিষ্টান মারিডা থেকে অনেক সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রণাঙ্গনে বেরিয়ে এসেছিল। তারা ভেবেছিল সহজেই মুসলমানদের পরাজিত করে ফেলবে অথবা পলায়নে বাধ্য করবে; কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মোকাবিলার সময় মুসলমানরা তাদের কচুকাটা করতে শুরু করলে তারা পরাজিত হয়ে পালাতে লাগল। এমনভাবে পালালো যে, পেছনে ফিরে তাকানোরও সুযোগ পেলো না। এই যুদ্ধে কমপক্ষে সাত হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য নিহত হলো এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে চার হাজার মুজাহিদ শহীদ হলেন।

পরাজয়ের ফলে খ্রিষ্টানরা এমনভাবে ভীত হয়ে পড়ল যে, কখনো মুসলমানদের সামনাসামনি হওয়ারও সাহস তাদের অবশিষ্ট রইল না।

মুসলমানরা প্রতিদিন তাঁবু থেকে বের হয়ে দুর্গের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। খ্রিষ্টানদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করতেন। মধ্যাহ্নের পর ফিরে আসতেন। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল; কিন্তু খ্রিষ্টানরা দুর্গ থেকে বেরুল না। মুসলিম মুজাহিদরা অপেক্ষা করছিলেন যে খ্রিষ্টানরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলেই যুদ্ধের চরম ফায়সালা হয়ে যেতো; কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হলো না।

মূসা দেখতে পেলেন, দুর্গটি এতোই মজবুত যে, আক্রমণ করে তা জয় করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এইজন্য তিনি আক্রমণ না করে অবরোধ করার কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর ধারণা ছিল, দুর্গে সঞ্চিত রসদপত্র ফুরিয়ে গেলে খ্রিষ্টানরা এমনিতেই বেরিয়ে আসবে অথবা আত্মসমর্পণ করবে। অবরুদ্ধ অবস্থায় খ্রিষ্টানরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। তাদের মনে আশঙ্কা দেখা দিল, এই অবস্থায় বেশিদিন থাকতে হলে তারা ক্ষুধায় মারা যাবে।

এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল; কিন্তু খ্রিষ্টানদের মধ্যে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া হলো না। মূসা অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত দুর্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন ফজরের নামায পড়ে সকল মুজাহিদকে দুর্গ ভাঙ্গার এবং তাতে আরোহণ করার সাজ সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদরাও লাগাতার কয়েকদিন বসে থেকে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। দুর্গ আক্রমণের কথা শুনে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই মূসাও বের হয়ে এলেন। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন,

মুসলিম ভাইয়েরা! আমরা এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম, খ্রিষ্টানরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আবার আমাদের মোকাবিলা করবে; কিন্তু আমাদের সম্পর্কে তাদের মনে এতোই ভয়ের সঞ্চার হয়েছে যে, দুর্গ থেকে বেরোতেই তারা সাহস পাচ্ছে না। আমরা এখানে বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করেছি; কিন্তু আর নয়। খ্রিষ্টানরা হয়তো মনে করেছে যে, আমরা দুর্গটি জয় করতে পারবো না। তাই আমি চাই আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করব। তোমাদের কেউ কেউ কাছে গিয়ে দুর্গে প্রাচীর ভাঙ্গতে থাকবে; আর কেউ কেউ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করবে।

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর মূসা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মুজাহিদরাও আওয়াজ তুলে এবং বিদ্যুৎ বেগে ময়দানের দিকে এগুতে থাকলেন। খ্রিষ্টানরা দুর্গ প্রাচীরের ওপর দাঁড়ানো ছিল। মুসলমানদের অগ্রসর হতে দেখেই তারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল এবং ওপর থেকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। মুসলমানরা ঢাল দিয়ে আড়াল করে নিজেকে ঘোড়াকে রক্ষা করে সামনে এগুতে লাগলেন। তাঁরা বিস্ময়করভাবে সামনে অগ্রসর হলেন। তাঁদের সঙ্গে তলোয়ার, খঞ্জর, তীর ও বর্ম। কাঁধে ঝুলানো তিন তিন শলার সিঁড়ি। এগুলোর অগ্রভাবে ছিদ্র করা। তাতে যুক্ত করে সিঁড়িগুলো প্রয়োজন মতো বড় করা যায়। মুজাহিদরা উভয় হাতের ঢালের সাহায্যে খ্রিষ্টানদের পাথর নিক্ষেপ উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হলেন; ইতোমধ্যে খ্রিষ্টান সৈন্যরা পাথর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তীরও ছুঁড়তে শুরু করে। এরপরও তাঁরা পিছপা হলেন না। মুজাহিদদের কেউ কেউ আহত হওয়া সত্ত্বেও কোনোরূপ পরওয়া না করে সামনে এগুতে লাগলেন। মুজাহিদদের এরূপ বেপরওয়া ভাব দেখে খ্রিষ্টানরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারলো না, মুসলিম মুজাহিদরা কেমন জীব। তারা আহত হওয়া সত্ত্বেও পিছপা হচ্ছে না; বরং এগিয়েই চলেছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা প্রত্যেক যুগেই বিস্ময়ের বস্তু রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

সেনাপতি মূসা, তাঁর দুইপুত্র আবদুল্লাহ ও মারওয়ানসহ অন্যান্য মুজাহিদরা অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগুচ্ছেন। পূর্ব গগণে সূর্যালোক দেখা দিয়েছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যরশ্মি। প্রাতৎকালীন মৃদুমন্দ বাতাসে মুজাহিদদের হাতের ইসলামি পতাকা পতপত করে উড়ছে।

পাথর ও তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে খ্রিষ্টানরা কাহিল হয়ে পড়ল। তাদের চিৎকারও বন্ধ হয়ে এলো। তারা ভেবেছিল তীর ও পাথর নিক্ষেপের ফলে মুসলমানরা হয়তো ভীত হয়ে পড়বে, তারা হয়তো দুর্গের কাছেই পৌছতে পারবে না; কিন্তু

মুসলমানরা যখন কোনো কিছুরই পরোয়া না করে দুর্গ প্রাচীরের নিকটে পৌঁছে গেছে দেখে খ্রিষ্টানরা হতভম্ব হয়ে গেল।

এবার তারা দেখে দেখে নওজোয়ান খ্রিষ্টানদের প্রাচীরের ওপর মোতায়েন করল। তারা বড় বড় পাথর ছুঁড়তে লাগল; কিন্তু ততক্ষণে মুজাহিদরা প্রাচীরের একদম কাছে এসে গেছে। ফলে পাথর নিক্ষেপে তাদের কোনোঅসুবিধা হলো না। কাছে এসেই তারা সিঁড়ি লাগিয়ে প্রাচীরের উপরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল।

মুজাহিদরা প্রাচীরের উপর বুরূজের কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন খ্রিষ্টান সৈন্য তলোয়ারের আঘাতে তাদের মস্তক উড়িয়ে দিল। এইভাবে কয়েকজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করলেন। মুজাহিদরা বুরূজের আশপাশে আরো চারপাঁচটি সিড়ি লাগিয়ে একের পর এক ওপরে উঠতে থাকলেন; কিন্তু বুরূজের কাছে পৌঁছলেই উপরে অবস্থানকারী খ্রিষ্টানরা তলোয়ারের আঘাতে মুজাহিদদের হত্যা করে ফেলতে থাকল। আর মুজাহিদরাও এতোটাই বে পরওয়া যে, তারা আত্মরক্ষার ব্যাপারে কোনো খেয়ালই করছেন না। ফলে খ্রিষ্টানদের তলোয়ারের আঘাতে অনেক মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করলেন কিন্তু তাতেও মুজাহিদরা ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বেশি পরিমাণ মুজাহিদ ওপরে উঠতে লাগলেন। তাতে অনেক মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করলেন। এজন্য এই বুরূজটিকে শহীদদের বুরূজ নামে অভিহিত করা হয়।

মূসা ও অন্য মুজাহিদরা নিজে দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের এই পরিণতি লক্ষ্য করছিলেন। পরিশেষে মূসা নিজেই ক্ষিপ্ত হযে মুখে তলোয়ার নিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। একহাতে ঢাল অপর হাতে সিড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগলেন। ততক্ষণে অন্য মুজাহিদরাও তাঁর অনুসরণ করে ওপরে উঠতে লাগলেন।

মূসা বুরুজের কাছাকাছি পৌঁছলে তাঁর মস্তক দেখামাত্রই খ্রিষ্টানরা তাঁকে লক্ষ্য করে তলোয়ারের আঘাত হানল; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ ঢাল দিয়ে সে আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেন। তিনি হাত দিয়ে একজন খ্রিষ্টানকে পা টেনে ধরে নিচে ফেলে দিলেন। খ্রিস্টনটি নিচে পড়ামাত্রই মুজাহিদরা তলোয়ার দিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন।

এরপর মূসা আরোকজন খ্রিষ্টানকে নিচে ফেলে দিলেন। তারও একই পরিণতি ঘটল। এক সময় মূসা সুযোগ বুঝে বুরূজে উঠে পড়েন এবং তলোয়ার দিয়ে খ্রিষ্টানদের হত্যা করতে শুরু করলেন।

মূসাকে একা দেখে খ্রিষ্টানরা চারিদিক দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলল; ইতোমধ্যে আরেকজন মুজাহিদও উঠে পড়লেন। তিনিও খ্রিষ্টানদের উপর প্রবল আক্রমণ

শুরু করলেন। এরপর অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে আরো অনেক মুজাহিদ বুরূজে গিয়ে পৌঁছে দ্রুত তলোয়ার চালাতে থাকলেন। খ্রিষ্টানরা দেখতে পাচ্ছিল, মাত্র অল্প সংখ্যক মুজাহিদ বুরূজে উঠে এসেছে। তাই তাদের হত্যা করা সহজ মনে করে অত্যন্ত দ্রুত তলোয়ার চালাতে লাগল।

বুরূজটি ছিল আয়তনে বেশ বড়। তাতে প্রায় এক হাজার খ্রিষ্টান ছিল। মুজাহিদরা সংখ্যায় অল্প হলেও শহীদ মুজাহিদদের প্রতিশোধ স্পৃহায় তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। প্রতি আক্রমণেই দলে দলে খ্রিষ্টান নিহত হচ্ছিল। মুসলিম মুজাহিদরা সিংহের মতো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিলেন। প্রত্যেক মুজাহিদের তলোয়ারই যমদূত। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা বুরূজে অবস্থানকারী সকল খ্রিষ্টানদের হত্যা করে ফেললেন। কিন্তু তাদের আগমনধারা অব্যাহত ছিল; সামনের দলটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি নতুন দল এসে হাজির হয়ে গেল; কিন্তু তাদের মৃতের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল এবং বুরূজের ভেতরে মৃতদেরহের স্তূপ পড়ে গেল তখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পেলো না।

তারা সিদ্ধান্ত নিল, মুসলমানরা বুরূজ থেকে বেরিয়ে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হলেই তাদের ওপর হামলা চালাবে। ইতোমধ্যে বুরূজের ভেতরে মুজাহিদদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তারপর মুজাহিদরা প্রাচীরের দেয়ালের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁরা বুরূজের ফটকের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলেন নিচ থেকে একদল মুজাহিদ আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিচ্ছেন।

মুজাহিদরা নিচের দিকে লক্ষ্য করেন দেখতে পেলেন, একটি মুসলিম সৈন্যদল এগিয়ে আসছে। মূসা ও মুজাহিদরা বুঝতে পারেন, তাদের সাহায্যার্থে আবদুল আযীয আরেকটি সৈন্যদল নিয়ে এসেছেন।

ঠিক এমনি মুহূর্তে সাহায্যকারী সৈন্যদলটি পেয়ে মুজাহিদরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হযে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। প্রাচীর দেয়ালের নিচের মুজাহিদরাও তাদের ধ্বনির সঙ্গে অংশগ্রহণ করলেন।

নতুন সৈন্যদলের আগমন ও মুসলমানদের সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে খ্রিষ্টান সৈন্যরা ঘাবড়ে গেল। মূসা ওপরের মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে প্রাচীর দেয়ালের দিকে গিয়ে দেখতে পেলেন, খ্রিষ্টানরা সাদা পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মূসা তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাও, এগিয়ে এসো। একজন সম্ভ্রান্ত খ্রিষ্টান সামনে এগিয়ে এসে বলল, আমরা সন্ধি করতে চাই।

মূসা : কী শর্তে?

খ্রিষ্টান : শর্ত পরে নির্ধারণ করা হবে; এখন যুদ্ধ মুলতবি ঘোষণা করা হোক।

মূসা : আমরা যেহেতু এই প্রাচীর যুদ্ধ করে অধিকার করেছি, আমরা তা ছেড়ে যাব না।

খ্রিষ্টান : ঠিক আছে, প্রাচীর আপনাদের অধিকারেই থাকবে।

মূসা : বুরূজে অবস্থানরত মুজাহিদদের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করা হবে?

খ্রিষ্টান : আপনি যা ভালো মনে করেন।

মূসা : আমাদের সৈন্যরা প্রাচীরেই অবস্থান করবে।

খ্রিষ্টান : আমরা তা মেনে নিলাম।

মূসা : তোমাদের সকল সৈন্য প্রাচীর ছেড়ে চলে যাবে।

খ্রিষ্টান : এভাবে তো সমস্ত প্রাচীরটি আপনি দখল করতে চাচ্ছেন।

মূসা : না, আমরা কেবল নিরাপত্তা চাচ্ছি।

খ্রিষ্টান : তাহলে ভালো।

মূসা : তোমরা তোমাদের সকল সৈন্যকে প্রাচীর থেকে নামিয়ে নাও।

খ্রিষ্টান : আচ্ছা, তাই হবে।

খ্রিষ্টান ব্যক্তিটি চলে গেল। সে মূসার সঙ্গে তার কথোপকথনের সৈন্যকে প্রাচীর ছেড়ে ভেতরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। নেতার নির্দেশমতো সকল খ্রিষ্টান সৈন্য ভেতরে চলে গেল। কয়েকজন খ্রিষ্টান নেতা এসে মূসাকে জানালো, তারা সকল সৈন্য প্রাচীর থেকে সরিয়ে নিয়েছে। মূসা সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন কেবলমাত্র আড়াইশ সৈন্য বুরূজ ও প্রাচীরে রেখে বাকী সমস্ত সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁবুতে চলে যাবেন।

খ্রিষ্টান : আপনিই বুঝি মুসলমানদের সেনাপতি।

মূসা : হ্যাঁ, আমার নাম মূসা।

সকলেই তাঁর নাম শুনে থ হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে একজন বলল, আপনিই বুঝি ইসলামি সাম্রাজ্যের আরব প্রতিনিধি?

মূসা : হ্যাঁ।

খ্রিষ্টান : আপনি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট শক্তি সাহসের অধিকারী।

মূসা : মুসলমানরা বৃদ্ধ হলেও যৌবনের উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে না।

খ্রিষ্টান : তাই তো দেখছি।

তারপর মূসা আড়াইশ মুজাহিদকে বুরূজ ও প্রাচীরে মোতায়েন করে অবশিষ্টদের তাঁবুতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সকল মুজাহিদ বিজয়ের আনন্দে

কুরআনের বাণী উচ্চারণ করতে করতে চলে গেলেন। মূসা বললেন, এখন আমি যাচ্ছি। তোমাদের বিশিষ্ট কয়েকজন নিয়ে আগামীকাল সকালে আমার তাঁবুতে এসো।

খ্রিষ্টান : হ্যাঁ, তাই হবে।

খ্রিষ্টানরা সেখান থেকে চলে গেল। মূসাও বুরূজ থেকে নেমে তাঁবুর দিকে রওয়ানা হলেন।

বাইশ. স্বপ্নের ব্যাখ্যা

মুজাহিদদের নতুন সৈন্য দলটি মূসার পুত্র আবদুল আযীযের নেতৃত্বে কায়রো থেকে এসেছিল। তাঁদের সংখ্যা ছিল সাত হাজার। তাঁরা এসেই দুর্গ প্রাচীরের বুরূজে মুসলমানদের যুদ্ধরত অবস্থায় দেখে খ্রিষ্টানদের মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলেছিলেন।

খ্রিষ্টানরা দেখতে পাচ্ছিল, পূর্বের মুজাহিদরাই একটি বুরূজ দখল করে ফেলেছে। সুতরাং নবাগত মুজাহিদরা যদি আক্রমণ চালায় তবে পুরো দুর্গটিই তারা দখল করে ফেলবে; ফলে খ্রিষ্টানরা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল।

তাছাড়া খ্রিষ্টানদের মনে সন্দেহ হয় মুসলমানদের আরো সৈন্য হয়তো কাছেধারেই আছে, তারা যে কোনো সময় এসে হামলা চালাতে পারে। এসব কারণে খ্রিষ্টানরা সন্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী আলাপ আলোচনার জন্য তারা আপাতত যুদ্ধ মুলতবির প্রস্তাব পেশ করে। মূসা তাদের প্রস্তাব মঞ্জুর করে বুরূজ ও দুর্গ প্রাচীরে আড়াইশ সৈন্য মোতায়েন করে তাঁবুতে ফিরে এলেন। তিনি প্রাচীরের নিচে তাঁবু পর্যন্ত কিছু সৈন্য মোতায়েন করেন যাতে প্রাচীরের উপরে মুজাহিদদের উপর খ্রিষ্টানরা আক্রমণ করলে নিচের মুজাহিদরা তাদের সাহায্য করতে পারে এবং তাঁবুতে সংবাদ দিতে পারে। কারণ অধিকাংশ সময় খ্রিষ্টানরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো। এজন্য মুসলমানরা তাদের কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না। মূসা নিচে নেমে নবাগত মুসলিম বাহিনীর কাছাকাছি পৌঁছলে তাঁর পুত্র আবদুল আযীয এসে তাঁকে সালাম দিলেন। মূসা বললেন, আমার নয়নমণি! তুমি যথাসময়েই এসে পৌঁছছ।

আবদুল আযীয : আব্বাজি! আপনার চিঠি পাওয়ার পর আমি এক মুহূর্তও দেরি করিনি।

মূসা : খুবই ভালো করেছো; তোমার আগমনে খ্রিষ্টানরা খুবই ভীত হয়ে পড়েছে।

আবদুল আযীয : তারা কি আনুগত্য ঘোষণা করেছে?

মূসা : এখনো পুরোপুরি করেনি। যুদ্ধ মুলতবি হয়েছে মাত্র।

আবদুল আযীয : তাহলে তারা সন্ধিতে সম্মত হয়েছে?

মূসা : হ্যাঁ, আগামীকাল তাদের একটি প্রতিনিধিদল আলোচনার জন্য আসবে। এখন তাহলে তোমার সৈন্যদলকে বিশ্রাম নিতে বলো; তুমি নিজেও বিশ্রাম নাও।

আবদুল আযীয : ঠিক আছে আব্বাজি!।

আবদুল আযীয তাঁর সৈন্যদলকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলে সকল সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে তাঁবু খাটাতে শুরু করল। অল্পক্ষণেই তাঁবু খাটানো শেষ হয়ে গেল। সবাই বিশ্রাম করতে থাকলেন। আবদুল আযীযও নিজের তাঁবুতে চলে গেলেন। মূসাও নিজ তাঁবুতে চলে গেলেন। কখনো কখনো তিনি দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করতেন। আজও কী মনে করে তিনি দাড়িতে খেযাব লাগিয়ে কালো করে ফেললেন।

পরদিন সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল মূসার তাঁবুতে গিযে উপস্থিত হলো। গতকাল যাদের সঙ্গে মূসার কথাবার্তা হয়েছিল, আজকের প্রতিনিধি দলে তাদের ছাড়া কিছু নতুন লোকও ছিল। তাঁবুতে গিয়ে তারা মূসাকে অভিবাদন জানালো। মূসা তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে বসতে বললেন। তিনি তাদের সঙ্গে সদাচরণ করলেন। তিনি ভেবে আশ্চর্য হলেন, এই খ্রিষ্টানরা তো নিজেরাই সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। তারা তো না-ও আসতে পারতো! তিনি নিজেই তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী জন্য এসেছেন?

আগতদের একজন বললেন, আমরা আপনাদের নেতার সাথে আলোচনা করতে চাই, যার সাথে গতকাল আমাদের কথা হয়েছিল।

গতকাল মূসার সঙ্গে কথা বলেছিল, এমন একজন মূসাকে বলল, আপনিই কি সেই ব্যক্তি?

মূসা : হ্যাঁ।

জনৈক খ্রিষ্টান : কিন্তু গতকাল তো আপনার দাড়ি সাদা ছিল।

মূসা মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আজ তো কালো। স্পেনবাসীরা তখন পর্যন্ত খেযাবের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। সাদা চুল কীভাবে কালো করা যায় তা তারা জানতো না। এই জন্য দাড়িতে খেযাব লাগিয়ে কালো করার ফলে তারা মূসাকে চিনতে পারছিল না। যখন তারা নিশ্চিত হলো, তিনিই সেই ব্যক্তি যার সাথে গতকাল তাদের কথা হয়েছে, তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, যে জাতি নিজেদের বয়স পরিবর্তন করে ফেলতে পারে, যাদের বৃদ্ধরাও ইচ্ছেমতো যুবক হয়ে যেতে পারে, তাদের কোনো জাতি পরাজিত করতে পারবে না। তার চাইতে বরং এটাই ভালো যে, মুসলমানরা যেসব শর্তারোপ করে, আমরা সেসব মেনে নেবো। সকলেই এ কথায় একমত হলো। খ্রিষ্টানদের একজন বলল, আমরা অনর্থক রক্তপাত করতে চাই না। আমরা এমন সব শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চাই, যাতে আমাদের জাতির কোনো ক্ষতি হবে না।

মূসা : আমি তো প্রথমেই সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে তোমাদের কাছে দূত পাঠিয়েছিলাম। আমি নিজেও আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রক্তপাত চাই না। অতএব, শর্তও তেমন কঠিন কিছু হবে না।

জনৈক খ্রিষ্টান : তা হলে শর্ত বর্ণনা করুন।

মূসা : প্রথম কথা হলো, যারা দুর্গে থাকতে চাইবে, তাদের সকল অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া আমাদের কাছে সোপর্দ করতে হবে। যারা তা করতে রাজি নয়, তাদের দুর্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। তবে তাদের সকল ধন সম্পদ অবশ্যই রেখে যেতে হবে। যারা এখানে থাকবে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করব। এজন্য তাদেরকে এক প্রকার নামমাত্র কর দিতে হবে। ইসলামি পরিভাষায় এর নাম জিযিয়া।

খ্রিষ্টান : আপনার শর্ত যুক্তিসঙ্গত, আমরা তা মেনে নিচ্ছি।

মূসা : তাহলে তোমরা এখন যেতে পার। সর্বপ্রথম ঘোড়া ও অস্ত্রগুলো একত্রিত করো; অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে, কারো কাছেই যেন এ দুটির কোনোটিই না থাকে।

খ্রিষ্টান : এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমরা আমাদের অঙ্গীকারের কোনোরূপ অন্যথা করবো না।

মূসা : এটাই তো সভ্যতার দাবি, এরপরও কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া গেলে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

খ্রিষ্টান : হ্যাঁ, তা-ই হবে। আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত এসব জমা করে আপনাদের কাছে উপস্থিত করব।

মূসা : ঠিক আছে।

খ্রিষ্টানরা চলে গেল। মূসা নিজ সৈন্যদলকে জানিয়ে দিলেন, আজ যুদ্ধ মুলতবি থাকবে। তাতে অনেকেই মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেও প্রকাশ করেনি; তারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র পরিষ্কারের কাজে লেগে গেলেন। সন্ধ্যায় খ্রিষ্টানরা তাদের সমস্ত ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হলো। মূসা সেগুলো গুনে গুনে গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি আলী ইবনে রাবীকে দুর্গটি অধিকারের জন্য পাঠালেন। মূসা তাঁকে নির্দেশ দিলেন, কোনো খ্রিষ্টানের সাথে যেন কোনোরকম দুর্ব্যবহার করা না হয়। তিনি আলীকে আরও নির্দেশ দিলেন, খ্রিষ্টানদের নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। আলী বিনা বাধায় দুর্গটি অধিকার করেন। এটা ছিল ১লা শাওয়াল, ১৩ হিজরীর ঘটনা। রাতে মুজাহিদরা খুব নিশ্চিন্তে ঘুমালেন। সকলে ঘুম থেকে উঠে সবাই নিজ নিজ কাজে লেগে গেল। জায়গাটি আবদুল আযীযের অত্যন্ত ভালো লাগল। তিনি একটি ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। পাহাড়টির

চারিদিকে সবুজের সমারোহ। আবদুল আযীয এই সবুজ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। মনের অজান্তেই তিনি এগুতে থাকলেন। যতই এগুচ্ছেন উপত্যকার রঙবেরঙের ফুলের শোভা তাকে ততই মুগ্ধ করছে। এভাবে এগুতে এগুতে এক জায়গায় পৌঁছে তিনি অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলেন। আরো কিছু দূর এগিয়ে তিনি একটি মূর্তি দেখতে পেলেন। মূর্তিটি অত্যন্ত উঁচু। এর মস্তকের দিকে চাওয়া কষ্টসাধ্য। মূর্তিটি এতোই ভয়ঙ্কর যে, তা দেখে রীতিমতো ভয় লাগে। এতো বড় মূর্তি তিনি আগে কখনো দেখেননি। এটি দেখে তাঁর কায়রোতে দেখা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, এটিই সেই উপত্যকা, সেই ধ্বংসাবশেষ ও মূর্তি, যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম; তা হলে কি আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। তবে সেই সুন্দরী রমণী কোথায় যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম! তিনি আবার মূর্তিটির দিকে তাকালেন। মূর্তিটির প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন; সবকিছুই শিল্পমণ্ডিত। তার কাছে অবাক লাগলো, মূর্তিটিতে কোথাও কোনো জোড়া নেই। মনে হচ্ছে, বিরাট এক পাথর কেটে মূর্তিটি তৈরি করা হয়েছে। আবদুল আযীয মূর্তিটির চেহারা দেখার জন্য অনেক চেষ্টা করেও উঁচু হওয়ার কারণে দেখতে পেলেন না।

তাঁর দৃষ্টি ফুলের ওপর থেকে আরো দূরে চলে গেল। কিছু দূরে তিনি কয়েকজন সুন্দরী রমণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন। তাদের পরনে দামী পোশাক; তারা নানা প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত। তাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দরী এক মহিলার পরনে মহামূল্যবান পোশাক। গলায় অতি মূল্যবান মোতির হার; অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মহামূল্যবান সব অলঙ্কার।

গলার হারটি মহামূল্যবান মণিমুক্তা খচিত; এটি এতোই উজ্জ্বল যে চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না। এই হারটি তার চেহারায় এনে দিয়েছে বিদ্যুতের ঝলক। তার চেহারা থেকে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আবদুল আযীয একদৃষ্টিতে সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তেইশ. মোহময়ী নারী

ইসমাঈলের আগমনে মুগীছ আর-রূমীসহ অন্যান্য মুজাহিদরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ইসমাঈল নিজেও সকলের সাক্ষাৎ পেয়ে খুব খুশি হলেন। মুগীছ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজের অবস্থানের প্রাসাদে চলে এলেন। সেখানে পৌঁছে তিনিসহ অন্য মুজাহিদরা ইসমাঈল থেকে তাঁর বন্দী হওয়া ও বন্দীদশা থেকে পালানোর ঘটনা থেকে শুরু করে পাহাড়ে আরোহণ করা, মূল্যবান পাথর ও রৌপ্য খনি লাভসহ যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা শুনলেন। ইসমাঈলের বর্ণনা শেষ হলে মুগীছ বললেন, তুমি তো বড় বিস্ময়কর কাহিনি শুনালে! যে পাহাড়ে মূল্যবান পাথর ও রৌপ্যখনি দেখেছিলে, সেখানে কি এখনো যেতে পারবে?

ইসমাঈল : জী হ্যাঁ, মনে হয় আমি সেখানে যেতে পারব।

মুগীছ আর-রূমী : ভুলে যাও, আর কখনো সেখানে যাওয়ার চিন্তা করো না।

ইসমাঈল : আমি নিজে তো কখনো সেখানে যাবো না।

মুগীছ আর-রূমী : তাই ঠিক। মনে রেখো, ধন সম্পদ মানুষকে আল্লাহ ও পরকালের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আমাদের মহানবী (সা.) এই জন্যই কখনো সম্পদ লাভে আগ্রহী হননি; অথচ তিনি চাইলে আল্লাহ তাঁর জন্য সোনা-রূপার পাহাড় দিয়ে দিতেন। আমরা সেই মহানবীর অনুসারী। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।

ইসমাঈল : এখন তাহলে আপনি আমাকে জিহাদের কাহিনি শুনান।

মুগীছ আর-রূমী তাঁকে রডারিকের সৈন্যদলের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ এবং কর্ডোভা জয়ের বিস্তারিত কাহিনি বর্ণনা করলেন। ইসমাঈল অনুতপ্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন, তিনি উক্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না।

মুগীছ আর-রূমী : অনুতপ্ত হওয়ার কারণ নেই। তুমি তো জিহাদ করতেই দেশ ত্যাগ করেছিলে; কিন্তু অনিচ্ছাকৃত কারণে জিহাদে শরীক হতে পারলে না; আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাকে একজন মুজাহিদের সমপরিমাণ প্রতিদান দেবেন। তাছাড়া এখনো অনেক অঞ্চল অবিজিত রয়েছে। অতএব, দুঃখ করো না।

ইসমাঈল : থিওডমিরের কী হলো?

মুগীছ আর-রূমী : সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছে।

ইসমাঈল : আল্লাহ চাহেন তো আমি অবশ্যই তাকে খুঁজে বের করব।

মুগীছ আর-রূমী : আল্লাহ চাহেন তো তা-ই হবে; এখন একটি কক্ষ বেছে নিয়ে আরাম করো।

ইসমাঈল আচ্ছা বলে উঠে গেলেন। তিনি নিজের জন্য একটি প্রশস্ত কক্ষ বেছে নিয়ে তাতে অবস্থান করলেন। সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করলেন। এ ক'দিনে কখনো বিলকিসের কাছে যাওয়ার কথা মনে করেননি। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে, যতদিন বিলকিস সফরে ছিল, ততদিন পর্যন্ত তার নিরাপত্তার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এখন সে তার পরিবার পরিজনের কাছে পৌঁছে গেছে। এখন আর তাঁর প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া ইসমাঈল এ-ও মনে করেছিলেন, বিলকিস হয়তো তার ঘরে যাওয়া পছন্দ করবে না; এজন্য তিনি কখনো বিলকিসের ঘরে যাওয়ার চিন্তা করেননি। অপরদিকে বিলকিস প্রতিমুহূর্তে ইসমঈলের কথা মনে করতো। সে ইসমাঈলকে ভুলার জন্য যতই চেষ্টা করতো তাঁর স্মৃতি তাকে ততবেশি পীড়া দিত।

কর্ডোভায় মুসলমানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে তাঁদের অবস্থানের আর প্রয়োজন রইল না। মুগীছ মুজাহিদদের টলোডোর দিকে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ইসমাঈলও কর্ডোভা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁর মনে এক অজানা ভাবনার উদয় হলো। তিনি চিন্তা করলেন, বিলকিসের সঙ্গে শেষবারের মতো সাক্ষাৎ করবেন; কিন্তু সাহস হলো না। তিনি টলেডো যাত্রার জন্য তৈরি হতে থাকলেন। একদিন দুপুরে তিনি বিষণ্ন মনে কক্ষে বসেছিলেন। এমনি সময় পায়ের হালকা শব্দ শুনতে পেলেন। চোখ তুলে দেখতে পেলেন বিলকিস তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। বিলকিসকে দেখে মনে হচ্ছিল একটি পূর্ণ চন্দ্র যার আগমনে সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়; ইসমাঈল তাকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান, বিলকিস কাছে এসেই ইসমাঈলকে লক্ষ্য করে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বললেন, হে কাপুরুষ! ভীরু! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ইসমাঈল অভিবাদন গ্রহণ করে বিলকিসকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। বিলকিস বসে পড়ে। ইসমাঈল বললেন, আমি কাপুরুষ, ভীরু! মনে হচ্ছিল সুন্দরী বিলকিস ইসমাঈলের প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট কিংবা ক্ষুব্ধ। সে বলল, জী-না, আপনি কেন হবেন।

ইসমাঈল : আমার সন্দেহ হয়েছিল, তুমি হয়তো কখনো আমাকে দোষারোপ করতে পার। বিলকিস ভালোবাসা মিশ্রিত ক্ষোভের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বলল, যতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন, ততক্ষণ তো বানিয়ে কোনো কথা বলেননি।

ইসমাঈল : আমি বানিয়ে কথা বলছি?

বিলকিস : না, আমি বলছি!

ইসমাঈল : তুমি রাগ করছ কেন?

বিলকিস : আপনার মনকে জিজ্ঞেস করুন।

ইসমাঈল : আমার মনে যদি কোনো কথা থাকত, তাহলে ...

বিলকিস : তাহলে কী হতো?

ইসমাঈল : তাহলে মনকে জিজ্ঞেস করতাম।

বিলকিস : আপনার মন পাথর কি না, তাই ...

ইসমাঈল : আর তোমার?

বিলকিস : আমার! আচ্ছা, এসব এখন থাক। এখন বলুন, আপনিও কি চলে যাবেন না থাকবেন?

ইসমাঈল : ও মা, আমি এখানে থাকব কীভাবে?

বিলকিস : তা তো আমি আগেই জানতাম।

ইসমাঈল : তুমি কী জানতে?

বিলকিস : আমি জানতাম, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই আপনি চলে যাবেন।

ইসমাঈল : আমি বহুবার তোমার ঘরে যাওয়ার ইচ্ছে করেছি কিন্তু ...

বিলকিস : কিন্তু ফুরসত হয়নি, তাই তো?

ইসমাঈল : না বরং ...

বিলকিস : আমার ঠিকানা জানা নেই?

ইসমাঈল : তুমি তো আমাকে বলতেই দিচ্ছ না।

বিলকিস : তাহলে বলুন।

ইসমাঈল : সাহস পাচ্ছিলাম না।

বিলকিস : কেন?

ইসমাঈল : কারণ আমার ধারণা হয়েছিল, তুমি হয়তো আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, কিংবা তোমার পিতা আমার যাওয়া ভালো চোখে দেখবে না।

বিলকিস : আহা, তা কেমনে হতে পারে ইসমাঈল!

আজকেই প্রথবারের মতো বিলকিস ইসমাঈলকে নাম ধরে সম্বোধন করল। সে একদৃষ্টিতে ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, তুমি সে চিন্তায় বসে ছিলে, আর আমি ভেবেছি, তুমি একটা ভীরু, কাপুরুষ। এজন্যই একবারের জন্যও আসোনি।

ইসমাঈল : তুমি তাহলে রাগ করোনি।

বিলকিস : না, তবে ...

ইসমাঈল : তবে কি?

বিলকিস : তুমি এখান থেকে যেয়ো না।

ইসমাঈল : তা কী করে সম্ভব?

বিলকিস : কেন?

ইসমাঈল : মুগীছ আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।

বিলকিস : তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

ইসমাঈল : তোমার পিতা কি তাতে সম্মত হবেন?

বিলকিস : আমি তাকে সম্মত করেছি।

ইসমাঈল : আচ্ছা, তাহলে আমি আজকে মুগীছের অনুমতি নেয়ার চেষ্টা করি।

বিলকিস : আজকে নয়; এখনই নাও।

ইসমাঈল : আচ্ছা, তাহলে তুমি বস, আমি অনুমতি নিয়ে আসছি।

বিলকিস : যাও।

ইসমাঈল চলে গেলেন। বিলকিস একাকী বসে রইলেন। বসে বসে তিনি কি যেন ভাবছিলেন, এমনি মুহূর্তে ইসমাঈল ফিরে এলেন। তিনি বললেন, মুগীছ নিজে তো অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু তিনি বললেন, তোমার পিতার অনুমতি অপরিহার্য।

বিলকিস : আমি তো তাকে রাজি করেছি।

ইসমাঈল : তিনি কি তোমাকে আমাদের সঙ্গে টলেডো যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন?

বিলকিস : নিশ্চয়ই, তোমার প্রতি তিনি খুবই কৃতজ্ঞ; এজন্য আমি একটু বলতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

ইসমাঈল : তাহলে তোমার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে আমি অনর্থক ইতস্তত করেছি।

বিলকিস : তিনি নিজেই বলেছেন, ইসমাঈল তো দেখছি, একজন কাপুরুষ। সে একবারও তোমাকে দেখতে এলো না।

ইসমাঈল : তাহলে তো দেখছি, আমি ভুল বুঝেছি।

বিলকিস : আচ্ছা এখন তাহলে অনুমতি দাও। আমাকেও প্রস্তুতি নিতে হবে।

ইসমাঈল : ঠিক আছে।

বিলকিস চলে গেল। ইসমাঈল তার সরলতার জন্য বেশ কিছুক্ষণ আফসোস করলেন। এসব আলোচনার তৃতীয় দিন দুশ মুসলমানকে কর্ডোভায় রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে মুগীছ আর-রূমী টলোডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আমামন ও তার সুন্দরী কন্যা বিলকিসও তাঁদের সঙ্গে চললেন।

চব্বিশ. হৃদয়ের আকর্ষণ

আবদুল আযীয সুন্দর হার পরিহিতা রমণীকে দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রমণীটি অপরূপ সুন্দরী। তদুপরি তার পরনে মূল্যবান সব পোশাক; অঙ্গে নানারকমের মূল্যবান অলঙ্কার, গলায় ছিল মহামূল্যবান উজ্জ্বল হার। এমন সাজসজ্জায় তাকে আরো সুন্দরী মনে হচ্ছিল। তিনি সম্রাট রডারিকের স্ত্রী রানি নায়লা। আরব ও খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা তাকে 'স্পেনের হুর' এবং মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাকে 'স্পেন সুন্দরী' নামে অভিহিত করেছেন।

আবদুল আযীয নায়লার দিকে এবং নায়লা আবদুল আযীযের দিকে তাকিয়ে ছিলেন; কিছুক্ষণ পর নায়লা এক আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে সামনে এগুতে লাগলেন। তিনি কিছুটা এগিয়ে এসে আবদুল আযীযকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

নায়লা আরবি জানতেন; তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলছিলেন। আবদুল আযীয বললেন, আমি নামবিহীন এক ব্যক্তি। নায়লা হাসলেন। বললেন, আপনি কি নামবিহীন না আপনার নামই রাখা হয়নি?

আবদুল আযীয : আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন।

নায়লা : আপনি আরবের অধিবাসী?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ, তাই।

নায়লা : মুসলিম গভর্নর কি আপনার আত্মীয়?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ, তিনি আমার পিতা।

নায়লা : সাহায্যকারী এই সৈন্যদল কি আপনিই নিয়ে এসেছেন?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ, আমি নিয়ে এসেছি।

নায়লা : আপনি এখানে কেন এসেছিলেন?

আবদুল আযীয : আপনি শুনতে চাইলে আমি বলতে পারি।

নায়লা : হ্যাঁ, আমি শুনছি, আপনি বলুন।

আবদুল আযীয : কিছুদিন আগে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম।

নায়লা একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, স্বপ্ন?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ.।

নায়লা : কী দেখেছিলেন স্বপ্নে?

আবদুল আযীয : এখন যা দেখছি।

নায়লা : এখানে কি আপনি এর আগেও এসেছিলেন?

আবদুল আযীয : না, কখনোই না।

নায়লা : তাহলে স্বপ্ন দেখলেন কেমন করে?

আবদুল আযীয : তা আমি বলতে পারব না; কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ, এই বিরাটকার মূর্তি আর এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন আপনি।

নায়লা একথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, আমাকেও কি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ।

নায়লা : এ তো দেখছি এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

আবদুল আযীয : আরো বিস্ময়ের ব্যাপার, যখন আমি স্বপ্ন বর্ণনা করছিলাম, সেসময় সিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান ও সেভিলের পাদরি স্ক্যাফ আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন।

নায়লা আরো বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, তারা দুজন সেখানে কেন গিয়েছিল?

আবদুল আযীয : সম্রাট রডারিক কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিন্ডার সতীত্ব হরণ করেছে, তারা এই অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিল।

তা শুনে নায়লা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আছে; এই বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তার চেহারায় এক লজ্জার আভা ফুটে উঠল। তাতে তাকে আরো বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছিল। আবদুল আযীয বললেন, কাউন্ট জুলিয়ান আমাকে বলেছিলেন, মহামূল্যবান হার পরিহিতা সুন্দরী মহিলাটি স্পেনের রানি নায়লা।

নায়লার চেহারায় লজ্জার আভা আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। তিনি মাথা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্ভবত সেসময়ের কথা মনে পড়েছিল যখন তিনি ছিলেন স্পেনের একক সম্রাজ্ঞী; স্পেনের সকল মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখতো। কিন্তু পাপিষ্ঠ স্বামী তার অপকীর্তির জন্য সে নিজেও মরল। আর নায়লাকে আত্মরক্ষার জন্য রাজধানী ছেড়ে মারিডায় পালিয়ে আসতে হলো। আবদুল আযীয জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি নায়লা?

নায়লা : জী হ্যাঁ, আমি সেই অভাগা নায়লা ।

আবদুল আযীয : আপনি অভাগা হবেন কেন? বরং আপনি হচ্ছেন সেই ভাগ্যবতী নারী, যার জন্য সারা দুনিয়া গর্ববোধ করে।

নায়লা : আহা, আমি তো আমার সম্পর্কে জানি ...

তিনি এতোই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে কথা শেষ করতে পারলেন না। আবদুল আযীয তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি যা বলবেন, আমি তা-ই করব।

নায়লা : আমি কী নির্দেশ দিতে পারি? আমি তো একজন কয়েদী মাত্র।

আবদুল আযীয : আপনি কয়েদী নন।

নায়লা : আমার জাতি আপনাদের দাস এবং আমি আপনাদের দাসী।

আবদুল আযীয : না, না, আপনি দাসী নন; বরং স্বাধীন। এসব ভেবে খামাখা মনে কষ্ট নেবেন না।

নায়লা : ভাগ্যের লেখা ফলবেই, এর কষ্ট আমাকে অবশ্যই মাথা পেতে নিতে হবে; কিন্তু এই কষ্টের কোনো সুফল নেই।

আবদুল আযীয : আপনি অনর্থক দুঃখ না করে বলুন, আপনি কী চান।

নায়লা : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি শুনেছি, মুসলিম গভর্নর টলেডো যাচ্ছেন?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ।

নায়লা : আপনিও কি চলে যাবেন?

আবদুল আযীয : অবশ্যই, আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

নায়লা : আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারব?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ, এটা তো আনন্দের কথা।

নায়লা : তাহলে আমাকে অনুমতি দিন।

আবদুল আযীয : এটা তো আমারও কামনা।

নায়লা : আমারও।

আবদুল আযীয অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি তাঁর ভাগ্যের জন্য গর্ব করতে লাগলেন। নায়লা যেমন সুন্দরী, তেমনি তার বচন-বাচনও অভিনব। আল্লাহ তাকে রূপগুণ দুটোই দান করেছিলেন। তিনি বললেন, আমার জন্য আপনার গর্বের কী আছে?

আবদুল আযীয : এজন্য যে, আপনার আকর্ষণই আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। নাহলে ...

নায়লা : নাহলে কী হতো?

আবদুল আযীয : আমি তো সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম।

নায়লা : কেন?

আবদুল আযীয : স্পেনে সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলে আমাকে পাঠানোর জন্য আমি পিতার কাছে আবেদন করেছিলাম কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি। আমার পরিবর্তে তারিককে পাঠানো হলো। দ্বিতীয়বার পিতা আমাকে রেখে তিনি নিজেই এলেন। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হলো যে, আমাকেও আসতে হলো। আর তাই তো আপনার সাক্ষাৎ হলো।

নায়লা : কিন্তু আপনি যদি না আসতেন?

আবদুল আযীয : তা হলে কি হতো?

নায়লা : তা হলে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতো না এবং ...

আবদুল আযীয : এবং কী হতো?

নায়লা : আমার মনে আপনাদের সাথে যাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হতো না।

আবদুল আযীয : এটাই আমার জন্য গৌরবের বিষয়।

নায়লা : কিন্তু ...

আবদুল আযীয : কিন্তু কী?

নায়লা : আপনি কতদিন আমার পাশে থাকবেন?

আবদুল আযীয : আমি সবসময় আপনার পাশে থাকব।

নায়লা : সবসময়!

আবদুল আযীয : হ্যাঁ, সবসময়।

নায়লা : বুঝে শুনে ওয়াদা করবেন।

আবদুল আযীয : আমি বুঝে শুনেই বলছি।

নায়লা : আপনি কি চিরদিনই এ দেশে থাকতে চান।

আবদুল আযীয : হ্যাঁ।

নায়লার চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ঈশ্বর আপনাকে আপনার ওয়াদায় ঠিক রাখুন।

আবদুল আযীয : আমি মুসলমান। মুসলমানদের ওয়াদা সুদৃঢ় হয়।

নায়লা : আমিও তা শুনেছি।

আবদুল আযীয : আপনি কি সবসময় আমার সঙ্গে থাকতে প্রস্তুত?

নায়লা অভিমানের ভঙ্গিতে আবদুল আযীযের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি প্রস্তুত না থাকলে আপনাকে এসব জিজ্ঞেস করব কেন?

আবদুল আযীয : কিন্তু ...

নায়লা : কীসের কিন্তু?

আবদুল আযীয : এটা মনে রাখবেন, আপনি একজন রানি আর আমি একজন গভর্নরের পুত্র।

নায়লা : কিন্তু এখন তো আমি রানি নই।

আবদুল আযীয : এখনো আপনি রানি। সকল খ্রিষ্টান এখনো আপনার পায়ে মস্তক অবনত করতে প্রস্তুত।

নায়লা : যাক, আমি যে-ই হই না কেন, আপনি আপনার অঙ্গীকার মনে রাখবেন।

আবদুল আযীয : আমি আমার কথা অবশ্যই মনে রাখব। তবে আমাকে একটি কথা বলবেন কি?

নায়লা : বলুন, কী সে কথা।

আবদুল আযীয : আপনি কি আমাকে আগে দেখেছিলেন?

নায়লা : না, একমাত্র আজকেই।

আবদুল আযীয : আপনি তো আমাকে দেখতে আগ্রহী ছিলেন।

নায়লা : নিশ্চয়ই। আজকে যখন আপনাকে এদিকে আসতে দেখেই আমি দাসীদের নিয়ে এখানে এসেছি। আমার ধারণা ছিল, আপনি হয়তো সেই মূর্তিটি দেখতে যাচ্ছেন।

আবদুল আযীয : আমার জানাও ছিল না, মূর্তিটি কোথায়। আকস্মিকভাবেই আমি এখানে এসে পড়েছি।

নায়লা (লজ্জার সুরে) : এটা তো আমারই হৃদয়ের আকর্ষণ।

আবদুল আযীয : না, এটা আমার হৃদয়ের আকর্ষণ। এ আকর্ষণই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

নায়লা : যা-ই হোক, এটা আমাদের উভয়ের হৃদয়ের আকর্ষণ, যা পরস্পরকে টেনে এনেছে।

আবদুল আযীয : এটাই ঠিক।

নায়লা : এখন আমাদের যাওয়া উচিত।

আবদুল আযীয : তাহলে চলুন।

উভয়েই যেতে লাগলেন। দাস-দাসীরা পেছনে আসতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে নায়লা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে সঙ্গে নেয়ার ব্যাপারে আপনার পিতার সম্মতি নেবেন কীভাবে?

আবদুল আযীয : নিশ্চিন্ত থাকুন, অবশ্যই সম্মতি নিয়ে নেব।

নায়লা : তাই ভালো।

উভয়েই ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। এক সময় মারিডা দুর্গে গিয়ে পৌঁছলেন। নায়লা অভিবাদন জানিয়ে দুর্গের ভেতরে চলে গেলেন। আবদুল আযীযও মুজাহিদদের কাছে ফিরে গেলেন।

পঁচিশ. নতুন সিদ্ধান্ত

মূসা ইবনে নুসায়র কর্তৃক মারিডা বিজয়ের পর স্পেনের পশ্চিমাঞ্চলের খ্রিষ্টানরাও ভীত হয়ে পড়ে। ফলে মারিডার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শহর থেকে দলে দলে লোক এসে সন্ধি করতে লাগল। এইভাবে পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতেও মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মূসা টলোডো যাওয়ার কথা ঘোষণা দিলেন। সৈন্যদের মধ্যে প্রস্তুতির সাড়া পড়ে গেল। আবদুল আযীয নায়লাকে সঙ্গে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; কিন্তু পিতার সম্মতি ছাড়া তা কোনো মতেই সম্ভব নয়। তাই কীভাবে সম্মতি নেয়া যায় এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। দেখতে দেখতে যাত্রার দিন ঘনিয়ে এলো; কিন্তু তখন পর্যন্ত আবদুল আযীয কোনো কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেননি।

আবদুল আযীয অত্যন্ত অস্থির হয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হলেন। এ সময় তাঁর কাছে আরও কয়েকজন মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আবদুল আযীয সালাম দিয়ে এক পাশে বসে পড়লেন। মূসা বললেন, স্পেনের অধিকাংশ অঞ্চল আমরা জয় করেছি। আর অল্পসংখ্যক এলাকা বাকী আছে।

আবদুল আযীয বললেন, তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু ...

মূসা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু কী? তোমার কী ধারণা?

আবদুল আযীয : বিজিত শহরগুলোতে আমরা যেভাবে স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদ রেখে যাচ্ছি, আমার সন্দেহ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় খ্রিষ্টান অধিবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে মুজাহিদদের আত্মরক্ষার কোনো পথ থাকবে না।

জনৈক নেতা আলী বললেন, খ্রিষ্টানরা সাহসই পাবে না।

মূসা : কিন্তু আবদুল আযীযের সন্দেহ যুক্তিযুক্ত।

অপর এক মুজাহিদ নেতা হায়াত বললেন, আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে।

আবদুল আযীয : আজ কয়েকদিন থেকে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে ....।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই কয়েকজন মুজাহিদ নেতা হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হলেন এবং সালাম জানিয়ে বসে পড়লেন। মূসা তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন একি! তোমাদের অবস্থা এমন কেন? একজন বললেন, আল্লাহর রহমত ছিল বলে হয়তো এভাবেও আসতে পেরেছি। মূসা বিস্মিত হয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন। তোমরা কোত্থেকে এসেছ?

একজন জবাব দিলেন, আসূনিয়া থেকে।

মূসা : আসুনিয়ার খ্রিষ্টানরা কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

ঐ ব্যক্তি : হ্যাঁ, তারা গাদ্দারি করেছে।

মূসা : একটু বুঝিয়ে বলো, কি হয়েছে।

ঐ ব্যক্তি : ঘটনা হলো, যেহেতু আমরা অনেক দিন ধরে সেখানে অবস্থান করছিলাম। তাই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, খ্রিষ্টানরা হয়তো আর কোনোরকম গাদ্দারী করবে না। কিন্তু এক রাতে আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় তারা অতর্কিত আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমাদের ঘুম ভাঙ্গার আগেই বিশজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন।

মূসা (উত্তেজিত হয়ে) : বিশজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেছে!

ঐ ব্যক্তি : জী হ্যাঁ।

মূসা : তারপর কি হলো?

ঐ ব্যক্তি : আমরা ক'জন কোনোমতে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে এসেছি।

আবদুল আযীয : আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো।

মূসা : খ্রিষ্টানরা আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। আমরা আর তাদের বিশ্বাস করতে পারি না। আসুনিয়ার খ্রিষ্টানদের তাদের গাদ্দারির জন্য অবশ্যই সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

আলী : অবশ্যই।

মূসা (আবদুল আযীযকে) : তুমি আসুনিয়া অভিযানের নেতৃত্ব দেবে এবং তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে টলোডো ফিরে আসবে।

আবদূল আযীয : ভালো, আপনি কি এখান থেকে টলোডো যাওয়া মনস্থ করেছেন?

মূসা : হ্যাঁ।

আবদুল আযীয : আমার সন্দেহ হচ্ছে, আসুনিয়ার খ্রিষ্টানদের দেখাদেখি অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিষ্টানরাও বিদ্রোহ করতে পারে।

মূসা : আমারও এমন ভয় হচ্ছে।

আবদুল আযীয : মারিডার মতো যেসব দুর্গ আমরা বহু কষ্টে জয় করেছি সেগুলোর নিরাপত্তার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

মূসা : তুমি ঠিকই বলেছ। এর জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

প্রত্যেক দুর্গে আরো বেশি পরিমাণ সৈন্য রাখা উচিত, যাতে খ্রিষ্টানরা বিদ্রোহের সাহসই করতে না পারে।

আবদুল আযীয : তাতে তো তাদের সৈন্য সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে যাবে এবং আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব।

মূসা : তা ঠিক।

আলী : তাহলে আমরা কি করব?

আবদুল আযীয : এমন কোনো কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যাতে আমাদের বেশি সৈন্যও রেখে যেতে না হয় এবং বিদ্রোহেরও সম্ভাবনা না থাকে।

আলী : তাহলে খ্রিষ্টানদেরকে গির্জায় নিয়ে শপথ করাতে হবে।

মূসা : তাতে কোনো লাভ হবে না। কারণ তাদের কোনো কথা বা কাজ বিশ্বাস করা যায় না।

আবদুল আযীয : আমার একটি কৌশল মনে এসেছে।

মূসা : কী সেটি?

আবদুল আযীয : প্রত্যেক বিজিত শহর বা দুর্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে নেব এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে, যদি কোনো দুর্গ বা শহরের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে, তবে তাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হবে এবং সেই সকল অঞ্চল জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

মূসা (আনন্দিত হয়ে) : তোমার কৌশল খুবই উপযোগী।

আলী : খুবই উত্তম কৌশল। এরচে' উপযোগী কৌশল আর হতেই পারে না।

আবদুল আযীয : প্রত্যেক স্তরের একজন একজন করে প্রতিনিধি জামিন হিসেবে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে নেব।

মূসা : এর উদ্দেশ্য কী?

আবদুল আযীয : ফলে খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ ছাড়া পাদরিরাও জামিন হিসেবে আমাদের সাথে থাকবে।

মূসা : ঠিক আছে, তাই হবে।

আবদুল আযীয : এই মারিডা থেকে আমরা কাকে কাকে নেবো?

মূসা : যারা আমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে সকল স্তরের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের সঙ্গে নিলেই চলবে।

আবদুল আযীয : তাই ঠিক; কিন্তু ...

মূসা : কিন্তু কী?

আবদুল আযীয : তারা ছাড়াও আরো একজন ব্যক্তিত্ব আছে।

মূসা : সে কে?

আবদুল আযীয : রডারিকের স্ত্রী নায়লা।

মূসা : ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তার কথা আমার একদম মনেই ছিল না। তাকে অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে।

আবদুল আযীয : আপনার কি সেই স্বপ্নের কথা মনে আছে, যা আমি কায়রোয় দেখেছিলাম?

মূসা : আমার তো মনে পড়ছে না।

আবদুল আযীয : আমি যে সবুজাভ ধ্বংসস্তূপে একটি বিরাটকায় প্রস্তরমূর্তি দেখেছিলাম।

মূসা : হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে।

আবদুল আযীয : সে স্থানটি ছিল এটাই।

মূসা (বিস্মিত হয়ে আবদুল আযীযের দিকে তাকিয়ে) : সেটি এখানেই?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ, এখানেই। আমি সেই প্রতিমা ও স্থানটি দেখেছি।

মূসা মুচকি হেসে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেই হার পরিহিতা স্ত্রীলোকটিকেও?

আবদুল আযীয : তাকেও সেখানে দেখেছি।

মূসা : সে স্ত্রীলোকটি কে?

আবদুল আযীয : নায়লা।

মূসা : তার সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়েছে?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ, হয়েছে।

মূসা : আমাদের সঙ্গে যাওয়ায় সে অপমানিত বোধ করবে না তো?

আবদুল আযীয : সে নিজেই আমাদের সঙ্গে যেতে চায়।

মূসা : তাহলে তুমি প্রস্তুত হও। দু হাজার মুজাহিদ তোমার সঙ্গে নিয়ে নাও।

আবদুল আযীয : তা-হলে আজকেই আমি রওয়ানা হয়ে পড়ি।

মূসা : আজ নয়, আগামীকাল। আমিও টলোডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

আবদুল আযীয : বেশ, তাই হবে।

মূসা তৎক্ষণাতই সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আগত লোকদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি বললেন, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে, আসুনিয়ায় খ্রিষ্টানরা সন্ধি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং বিশজন নিরপরাধ মুজাহিদকে হত্যা করেছে। ফলে আমরা সকল খ্রিষ্টানের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। আমরা আগামীকালই টলোডো যাত্রা করব। আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রত্যেক দুর্গ

থেকে নেতৃস্থানীয় কিছু লোককে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো। তারা আমাদের কাছে জামিন হিসেবে থাকবে। যদি কোনো দুর্গের লোকেরা সন্ধি ভঙ্গ করে তবে সেই দুর্গের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হবে।

তারা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে মূসার কথাত শুনে তারা বলল, এক স্থানের নির্বোধ খ্রিষ্টানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের সবাইকে অত্যন্ত বিপদে ফেলে দিয়েছে। আমরা একথা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, আপনার মতো ন্যায়বান শাসক আমাদের মধ্যেও কেউ ছিল না। অতএব আপনার ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনি জামিন হিসেবে আপনাদের সাথে নিয়ে নিতে পারেন।

মূসা : আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তোমরা সবাই এবং রডারিকের স্ত্রী নায়লাও আমাদের সাথে যাবে।

একজন খ্রিষ্টান : তাই ভালো।

মূসা : আমরা আগামীকালই যাত্রা করব। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। তোমাদের সবকিছুর দায়দায়িত্ব এখন আমাদের ওপর।

ঐ খ্রিষ্টান : খুবই ভালো কথা।

খ্রিষ্টানরা সেখান থেকে চলে গেল। পরের দিন সকলেই তৈরি হয়ে একত্রে এসে জড়ো হলো। নায়লাও এসে উপস্থিত হলেন। মূসা সকলকে নিয়ে টলোডো যাত্রা করলেন। অপরদিকে আবদুল আযীয দুহাজার মুজাহিদ নিয়ে আসুনিয়া যাত্রা করলেন।

ছাব্বিশ. মহান বিজয়ীর অপসারণ

মুসার দূত ইতোমধ্যে তারিকের কাছে পৌঁছে গেছে। তিনি সকল মুজাহিদকে আমীরের নির্দেশ পাঠ করে শুনালেন। তারিক বাধ্য হয়ে আর অগ্রসর না হয়ে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি রাহীলের পিতাকে জানিয়ে দিলেন, তার কন্যা মুসলমানদের হেফাজতে রয়েছে। এখন তার দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সে কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে যেন শীঘ্রই এসে সাক্ষাৎ করে। তারিক জানতে পেরেছিলেন, মুগীছ আর-রূমী কর্ডোভা ও এর পার্শ্ববর্তী দুর্গগুলো জয় করে টলোডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি এ-ও শুনেছিলেন, মূসা সেভিলের সমগ্র অঞ্চল জয় করে ফেলেছেন। তিনিও জিহাদী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে সামনে অগ্রসর হতে আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু মূসার নির্দেশের কথা মনে করে তিনি অনেক কষ্টে ধৈর্যধারণ করেন। ক'দিন পরই মুগীছ আর-রূমী সেখানে ফিরে এলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, সারা দেশের খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এখন যে দিকেই এগুনো হবে, সে অঞ্চলই মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করবে। এভাবে সমগ্র স্পেনেই মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর এ পরামর্শের এই ভিত্তিতে তারিক সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং কিলআ, কিসতা ইত্যাদি অঞ্চল জয় করে একটি পাহাড়ী নদীর নিকটবর্তী হলেন। খ্রিষ্টানরা এতোই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মুসলমানরা যেদিকেই যেতো খ্রিষ্টানরা সে অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতো। তারিক সে নদীটি অতিক্রম করে পর্বতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। এই পর্বতশ্রেণি ফ্রান্স পর্বতের দক্ষিণ থেকে স্পেনের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি এই পর্বতমালা অতিক্রম করে ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে খাজা শহরে উপনীত হলেন।

সামনের পথ ছিল খুবই দুর্গম। তদুপরি মূসার টলোডো আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে তারিক টলেডো ফিরে এসে সেখানেই অবস্থান করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই মূসার আগমনবার্তা শুনা গেল। তারিক কয়েকজন নেতৃবৃন্দ ও কিছু সৈন্য নিয়ে মূসাকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য গেলেন। পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ শহর তালাওয়ার নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। তারিক মূসার চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন, তিনি নাখোশ হয়েছেন। নারাজির কারণও তাঁর জানা ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁদের কোনো কথা হলো না; বরং উভয়েই একে অপরকে নিজ নিজ বিজয়ের কাহিনি শুনালেন। তারিক মূসার, মূসা তারিকের গুণকীর্তন করেন।

অতঃপর তাঁরা সবাই টলোডো চলে এলেন। তারিক সেখানে পৌছে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জিনিসপত্রের বর্ণনা দিলেন এবং সেখানে যেসব বিরল জিনিসপত্র তাঁর হস্তগত হয়েছিল, সেগুলো মূসার সামনে উপস্থিত করলেন। এ প্রসঙ্গে হীরামুক্তা খচিত একটি সিংহাসন তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো।

আসনটি ছিল বড় বড় মণিমুক্তাখচিত। মূসা সেগুলো দেখে তারিকের বীরত্বের প্রশংসা করলেন; সাথে সাথে এ-ও বললেন, আমি আনন্দিত যে, তুমি তোমার বীরত্ব দ্বারা খ্রিষ্টানদের মনে ভীতির সৃষ্টি করেছে; তবে তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করে মুসলমানদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও সামনে অগ্রসর হয়েছ।

তারিক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই আমার ভুল হয়েছে হুজুর! আমি তো আপনারই অনুগত একজন গোলাম এবং ...।

মূসা তাঁর কথার ছেদ টেনে বললেন, এখন আর তুমি গোলাম নও, স্বাধীন; বরং একটি প্রদেশের গভর্নর।

তারিক : তা হয়তো ঠিক। তবে আমি যখন আমার দেশ থেকে এসেছিলাম তখন একজন গোলামই ছিলাম। এখন আপনার অনুগ্রহে আমি এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছি।

মূসা : না, বরং একান্ত আল্লাহর অনুগ্রহ ও তোমার নিজ যোগ্যতায় তুমি এই মর্যাদা সমাসীন হয়েছ।

তারিক : তা হয়তো ঠিক; কিন্তু আমি সর্বাধিক কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, কেননা আপনিই আমাকে আযাদ করেছেন এবং আপনার বদৌলতেই আমি আজ এই মর্যাদায় পৌছতে পেরেছি।

মূসা : সন্দেহ নেই যে, তুমি গোলাম ছিলে; কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তুমি আমার ও অন্য মুসলমানদের ভাই হয়ে গেছ। আমি যা কিছু করেছি, তা একজন মুসলমান হিসেবেই করেছি।

তারিক : নিশ্চয়ই, আমি এ জন্য চিরকৃতজ্ঞ।

মূসা : আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। তাতে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

তারিক : এ আপনার সততা ও উদারতা।

মূসা : আমি যখন তোমাকে এই অভিযানে প্রেরণ করেছিলাম, তখন তোমার ওপর বার হাজার সৈন্যের ভাগ্য ন্যস্ত করেছিলাম।

মূসা : তোমার একটু পদস্খলন হলে সমস্ত সৈন্য অত্যন্ত বিপদে পতিত হতো।

তারিক : এ ব্যাপারে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম। তদুপরি আল্লাহর রহমতে মুজাহিদদের কোনোরূপ অসুবিধা হয়নি।

মূসা : তা হয়নি; কিন্তু বিপদের সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

তারিক : অমনটা সম্ভাবনা থাকলে আমি হয়তো সামনে এগুতাম না।

মূসা : না, তুমি সেদিকে লক্ষ্য করনি। জিহাদী উদ্দীপনা ও বিজয় আনন্দে তুমি সেসব পাশ কেটে গেছ।

তারিক : তা ঠিক নয় হুজুর।

মূসা : তাহলে?

তারিক : খ্রিষ্টানরা একের পর এক পরাজিত হয়ে মুসলমানদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই আমি মনে করেছিলাম, যতটা সম্ভব এ সুযোগে সামনে এগিয়ে দেশ জয় করে ফেলবো। আর এটাই সহজতর ছিল।

মূসা : কিন্তু আমি তো তোমাদের বিপদের সম্ভাবনায় তোমাকে আর সামনে বাড়তে নিষেধ করেছিলাম।

মুগীছ আর-রূমী : হুজুর, অবস্থা এই ছিল যে ক্রমাগত বিজয়লাভের ফলে খ্রিষ্টানদের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, সেসময় সামনে না এগুলে হয়তো সে ভয় দুর হয়ে যেতো। নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তারা হয়তো মুসলমানদের মোকাবিলার চেষ্টা করত। তাতে বরং অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

মূসা : আল্লাহ না করুক, মুসলমানরা যদি এতে পরাজিত হতো তাহলে?

মুগীছ : তাহলে আমরা সকলেই এ জন্য দায়ি হতাম।

মূসা : কিন্তু সেনাপতি তো ছিল তারিক।

মুগীছ : তা অবশ্যই, তবে তিনি নিজের একক মতে কিছুই করেননি।

মূসা : তাহলে?

মুগীছ : তিনি যা করেছেন, সবই সকলের পরামর্শের ভিত্তিতেই করেছেন।

মূসা : সকলের পরামর্শ কি ছিল?

মুগীছ : অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা।

মূসা : সে পরামর্শ কি সঠিক ছিল?

মুগীছ : আমরা যে ফল পেয়েছি, তাতে তো তাই মনে হয় যে, পরামর্শ সঠিক ছিল।

মূসা : আমি আবার বলছি যে, পরাজিত হলে মুজাহিদদের কী অবস্থা হতো।

মুগীছ : খুবই ভয়াবহ।

মূসা : এর জন্য কে দায়ি হতো?

মুগীছ : আমরা সকলেই, যারা পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

মূসা : না, তারিক যেহেতু এই অভিযানের নেতা সুতরাং তাঁকেই জবাবদেহি করতে হতো।

মুগীছ : তা হয়তো ঠিক, কিন্তু তিনি যা করেছেন সব আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করেছেন।

মূসা : আমি তা স্বীকার করছি। তবে যে আমার এ-ও ভালো করে জানা আছে সে একজন আবেগময়ী বীব যুবক। সে তাঁর বীরত্ব ও আবেগের বশবর্তী হয়ে বার হাজার মুসলিম সৈন্যকে বিপদে ফেলে দিয়েছিল।

মুগীছ : কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমরা সে বিপদ কাটিয়ে উঠেছি।

মূসা : হ্যাঁ, এটা আল্লাহর একান্ত রহমতই বলতে হবে; কিন্তু তারিক যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, তাতে বুঝা যায়, সে সেনাপতির দায়িত্বের অনুপযুক্ত।

সেখানে সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মূসার কথাবার্তা দ্বারা বুঝতে পারেন যে, তিনি তারিককে অপসারণ করতে চাচ্ছেন। তখন আলী বললেন, আমি তো মনে করি, তারিক কোনো অদূরদর্শিতার পরিচয় দেননি।

হায়াত : আমারও তাই ধারণা। কারণ, তারিক সে সময় অগ্রযাত্রা অব্যহত না রাখলে হয়তো খ্রিষ্টানরা পাল্টা আক্রমণ করত।

মূসা : এসব আমি স্বীকার করি। তবে একথা তোমাদের মানতেই হবে যে, তারিক আমার নির্দেশের অনুসরণ করেনি।

মুগীছ : তা হয়তো ঠিক, তবে সেসময়ের অবস্থাই এরকম ছিল।

মূসা : সে যাই হোক, আমি তারিককে বরখাস্ত করছি।

তারিক : আচ্ছা তাই হোক, তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই; আমি হযরত খালিদের মতো একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসেবেই জিহাদ করতে চাই।[১১]

মূসা : আমি তোমাকে কয়েদখানায় পাঠাচ্ছি। তুমি কয়েদীর শাস্তি ভোগ করবে।

---

[১১] মহাবীর খালিদকে হযরত আবু বকর (রা.) শাম অভিযানের নেতা বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) খলিফা হয়ে মনে করলেন, খালিদ অত্যন্ত যৌবনদীপ্ত। সাধারণ মুসলমান ভাবতে পারে, খালিদের জন্যই বুঝি আমাদের জয় হচ্ছে। এজন্য তিনি খালিদকে পদ থেকে অপসারণ করেছিলেন। খালিদ তাতে কোনোরূপ ক্ষুণ্ন হননি; বরং তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন, আল্লাহর শুকরিয়া, তিনি আমার কাঁধের বোঝা হালকা দিয়েছেন। তারপর তিনি একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে জিহাদ করেন। —লেখক।

তারিক : তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ একজন মুসলমান হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, যা কিছু হয় সব আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আল্লাহর কাছে আমি কোনো অন্যায় করেছি, তাই তিনি আমাকে জেলখানায় পাঠাচ্ছেন। অথবা কোনোরকম পরীক্ষায় ফেলেছেন।

মুগীছ : একজন বীরযোদ্ধার মনে এভাবে আঘাত দেয়া হয়তো উচিত হবে না।

তারিক (মুচকি হেসে) : না, তাতে আমি কোনো দুঃখ পাচ্ছি না। আমার মনে হয় সম্মানিত আমির কোনো ভালো উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মূসা : অবশ্য তারিকের সঙ্গে আমার কোনোরূপ ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।

তারিক : আমি তা ভালো করেই জানি।

মূসা : আমি খলিফার কাছে তোমার সমস্ত ঘটনা লিখে চিঠি দিচ্ছি। সেখান থেকে জবাব এলেই আমি সে অনুসারে কাজ করব।

এরপর কয়েকজন সৈন্যের প্রহরায় তারিককে কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হলো। মূসা সমস্ত ঘটনা খলিফাকে লিখে পাঠালেন। এই ঘটনা দ্বারা খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা মূসাকে সঙ্কীর্ণমনা ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তারা লিখেছেন, মূসা তারিকের বিজয়ে হিংসার বশবর্তী হয়ে তাকে পদচ্যুত করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ তিনি এরকম হিংসাপরায়ণ হলে তারিককে সেনাপতি মনোনীত করতেন না। তা ছাড়া তাঁর মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, কোনো কারণে মুসলমানরা পরাজিত হলে এর ফল হতো অত্যন্ত ভয়াবহ। আবার তারিকের অনুসরণে অন্যরাও হয়তো আমিরের নির্দেশ অমান্য করতে প্রয়াস পেতো। সে কারণেই মূসা হয়তো তারিককে পদচ্যুত করেছিলেন।

সাতাশ. বিদ্রোহের শাস্তি

আবদুল আযীয দুহাজার মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে আসুনিয়া যাত্রা করলেন। আসূনিয়ার খ্রিষ্টানরা ঘুমন্ত মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বিশজন মুজাহিদকে শহীদ করেছিল। তাতে আবদুল আযীয অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্দীপ্ত হয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আসূনিয়ার খ্রিষ্টানরাও বুঝতে পেরেছিল, মুসলমানরা বসে থাকবে না। তারা অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে। খ্রিষ্টানরা দুর্গ প্রাচীর পুনঃমেরামত করে তারা প্রাচীরের উপর চৌকিগুলোত অধিকসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করল। দুর্গের সবগুলো ফটক বন্ধ করে দিল। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কিন্তু প্রস্তুতি শেষ হতে না হতেই একদিন আসরের সময় তারা মুসলমানদের দুর্গের দিকে আসতে দেখতে পেলো।

দূর থেকেই ইসলামি পতাকা তাদের আগমনবার্তা গোষণা করছিল। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের দেখার জন্য প্রাচীরের ওপর উঠে এলো। তারা মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম দেখে আনন্দিত হয়ে উঠল; তাদের সাহস আরও বেড়ে গেল।

খ্রিষ্টান সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সুতরাং তারা ধরেই নিল, অতি সহজেই তারা মুসলমানদের পরাজিত করে ফেলবে। দুর্গের অনতিদূরে মুসলিম মুজাহিদরা তাঁবু ফেললেন। রাত হয়ে যাওয়ায় সেদিন আর যুদ্ধ হলো না। মুজাহিদরা সারা রাত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ভোর হলে ফজরের নামায আদায় করে প্রাচীরের কাছাকাছি গিয়ে সারিবদ্ধ হযে দাঁড়িয়ে পড়নে। খ্রিষ্টানরা প্রাচীরের ওপর থেকে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। তারা ঠিক করল, মুসলমানরা প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেই তীর নিক্ষেপ করবে এবং পাথর ছুঁড়ে তাঁদের গতিরোধ করবে।

আবদুল আযীয ঘোড়ায় চড়ে মুজাহিদদের সারির মধ্যস্থলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বললেন, মুসলিম ভাইয়েরা, খ্রিষ্টানদের মনে অহমিকা আছে যে, তারা সংখ্যায় অনেক আর তাদের দুর্গটি অত্যন্ত মজবুত। তারা মনে করছে, আমরা দুর্গের কাছেও যেতে পারব না। তারা জানে না মুসলমানরা কেবল আল্লাহ্র ওপরই ভরসা করে।

খ্রিষ্টানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশজন মুসলমানকে শহীদ করেছে। যতক্ষণ না এর প্রতিশোধ নিতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শান্ত হবো ন। তাই আমি চাই,

আজই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাক। আজই দুর্গের উপর ইসলামের পতাকা স্থাপিত হোক। তোমরা সকলেই ওপরে উঠার সিঁড়িসহ প্রাচীর ভাঙ্গার সকল যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে হামলা চালাও।

মুজাহিদরা আগেই সকল সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসেছিলেন। আবদুল আযীযের কথায় তাঁরা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আবদুল আযীয জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। মুজাহিদরাও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি দিয়ে সামনে এগুতে লাগলেন। মুসলমানদের এগুতে দেখে খ্রিষ্টানরা তাদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা তীর ধনুক এবং প্রস্তর টুকরা নিয়ে ওঁৎপেতে থাকল। দু'হাজার মুজাহিদ ঢলের বেগে এগুতে লাগলেন। তাদের শুভ্র পোশাক ও উজ্জ্বল তলোয়ার সূর্যালোকে চিকচিক করছিল। প্রাচীরের নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিষ্টানরা তীর ছুড়তে থাকল। একই সঙ্গে প্রবলভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে।

মুসলমানরা আগে থেকেই এর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা ঢাল দিয়ে আড়াল করে দ্রুত এগিয়ে চললেন। খ্রিষ্টানরা বিকট চিৎকার দিয়ে মুসলমানদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মুসলমানরা এসবের কোনো পরোয়া না করে সামনে এগিযে যেতে লাগলেন। তা দেখে খ্রিষ্টানরা আরো বেশি করে প্রস্তর ও তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। এতে কিছু মুজাহিদ আহত হলেও কোনোমতেই পিছপা হলেন না। আহত সিংহের মতো আরো ক্ষিপ্ত ও বেপরোয়া হয়ে সামনে এগুতে লাগলেন। এভাবে মুসলমানদের এগুতে দেখে খ্রিষ্টানরা হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হলো এবং তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়ল।

মুসলমানরা এগুতে এগুতে প্রাচীরের কাছে চলে এলেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কেউ সিঁড়ি লাগাতে লাগলেন, আবার কেউ প্রাচীর ভাঙ্গতে শুরু করলেন। খ্রিষ্টানরা প্রাচীরের ওপরে থাকায় নিচের সঠিক অবস্থা দেখতে পেলো না; কিন্তু আওয়াজ শুনে তারা বুঝতে পেরেছিল, মুসলমানরা প্রাচীর ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন।

আল্লাহ কারো ওপর অসন্তুষ্ট হলে তার বুদ্ধি লোপ করে দেন। খ্রিষ্টানদের অবস্থাও ছিল তাই। হাতুড়ির শব্দ শুনে অফিসাররা বেশিরভাগ সৈন্য প্রাচীরের ওপর থেকে দুর্গের ভেতরে পাঠিয়ে দিল। ভিতরে এসে তারা অপেক্ষা করতে থাকল, প্রাচীর ভেঙ্গে মুসলমানরা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর আক্রমণ করবে। তারা ধারণাও করেনি, মুসলমানরা সিঁড়ি দিয়ে প্রাচীরের উঠতে পারেন। ফল এই দাঁড়ালো, মুসলমানরা সিঁড়ি দিয়ে প্রাচীরের ওপর উঠতে থাকেন। প্রাচীরটি ছিল প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু। ফলে মুসলমানরা মুখে তলোয়ার চেপে এক হাতে ঢাল ধরে অপর হাতে অতিকষ্টে ওপরে উঠে এলেন। মুসলমানরা ভেবেছিলেন, খ্রিষ্টানরা হয়তো তলোয়ার নিয়ে প্রাচীরের ওপর বসে

আছে। তাই তারা মাথায় ঢাল নিয়ে এগুচ্ছিলেন; কিন্তু খ্রিষ্টানরা অসতর্ক আর অন্যমনস্ক থাকায় মুসলমানরা সহজেই ওপরে উঠে এলেন।

মুসলমানরা প্রাচীরের ওপর উঠেই দ্রুত ওপরে থাকা খ্রিষ্টনদের ধাওয়া করলেন। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের প্রাচীরের ওপর দেখামাত্রই জিন এসে গেছে, জিন এসে গেছে বলে চিৎকার করে দৌড়াতে লাগল।

খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের জিন বলে মনে করতো। তারা বিশ্বাস করতো, মুসলমানরা যখন যেখানে ইচ্ছে হয় চলে যেতে পারে। তারা মুজাহিদদের প্রাচীরের ওপর দেখতে পেয়ে তাদের এ ধারণা আরো বদ্ধমূল হলো, মুসলমানরা জিন বলেই সিঁড়ি ছাড়া ওপরে উঠে এসছে। আসলে এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা। তারা যদি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করতো, তাহলে মুসলমানরা যাতে ওপরে উঠে আসতে না পারে সেজন্য কিছু সৈন্যকে প্রাচীরের উপর সতর্ক রাখতো। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি; ফলে মুসলমানরা অতি সহজেই ওপরে উঠে এলেন।

মুসলমানরা প্রাচীরের ওপর উঠে দৌড়ে গিয়ে খ্রিষ্টানদের উপর আক্রমণ চালালেন। তারা এতো ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ চালালেন যে, খ্রিষ্টানরা পাল্টা প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পেল না। অনেক খ্রিষ্টান মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। খ্রিষ্টানরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। তাদের অনেকে ঘাবড়ে গিয়ে প্রাচীরের উপর থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে লাগল। এভাবে অনেক খ্রিষ্টান আহত হলো। প্রাচীরের ওপর খ্রিষ্টানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হওয়ায় মুসলমানরা অতি সহজেই তাদের হত্যা করতে সক্ষম হলো। সিঁড়ির সংখ্যা খুব কম থাকা তখনো যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান উপরে উঠতে পারেনি; কিন্তু যারা উপরে উঠে এসেছিলেন তারা এতোই ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, প্রাচীরের ওপরের খ্রিষ্টানদের হত্যা করে দুর্গের ভেতর নামতে শুরু করলেন।

দুর্গের ভেতরে থাকা খ্রিষ্টানরাও প্রাচীরের ওপরে হইচই শুনতে পেলো। তারা এ-ও দেখল, অনেকে ওপর থেকে নিচে পড়ে মরছে। ফলে তারাও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। অপরদিকে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে ঘোড়ার লাগমের সাহায্যে প্রাচীর থেকে নিচে নামতে লাগলেন। খ্রিষ্টানরা ভয় পেলেও দৌড়ে এসে তাদের পথ রোধ করার চেষ্টা করল; কিন্তু মুসলমানরা জিহাদী প্রেরণায় এতোই উদ্দীপ্ত ছিলেন যে, খ্রিষ্টানদের আসতে দেখলেই সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। দুর্গের অভ্যন্তরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। উভয়পক্ষ একে অপরের ওপর হামলা চালালো। তলোয়ারের দ্রুত ওঠানামাদেখে মনে হচ্ছিল বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চারিদিকে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। খ্রিষ্টানরা হইচই করে সারা দুর্গ তোলপাড় করে তুলল।

যারা আহত হলো, তাদের চিৎকার ধ্বনি চারিদিকে ভারী করে তুলেছিল। কিন্তু মুসলমানরা নীরব থেকে দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। তাদের প্রতিটি তলোয়ার যেন যমদূতে পরিণত হয়েছিল। যারাই তাদের তলোয়ারের নাগালে আসতো মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকতো না।

খ্রিষ্টানরাও প্রবলবেগে হামলা চালাচ্ছিল। তারা চাচ্ছিল মুসলমানদের হয় হত্যা করে কমাবে নয়তো দুর্গ থেকে বের করে দেবে। কিন্তু মুসলমানদের তলোয়ার অত্যন্ত শক্তিশালী। খ্রিষ্টানদের মৃত্যুর কোলে ফেলে দিচ্ছিল। এদিকে মুজাহিদরা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বীর বিক্রমে ক্রমগত আসছেন। তাদের লক্ষ্য, ফটকের দিকে এগিয়ে গিয়ে তা খুলে দেয়া। এজন্য তাঁরা এতো তীব্রভাবে আঘাত হানছিলেন যে, খ্রিষ্টানদের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নানাদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে খ্রিষ্টানরা তখন পর্যন্ত এই আশা ছিল, তারা মুসলমানদের পরাভূত করে ফেলবে। ইতোমধ্যে আবদুল আযীযও ভেতরে চলে এলেন। তাঁর আগমনে মুজাহিদরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে মরণপণ আক্রমণ চালালেন এবং খ্রিষ্টানদের সারির পর সারি খতম করতে লাগলেন।

যারাই মুসলমানদের সামনে আসছে তারাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এভাবে একসময় খ্রিষ্টানদের মধ্যে ভীতি ও হতাশার সঞ্চার হলো। মুসলমানরা এ সুযোগে আরো জেরে হামলা চালালেন। ফলে খ্রিষ্টানরা পেছনে হটে গেল। তখন ৫০ জন মুসলমান দুর্গের ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও মুজাহিদরা সকল বাধা অতিক্রম করে ফটকের কাছে পৌঁছে গেলেন।। রক্ষীরা তাদের বাধা দেয়ার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। তাদের মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিয়ে মুসলমানরা দুর্গের ফটক খুলে দিলেন।

ফটক খোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবলবেগে মুজাহিদরা দুর্গে প্রবেশ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। ফলে দুর্গের অভ্যন্তরে আনাচেকানাচে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। খ্রিষ্টানদের সংখ্যা অনেক হওয়ার পরও মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে তাদের সকল প্রতিরোধের সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে গেল। খ্রিষ্টানদের অধিকাংশই মারা গেল। অবস্থা দেখে বাকীরাও ঘাবড়ে গেল। তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল।

আবদুল আযীয বিদ্রোহী নেতাদের শাস্তি দিলেন। সাধারণ কয়েদীদের জিযিয়ার বিনিময়ে ছেড়ে দিলেন। দুর্গের কযেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিম্মি হিসেবে নিজের সঙ্গে নিয়ে নিলেন। সেখানে দুদিন অবস্থান করে তৃতীয় দিন দু'শ মুজাহিদকে দুর্গে রেখে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

আটাশ. স্পেনের শাসক

সকল মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা তারিককেই স্পেন-বিজেতা বলে জানতেন। তারিক জাহাজে অবস্থানকালে এক রাতে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মুসলমানরা সবাই তা জানতো। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.) তারিককে স্পেন বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এছাড়া তারিককে স্পেন-বিজেতা মনে করার আরো কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত তিনি ছিলেন একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত তিনি ছিলেন একজন সাহসী বীর যোদ্ধা। তৃতীয়ত তিনি স্পেনের অধিকাংশ অঞ্চল জয় করে ফেলেছিলেন। এজন্য সকল মুসলমান তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতো, সম্মান করতো। তাঁকে কয়েদ করায় সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। অপরদিকে মূসাকেও তারা অহিংস, অত্যন্ত ভদ্র, ও সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি বলেই জানতো। তাই তারা বুঝতে পেরেছিল, তারিককে তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কয়েদ করেননি; বরং কোনো কল্যাণকর লক্ষ্যেই তাঁকে কয়েদ করেছেন। এজন্য সবাই এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন। এ ব্যাপারে সর্বাধিক ব্যথিত হয়েছিল রাহীল। সে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলো। কিভাবে তারিককে মুক্ত করা যায় সে ভেবে পাচ্ছিল না। একদিন সে তারিকের কয়েদখানায় গিয়ে উপস্থিত হলো। কয়েদখানায় যেতে কারো কোনো বাধা ছিল না। তাই রাহীলকেও কেউ বাধা দিল না।

সেখানে গিয়ে দেখেন, যিনি ছিলেন স্পেন বিজয়ের নেতা, যার নামে সমগ্র স্পেনের খ্রিষ্টান কেঁপে উঠে, যার তলোয়ারের ভয়ে সমগ্র স্পেনবাসীর মধ্যে এক প্রকার ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল সেই মহান নেতা একটি চাটাইয়ের ওপর অবনত মস্তকে বসে আছেন।

কয়েদখানায় প্রবেশ করেই উভয়ে উভয়ের দিকে অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘক্ষণ পর রাহীল ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে আফসোসের সুরে বললো, সিংহহৃদয় স্পেন-বিজেতা .....। দুঃখ আর ব্যথায় তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে এলো। মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলো না।

তারিক বললেন, মাধবী কন্যা, তুমি এই দুঃখ ব্যথায় আমার কাছে এলে কেন?

রাহীল : আপনাকে দেখতে এলাম।

তারিক : এ সমবেদনার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

রাহীল : মূসা আপনাকে অকারণে এই কয়েদখানায় পাঠালো, এটাই আমার দুঃখ।

তারিক : এতে মূসার কোনো দোষ নেই।

রাহীল : তাহলে কার দোষ?

তারিক : আমার ভাগ্যের।

রাহীল : আমার তো ধারণা, মূসা আপনার খ্যাতির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আপনাকে অপমান করেছে।

তারিক : না, এটা ঠিক নয়। আমার বিশ্বাস, কোথাও আমার ভুল হয়েছে অথবা কোনোরকম অহংকার প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই শাস্তি দিচ্ছেন।

রাহীল : আপনার প্রতি মূসার কোনো হিংসা নেই?

তারিক : নিশ্চয়ই না, একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমানের প্রতি কখনো হিংসা পোষণ করতে পারে না।

রাহীল : আপনি কি জানেন, মুসলমানরা আপনার কল্যাণকামী?

তারিক : নিশ্চয়ই জানি।

রাহীল : আপনি চাইলে তারা আপনাকে মুক্ত করে দিতে পারে।

তারিক : না, না, তা হতে পারে না।

রাহীল : কেন?

তারিক : একজন মুসলমান কখনোই আমিরের নির্দেশ অমান্য করতে পারে না।

রাহীল : তাহলে এটা ঠিক, আপনার প্রতি তাদের কোনোরকম সমবেদনা নেই।

তারিক : এটাও ঠিক নয়।

রাহীল : তাহলে আপনি মুক্তি পেতে চান না?

তারিক : নিশ্চয়ই চাই।

রাহীল : তাহলে আমি কারারক্ষীদের তোষামোদ করি। হয়তো তারা আপনাকে ছেড়ে দিতে রাজি হবে। তারপর আমরা এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যেখানে দুনিয়ার কোনো মানুষই আমাদের খোঁজ পাবে না।

তারিক : আমি তেমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, কিন্তু এরকম মুক্তি আমি চাই না।

রাহীল : তা হলে কেমন মুক্তি চান?

তারিক : আমির নিজেই যখন আমাকে ছেড়ে দেবে।

রাহীল : আমার ধারণা, তিনি কখনোই আপনাকে মুক্তি দেবেন না।

তারিক : আমার বিশ্বাস, তিনি শীঘ্রই আমাকে ছেড়ে দেবেন।

রাহীল : তাহলে আমি তাঁর কাছে আবেদন জানাবো?

তারিক : হ্যাঁ, তা হয়তো করা যায়।

রাহীল : আপনার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে?

তারিক : না।

রাহীল : তাহলে আমি চলি?

তারিক : আল্লাহ হাফেজ।

রাহীল : ঈশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।

রাহীল সেখান থেকে চলে গেল। পরদিন মূসার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মূসা জানতেন, সম্রাট রডারিক রাহীলকে জোর করে ধরে এনেছিল।। মূসা এ-ও জানতেন, এই মেয়েটিই তারিককে চব্বিশজন গথিক সম্রাটের মুকুটের সন্ধান দিয়েছিল। তাছাড়া তিনি এটাও জানতেন, তারিকের প্রতি তার সহানুভূতি রয়েছে। রাহীল তাঁর কাছে এলে তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, কী জন্য এসেছ এখানে?

রাহীল বললো, তারিকের সম্পর্কে কিছু আরজ করতে।

মূসা : যা কিছু বলার নির্দ্বিধায় বলেতে পারো।

রাহীল : আপনি তো জানেন, তারিক একজন সহৃদয়বান ব্যক্তি, মুসলিম জাতির হিতৈষী এবং আপনার অত্যন্ত অনুগত।

মূসা : নিশ্চয়ই জানি।

রাহীল : আপনি তো এটা অবগত, তারিক অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্পেন জয় করেছে।

মূসা : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানি।

রাহীল : তাঁর অতুলনীয় বীরত্ব ও আনুগত্যের এই কি প্রতিদান?

মূসা : আরে মেয়ে, তাঁকে কয়েদ করার কারণ হলো আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে আমার নির্দেশ অমান্য করা।

রাহীল : তা অবশ্য ঠিক, তবে এরও কারণ ছিল।

মূসা : তা-ও আমি জানি; কিন্তু তাঁর ওপর বার হাজার মুসলমানের জীবনের দায়দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। কোনো বিপদ হলে তাদের সবকিছুর দায়দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হতো। দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁকে জবাবদেহি করতে হতো।

রাহীল : মুসলমানরা কোনোরকম বিপদের সম্মুখীন হলে তিনি তো আর এগুতেন না।

মূসা : তা অবশ্য ঠিক। তাহলে তুমি কি বলতে চাও?

রাহীল : আমার আরজ, আপনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিন।

মূসা : আমি নিজেও চাচ্ছি, তাঁকে শীঘ্রই মুক্তি দিয়ে দেব।

রাহীল : সেটাই হবে আপনার মহানুভবতা।

মূসা আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। এমনি মুহূর্তে মুখে শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন মুসাফির এসে সালাম জানাালো। সালামের জবাব দিয়ে মূসা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোত্থেকে এসেছো? আগন্তুক জবাব দিল, দামিশক থেকে।

মূসা : তুমি কি খলিফার দরবার থেকে এসেছ?

আগন্তুক : জী হ্যাঁ।

মূসা : কোনো ফরমান নিয়ে এসেছ?

আগন্তুক : জী হ্যাঁ, মহামান্য খলিফা নিজে এই ফরমান লিখে দিয়েছেন।

একথা বলে লোকটি জামার পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে মূসার হাতে দিলেন। মূসা চিঠিখানা নিয়ে প্রথমে চুমু খেলেন। অতঃপর খুলে পড়তে লাগলেন–

মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা আল্লাহর বান্দা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাচ্যদেশীয় গভর্নর মূসা ইবনে নুসায়রের প্রতি।

হামদ ছানার পর সমাচার এই যে, স্পেন অভিযানে সফলতার জন্য আমি করুণাময় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি তাঁর অশেষ কৃপায় স্পেন থেকে অন্যায়, অবিচার ও প্রতিমা পূজা দূর করে সেখানে তাওহীদের বাণী পৌঁছানোর জন্য আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন। তারিক যা করেছে, তা কেবল জিহাদী প্রেরণায়ই করেছে। এটা তার কোনোরকম শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। সে একজন নিষ্ঠাবান মুজাহিদ এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের একজন অতীব হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁকে শীঘ্রই যথার্থ সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দাও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি তাঁকে স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত করলাম। তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও এবং যথাযথ সম্মান দেখাও। যেসব মুজাহিদ বীরত্বের সঙ্গে জিহাদ করে এ সফলতা অর্জন করেছে, আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ তাঁদের প্রেরণা ও উদ্দীপনা অটুট রাখুন এবং তাদের হেফাজত করুন। সকলের প্রতি আমার সালাম রইল।

দস্তখত এবং সীলমোহর
দামিশক।

মূসা চিঠি পড়ে মুচকি হাসলেন। তিনি সকল নেতৃস্থানীয় মুজাহিদকে ডেকে পাঠালেন। সকলে এসে উপস্থিত হলে তারিককেও ডেকে আনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, মুসলিম ভাইয়েরা! আমি তারিককে এজন্য কয়েদ করেছিলাম যে, আমি ধারণা করেছিলাম আবেগের বশবর্তী হয়ে তারিক যেভাবে এগুচ্ছিল তাতে হয়তো কোনো অঘটন ঘটতে পারতো। মুসলমানদের খুবই ক্ষতি হতো। এ ব্যাপারে আমার কোনোরকম আক্রোশ বা হিংসা কিছুই ছিল না। আজই খলিফার চিঠি এসেছে। আমি তা পাঠ করে শুনাচ্ছি। এই বলে মূসা খলিফার চিঠিটি পাঠ করে শুনালেন। তারপর তারিককে বললেন, আমি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আমায় ক্ষমা করে দাও।

তারিক বললেন, আপনার ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও আমার পক্ষ থেকে মাফ করে দিচ্ছি। আল্লাহও আপনাকে মাফ করুন। তারপর উভয়েই উভয়কে আলিঙ্গন করলেন। মূসা স্পেনের গভর্নর হওয়ায় তারিককে স্বাগত জানালেন। অন্য মুসলমানরাও তাঁকে মোবারকবাদ জানালেন। তারিকও সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। সেদিন থেকে তারিক স্পেনের আমিররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

উনত্রিশ. প্রতারক খ্রিষ্টান

আবদুল আযীয আসূনিয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে মুজাহিদদের নিয়ে টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আসূনিয়া ছিল মারশিয়া প্রদেশের অন্তর্গত। আবদুল আযীয শহরটি অধিকার করে সামনে এগুতে লাগলেন। তিনি যে শহরেই পৌঁছতেন, সে শহরের অধিবাসীরাই তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করতো। এইভাবে ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল। আবদুল আযীয দ্রুত টলেডোর দিকে অগ্রসর হলেন। পাহাড়ী টিলা পেরিয়ে তাদের পথ চলতে হচ্ছিল। একদিন পাহাড়ী একটি খাদ পেরোনোর সময় তিনি দেখতে পেলেন, কয়েকজন খ্রিষ্টান আরোহী একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুসলমানদের দেখামাত্রই তারা পালিয়ে গেল। আবদুল আযীয কয়েকজন মুজাহিদকে তাদের পিছু ধাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মুজাহিদ তাদের পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু বহুদুর গিয়েও তাদের কোনো হদিস পাওয়া গেল না। অবশেষে মুসলমানরা ফিরে এলেন।

আবদুল আযীয সতর্ক হয়ে গেলেন। খ্রিষ্টানদের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখলেন। সন্ধ্যায় একজন খ্রিষ্টানের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মুজাহিদরা তাকে ধরে আবদুল আযীয়ের সামনে উপস্থিত করলেন। আবদুল আযীয একজন দোভাষীর সাহায্যে তাকে জেরা করলেন।

আবদুল আযীয : তুমি কে?

খ্রিষ্টান : আমি একজন খ্রিষ্টান।

আবদুল আযীয : তুমি কোথায় থাক?

খ্রিষ্টান : অরিহিউলা শহরে।

আবদুল আযীয : শহরটি এখান থেকে কতদূর?

খ্রিষ্টান : কাছেই।

আবদুল আযীয : দুর্গাধিপতির নাম কী?

খ্রিষ্টান : থিওডমির।

আবদুল আযীয জানতে পেরেছিলেন, তারিকের সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয়েছিল থিওডমিরের সঙ্গে এবং সে ইসমাঈলকে গ্রেফতার করেছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, থিওডমির কি দুর্গের ভেতরে আছে?

খ্রিষ্টান : জী না।

আবদুল আযীয : তবে কোথায়?

খ্রিষ্টান : সেই পাহাড়ের ওপর।

আবদুল আযীয : সৈন্যরাও তার সঙ্গেই আছে।

খ্রিষ্টান : জী হ্যাঁ।

আবদুল আযীয : সে কি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়?

খ্রিষ্টান : সে সম্মুখ যুদ্ধে আসতে চায় না।

আবদুল আযীয : তাহলে?

খ্রিষ্টান : তার ইচ্ছা, পাহাড়ের আড়াল থেকে আতর্কিত আপনাদের ওপর হামলা চালাবে অথবা আপনাকে ...

আবদুল আযীয : অথবা আমাকে মেরে ফেলবে, এই তো?

খ্রিষ্টান : জী হ্যাঁ।

আবদুল আযীয : তার সৈন্য সংখ্যা কত হবে?

খ্রিষ্টান : তিন-চার হাজার হতে পারে।

আবদুল আযীয : তাহলে আমাদের কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়ে আছে।

খ্রিষ্টান : ওরা আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই এগুচ্ছে।

আবদুল আযীয : এসব জানানোর জন্য তোমাকে অনেক শুকরিয়া।

খ্রিষ্টান : হুজুর কি আমার নিরাপত্তা দিচ্ছেন?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ, তোমাকে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমরা নিরাপত্তা দিচ্ছি।

খ্রিষ্টান : আমি হুজুরের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আবদুল আযীয : তুমি এখন কি করতে চাও?

খ্রিষ্টান : আপনারা এখন যে পথ দিয়ে যাচ্ছেন, তা অত্যন্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর।

আবদুল আযীয : কেমন ভয়ঙ্কর?

খ্রিষ্টান : এই পথটি অত্যন্ত নিচু ও ঢালু, এর উভয় পার্শ্বে উঁচু উঁচু পাহাড়।

আবদুল আযীয : এতে আমাদের কি ক্ষতি হবে?

খ্রিষ্টান : থিওডমির সৈন্যদল নিয়ে টিলার ওপর ওঁৎ পেতে আছে। সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা আপনাদের ওপর হামলা করবে।

আবদুল আযীয : তাহলে এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প রাস্তা আছে কি?

খ্রিষ্টান : জী হ্যাঁ।

আবদুল আযীয : তুমি চেনো?

খ্রিষ্টান : নিশ্চয় চিনি।

আবদুল আযীয : তাহলে দয়া করে তুমি আমাদের নিয়ে চলো।

খ্রিষ্টান : তাহলে চলুন।

খ্রিষ্টান লোকটি আগে আগে এগিয়ে চলল। মুজাহিদরা তার পেছনে যেতে লাগল। যে পথ দিয়ে তারা যাচ্ছিল, সেটি অত্যন্ত কষ্টকর। তা ছাড়া পথটি খুবই সংকীর্ণ ও অসমতল। সে পথ দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগুতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আবদুল আযীয ধারণা করেছিলেন, সামনের পথ হয়তো সমতল ও প্রশস্ত হবে; কিন্তু যতই সামনে যাচ্ছিলেন, ততই দুর্গম পথের সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

আবদুল আযীযের মনে কিছুটা সন্দেহের উদয় হলো। তিনি খ্রিষ্টানটিকে জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তা তো দেখছি ক্রমেই দুর্গম ও সংকীর্ণ হচ্ছে।

খ্রিষ্টান : আর একটু সামনে গেলেই আমরা প্রশস্ত রাস্তা পাওয়া যাবে।

আবদুল আযীয : সে রাস্তা আর কতদুর?

খ্রিষ্টান : বড়জোর এক মাইল।

আবদুল আযীয : তাহলে কয়েকজন মুজাহিদ পাঠিয়ে দেখে নিই তারপর ...

তাঁর কথা শেষ না হতেই খ্রিষ্টানটি বলল, তার কী প্রয়োজন।

আবদুল আযীয তার চোখে চোখ রেখে বললেন, কারণ আমার সন্দেহ হচ্ছে। সন্দেহ হচ্ছে? খ্রিষ্টান লোকটি কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। তার মুখের অবস্থা দেখে আবদুল আযীযের মনে সন্দেহ আরও গাঢ় হলো। তিনি বললেন, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আমাদেরকে প্রতারণা করার জন্য এদিকে নিয়ে এসেছ। শুনে রাখ প্রকৃতপক্ষেই তুমি যদি আমাদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে এসে থাক, তাহলে তোমার শেষ মুহূর্ত অতি নিকটে। তুমি নিজেই নিজের বিপদ জালে জড়াচ্ছ। খ্রিষ্টানটি আরো ঘাবড়ে গেল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনাকে প্রতারণা করে আমি কি নিজের মৃত্যু ডেকে আনব? আপনি বিশ্বাস রাখুন, আমি প্রশস্ত রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছি।

আবদুল আযীয : আচ্ছা, আমি বিশ্বাস করলাম।

খ্রিষ্টান : পথ দেখার জন্য কাউকে পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

আবদুল আযীয : এটা আমার দায়িত্ব। আমি আমার সৈন্যদলকে আর এক কদমও এগুতে দিতে পারি না।

এই বলে তিনি সৈন্যদলকে থামতে নির্দেশ দিলেন। কয়েজনকে রাস্তা দেখার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে খ্রিষ্টানটি অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করল। বিষয়টি আবদুল আযীয আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কয়েদ করার নির্দেশ দিলেন। তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছে। সে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে মিনতি

করল, আমাকে দয়া করুন হুজুর। আবদুল আযীয তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্বীকার করে নাও, আমাদের সঙ্গে তুমি প্রতারণা করছ।

খ্রিষ্টান : জী হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, কিন্তু কেন যে এমন করলাম!

আবদুল আযীয : কেন এমন করলে?

খ্রিষ্টান : থিওডমির আমাকে লোভ দেখিয়েছিল।

আবদুল আযীয : সে তোমাকে কী বলেছিল।

খ্রিষ্টান : সে বলেছিল, আমি যদি মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে সেই উঁচু টিলার নিচে নিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাকে উরবোলা শহরের পরিদর্শক বানাবে।

আবদুল আযীয একথা শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, দুর্ভাগা খ্রিষ্টান! তুমি জানো না যে, আল্লাহ নিজেই মুসলমানদের সাহায্য করেন। দুনিয়ার কোনো শক্তিই মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারে না।

খ্রিষ্টান : এটা আমার নির্বুদ্ধিতা হুজুর। আমায় দয়া করুন হুজুর!

আবদুল আযীয তখন আর কিছু বললেন না, ইতোমধ্যে পথ দেখার জন্য যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল, তারাও ফিরে এসে জানালো, পথ সামনে অত্যন্ত কষ্টকর। টিলার ওপর খ্রিষ্টান সৈন্যরা ঘুরাঘুরি করছে। খ্রিষ্টান লোকটি বলল, আমি নিকটবর্তী একটি পথের সন্ধান জানি হুজুর! আবদুল আযীয অত্যন্ত কর্কশ সুরে বললেন, এখনো কি আমরা তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

খ্রিষ্টান : আমি আর ধোঁকা দিবে না হুজুর!

আবদুল আযীয : তাহলে নিয়ে চল।

খ্রিষ্টান লোকটি সকলকে নিয়ে একটি পাহাড়ে উঠে এলো। পাহাড়টি যদিও খুব উঁচু হলেও এর ঢালু পথ বেয়ে চলা তেমন কষ্টকর ছিল না। সেখান থেকে তাঁরা দেখতে পেলেন, অপর আর একটি টিলায় খ্রিষ্টান সৈন্যরা পাথরের ওপর বসে আছে। তারা মুসলমানদের দেখামাত্রই টিলার অপর পার্শ্বে লুকিয়ে গেল। মুসলমানরা অপর পথ বেয়ে একটি প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে পৌঁছলেন। এমন সময় সন্ধ্যা হয়ে গেল। মুসলমানরা মাগরিবের নামায আদায় করলেন। তাঁবু ফেলে রাতের খাবার তৈরি করতে লাগলেন। ইশার নামায পড়ে রাতের খাবার গ্রহণ করলেন। কিছুসংখ্যক মুজাহিদকে পাহারায় মোতায়েন করে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ তারা কোনো কিছুর শব্দ শুনতে পেলেন। মুজাহিদরা সে শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ ঘুম থেকে উঠে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

ত্রিশ. অপর এক বিজয়

এসময় সুবহে সাদিক হয়ে এলো। কিন্তু দিনটি মেঘলা। আকাশে ঘন কালো মেঘ। প্রবল বেগে বাতাস বইছে। সেসময় মুজাহিদরা ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তারা কিছু ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেলেন। প্রহরীরা এসে জানালেন, খ্রিষ্টান সৈন্যরা এসে গেছে; কিন্তু তাদের সংখ্যা কত তা বুঝা যাচ্ছে না। আবদুল আযীয বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমে নিকটবর্তী হতে লাগল। বাতাসের গতিও কিছুটা বেড়ে গেছে। মুসলমানদের ঢিলেঢালা জুব্বা ও মাথার লম্বা পাগড়ী বাতাসে উড়ছে। কখনো কখনো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মুজাহিদরাও ধীরে ধীরে শব্দ লক্ষ্য করে এগুতে লাগলেন। কিছুদূর এগুতে না এগুতেই খ্রিষ্টান সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। সবার আগে থিওডমির। সে উচ্চস্বরে বলল, মুসলিমগণ! ভালো চাও তো অস্ত্র ফেলে দাও। আবদুল আযীয় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, যারা প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাদের আবার বাহাদুরি?

থিওডমির : আমার সৈন্যদলের দিকে তাকিয়ে দেখো।

এই বলে সে তার বিরাট সৈন্যদলের প্রতি ইঙ্গিত করে। মুসলমানরা দেখলেন, তার সৈন্যের সারি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, যেন দূরবর্তী পাহাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। আবদুল আযীয বললেন, সৈন্যের আধিক্যের উপর গর্ব করো না। তোমাদের জন্য কল্যাণকর হলো সন্ধি করা।

থিওডমির : জীবন থাকতে সন্ধি করবো না।

আবদুল আযীয : তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

থিওডমির : কার মৃত্যু আসছে, এখনই তা বুঝতে পারবে।

একথা বলেই সে পেছনে সরে গিয়ে সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিল আক্রমণ করতে। তার নির্দেশমতো সৈন্যরা তলোয়ার বের করল। মুসলমানরাও তলোয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে গেলেন। শুরু হলো মরণপণ যুদ্ধ। প্রকৃতি নীরব, নির্বাক। ধীরে ধীরে শোরগোল বাড়তে লাগল। যুদ্ধ ক্রমে উত্তপ্ত হতে লাগল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। প্রত্যেকেই একে অপরকে দেখতে পেলো। খ্রিষ্টানদের সৈন্য সংখ্যা চার হাজারের অধিক। অপরপক্ষে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র পৌনে দুই হাজার। মুজাহিদদের সংখ্যা কম দেখেই তারা যুদ্ধে উৎসাহিত হয়েছে। এইজন্য অত্যন্ত উৎসাহের

সাথে তারা হামলা চালাচ্ছিল এবং দ্রুত তলোয়ার সঞ্চালন করছিল। মুসলমানরাও অত্যন্ত ক্ষিপ্ত গতিতে হামলা চালাচ্ছিলেন। মুসলমানদের আক্রমণের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তারা খ্রিষ্টানদের অস্তিত্বকেই স্বীকার করছে না। তাঁরা চেষ্টা করছে, যথাশীঘ্র সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্র খালি করবে।

মুসলমানরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। উভয় দলের মধ্যে তুমুল আবেগ-উদ্দীপনা বিদ্যমান থাকায় ভীষণ লড়াই চলছে। তলোয়ারের আঘাতে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে ঘোড়ার পায়ের আঘাতে সেগুলো দলিত মথিত হয়ে যাচ্ছে। পূর্বাকাশে সূর্য উঠে গেছে। কিন্তু আকাশ কালো মেঘে ঢাকা থাকায় তখনো কিছুটা অন্ধকার রয়ে গেছে। যুদ্ধের গতি প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। একদল অন্যদলের মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চতুর্দিকে শুধু তলোয়ারের ঝনঝনানির শব্দ এবং তলোয়ারের দ্রুত উঠানামার দৃশ্য। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের এবং মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের হত্যা করার এক নিদারুণ প্রয়াস চলছে। খ্রিষ্টানরা এতো সাহসিকতার সঙ্গে আগে কখনো লড়েনি। জীবন বাজি রেখে তারা যুদ্ধ করে চলছে; কিন্তু অগ্রগতি হতাশাব্যঞ্জক। মুসলমানদের সামনে তারা কিছুতেই টিকতে পারছে না।

খ্রিষ্টানরা হইচইচ এ অভ্যস্ত হলেও আজকে তারা সম্পূর্ণ নীরব। তবে কখনো কখনো তাদের জাতীয় শ্লোগান দিচ্ছে। আহতরা আহাজারি করছে এবং ভয়ঙ্কর শব্দে চিৎকার করে মারা যাচ্ছে। তাদের এই চিৎকার ধ্বনি অদূরবর্তী পাহাড়ে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হঠাৎ বাতাসের গতি আরো বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে, হয়তো কোথাও বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কিন্তু সৈন্যদের সেসবের কোনো পরোয়া নেই। তারা শুধু লড়েই চলেছে। থিওডমির পাহাড়ী খ্রিষ্টানদের যুদ্ধে নিয়ে এসেছে। এরা অত্যন্ত সাহসী ও বিলাস বিমুখ। তারা কেবল প্রতিরোধই করছে না; বরং পাল্টা আক্রমণও করছে। অধিক হারে খ্রিষ্টানরা মারা যাচ্ছে, আবার অনেক মুসলমানও শাহাদাতবরণ করছেন। মুসলমানরা মনে করেছিলেন, সাধারণ খ্রিষ্টানদের মতো তাদেরও সহজেই পরাজিত করা যাবে; কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তাদের পরাজিত করা সহজসাধ্য নয়। তাই তাঁরা অত্যন্ত বীর বিক্রমে হামলা চালালেন; কিন্তু খ্রিষ্টানরাও একই গতিতে যুদ্ধ করছে। আবদুল আযীয এক হাতে ঢাল, অপর হাতে তলোয়ার এবং বাহুতে পতাকা গুঁজে বীরবিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন। তিনি যেদিকে ধাবিত হচ্ছেন, সে দিকে মরদেহের স্তূপ পড়ে যাচ্ছে। যে সারিতে প্রবেশ করছেন তা সাফ করে ফেলছেন। তাঁর তলোয়ার ছিল অত্যন্ত ধারালো ও বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন। যে ঢালের উপর আঘাত হানছেন তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছেন। যে বর্শায় আঘাত করছেন, তা টুকরা টুকরা করে

দিচ্ছেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুদানব, যেদিকেই যাচ্ছে সংহার ক্রিয়া সেদিকেই পরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

আবদুল আযীযের ধারণা ছিল, সকল মুসলমানই তাঁর মতো ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধ করছে। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন, মুসলমানরা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে। তখন সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, মুসলিম ভাইয়েরা! একি ভীরুতা যে, তোমরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছ না, তোমরা কেন যুদ্ধকে দীর্ঘতর করছ? এগিয়ে যাও, বীর বিক্রমে যুদ্ধ করো, শত্রুদের খতম করো। এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে নব উদ্দীপনায় হামলা চালালেন। অন্য মুজাহিদরাও তেজোদ্দীপ্ত হয়ে খ্রিষ্টানদের ওপর আক্রমণ চালালেন। এ আক্রমণে দেখা গেল, প্রত্যেক মুজাহিদ কমপক্ষে একজন খ্রিষ্টানকে খতম করছেন। ফলে খ্রিষ্টানদের বহু সৈন্য মারা গেল। এবার খ্রিষ্টানদের মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। আবদুল আযীয আবার বললেন, মুজাহিদগণ! আরেকবার অনুরূপ আক্রমণ করো, যেমনটি ইতোমধ্যে করেছ। বীরত্বের সঙ্গে হামলা চালাও। আরেকটি আক্রমণেই তাদের নির্মূল করে দাও। মুজাহিদরা আবারও প্রবল আক্রমণ করলেন; খ্রিষ্টানরাও তা প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করলো। তারা ঢাল দিয়ে মুসলমানদের তলোয়ারের আঘাত ঠেকাতে চেষ্টা করল; কিন্তু অবস্থা এমন হলো যে, অনেকেরই ঢাল দ্বিখণ্ডিত হয়ে মস্তকে গিয়ে তলোয়ারের আঘাত হানলো। এতে তারা আহত হয়ে এমনভাবে নিচে পড়ে গেল যে আর উঠতে পারল না। অনেকে বাঁচার জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গেল; কিন্তু ঘোড়ার পায়ের আঘাতে তারাও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। ফলে পর পর দুটি আক্রমণে এতো বেশি সংখ্যক সৈন্য নিহত হলো যে, কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধেও অনুরূপ হয়নি। অতএব খ্রিষ্টানদের মনে এমন ভয়ের সৃষ্টি হলো, তারা সাক্ষাৎ মৃত্যুকে তাদের সামনে দেখতে পাচ্ছে। ফলে তাদের আর যুদ্ধ করার সাহস রইল না; কিন্তু তখন পর্যন্ত তাদের নেতা যুদ্ধরত থাকায় তারাও কোনোমতে আক্রমণ প্রতিরোধ করে চলল। প্রায় তিন হাজার খ্রিষ্টান নিহত হয়েছে। তাদের মরদেহ এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মাটি পাথুরে হওয়ায় নিহতদের রক্ত মাটি শুষে নিতে পারছিল না। ফলে রক্তের স্রোত বয়ে চললো। সারা ময়দান লাল হয়ে গেলো।

মুজাহিদরা তৃতীয়বারের মতো হামলা করলেন। এটা ছিল প্রথম দুটির চাইতে আরো তীব্রতর। মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের শস্য ও খিরার মতো কাটতে লাগলেন। তাদের মৃতদেহে স্তূপ জমে গেল। রক্তের স্রোত বইতে লাগল। অবস্থা এমন হলো যে, মুসলমানরা ধীরে ধীরে তাদের হত্যা করতে লাগলেন। খ্রিষ্টানরা

হতভম্ব হয়ে সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়ল। তারপর দেখা গেল, কেবল দু'শ খ্রিষ্টান সৈন্য অবশিষ্ট রয়েছে। তারা দ্রুত লাশের স্তূপ ডিঙ্গিয়ে পড়িমরি করে পালালো। মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করলে আরো একশ নিহত হলো। বাকীরা কোনোমতে আত্মরক্ষা করে পাহাড়ের বিভিন্ন গর্তে গিয়ে আত্মগোপন করলো। থিওডমিরও পালিয়ে বাঁচল।

মুসলমানরা ফিরে এলেন। কেউ কেউ মৃত খ্রিষ্টানদের ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে লিপ্ত হলেন। আবার কেউ কেউ তাঁবু তুলে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রটি 'লোকতরাস' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই যুদ্ধের জন্য স্থানটি আজো ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানরা অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র গুটিয়ে টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। খ্রিষ্টানটি তাঁদের পথ দেখিয়ে অরিহিউলা দুর্গে নিয়ে গেল। এই দুর্গটিই সে অঞ্চলের রাজধানী। সেখানে থিওডমির অবস্থান করত। আবদুল আযীয বুঝতে পেরেছিলেন; থিওডমির সে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। সে হয়তো দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুসলিম সৈন্যদল সেখানে গিয়েই দুর্গ অবরোধ করেন। মুজাহিদরা যুদ্ধ করে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ায় দুর্গের চারিদিকে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকলেন।

একত্রিশ, সুন্দরীদের আনন্দ

তারিককে কয়েদ করার সংবাদ শুনে মানুষ যত ব্যথিত হয়েছিল, তাঁর মুক্তির সংবাদ শুনে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আনন্দিত হলো। প্রায় সকলেই মুক্তির সংবাদ পেয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। প্রকৃতপক্ষে তারিক যেমন ছিলেন সাহসী যোদ্ধা, তেমন ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তিনি সকলেরই সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এজন্য সবাই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কয়েদ করে মূসা প্রাসাদের যে কামরায় তাঁকে রেখেছিলেন মুক্তি পেয়েও তিনি সেখানেই ফিরে গেলেন।

তারিক ছিলেন উত্তর আফ্রিকার বার্বারের অধিবাসী। মূসা সেখানে সৈন্য প্রেরণ করলে তারিক স্বদেশের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, সে যুদ্ধেও অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বার্বার বাহিনীর পরাজয়ের পর তারিক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি মূসার দাসরূপে নীত হলেন। কিছুদিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। মূসা তখন তাঁকে আযাদ করে দিয়ে সামরিক বাহিনীর অফিসার পদে নিযুক্ত করেলেন। সেখান থেকে নিজের যোগ্যতা বলে তিনি তানজার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলন। পরে স্পেনে অভিযান প্রেরণের প্রয়োজন হলে তাঁকে সে অভিযানের নেতা নিযুক্ত করা হয়। আল্লাহর অশেষ কৃপায় নিজ বীরত্ব বলে তিনি স্পেন জয় করতে সক্ষম হন। অতঃপর মূসা কর্তৃক বন্দী হয়ে আল্লাহর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। তিনি সাধারণ মানুষ হলে হয়তো আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করতেন অথবা মূসা ও মুসলমানদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে মুরতাদ হয়ে যেতেন; কিন্তু কারো প্রতি তিনি কোনো অভিযোগ করেননি; বরং নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্পেনের গভর্নর বানিয়ে দিয়েছেন। যিনি একজন সাধারণ সেনাপতি রূপে স্পেনে এসেছিলেন। তিনি আজ সে দেশের গভর্নরের মহা সম্মানে ভূষিত। আসরের নামায পড়ে তিনি কামরার বাইরে এসে বসলেন। অল্প সময় পরই রাহীল সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তখন তার পরনে অনেক মূল্যবান পোশাক। সে স্মিত হাসছিল। তারিকের কাছে এসেই সে বললো, আসসালামু আলাইকুম হে স্পেনের গভর্নর! তারিক তাকিয়ে দেখলেন, রাহীল হাসছে। তার সমস্ত চেহারায় গভীর আনন্দের ছাপ। তার উজ্জ্বল চোখ দুটো ছলছল করছে। এ সময় রাহীলকে আরো সুন্দরী দেখাচ্ছিল। তারিক তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, এসো সুন্দরী, এখানে বসো। রাহীল তার পাশে বসতে বসতে বললো, আমি কি সুন্দরী?

তারিকের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি একদৃষ্টিতে রাহীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একে তো রাহীল পরমা সুন্দরী, দ্বিতীয়ত তার পরনে অনেক মূল্যবান পোশাক ও নানা প্রকার অলঙ্কার; তৃতীয়ত তার পরিধেয় কাপড়ে এমন সব মূল্যবান সুগন্ধী ছিটিয়েছে, যেন তার শরীরটিই একটি সুগন্ধী দ্রব্য। এসব কারণে তাকে সৌন্দর্যের প্রতিমা বলে মনে হচ্ছে। তারিক মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কোনো কথাই যেন তাঁর কানে যাচ্ছিল না। অনেক্ষণ অপেক্ষা করে রাহীল জিজ্ঞেস করলো, কী দেখছেন অমন করে?

তারিক তার দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহর কুদরতের খেলা দেখছি। রাহীল আড়চোখে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বললো, এখানে খেলার কী হলো?

তারিক : আমি হয়তো ভুল করে খেলা বলে ফেলেছি।

রাহীল (হেসে ফেলে) : আপনি এমন বেঁহুশ হয়ে গেলেন কি করে?

তারিক : তোমার মতো সুন্দরীকে দেখে কারো কি হুঁশ থাকতে পারে?

রাহীল লজ্জা পেয়ে গেল। লজ্জায় আনত চোখ দুটি আরো সুন্দর মনে হলো।

তারিক বললেন, তুমি যেমন সুন্দরী তোমাকে দেখে কারো পক্ষেই ঠিক থাকা সম্ভব নয়।

রাহীল চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারিক আবার বললেন, তোমাকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রাহীল লাজনম্র মুখ তুলে বললেন, কেন?

তারিক : কারণ কয়েদী অবস্থায় তুমি আমাকে সমবেদনা জানিয়েছিলে।

রাহীল হঠাৎ বলে ফেললো, কেন, আমি কি সমবেদনা জানাতে পারি না?

একথা বলেই সে আবার লজ্জা পেয়ে গেল।

তারিক : তুমি কেন সমবেদনা জানিয়েছিলে?

রাহীল : মানবতার খাতিরে ...

তার কথা শেষ হতে না হতেই তারিক বললেন, কেবলই মানবতার খাতিরে?

রাহীল : তাছাড়া আপনি আর কী বুঝেছেন?

তারিক : আমি বুঝে গেছি, এক বিদেশীর প্রতি তোমার ভালোবাসা জন্মেছে।

রাহীল তার দিকে তাকিয়ে বললো, ভালোবাসা!

তারিক আদরের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। তবে পরিতাপের বিষয়, আমার ধারণা মনে হয় মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

রাহীল : আমার প্রতি কি আপনার ভালোবাসা আছে?

তারিক : হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করছি।

রাহীল : তা কি অটুট থাকবে?

তারিক : ইনশাআল্লাহ।

রাহীল : আপনি কি আমাকে এর যোগ্য মনে করেন?

তারিক : তোমার প্রথম দৃষ্টিই আমার হৃদয় মনকে উজাড় করে নিয়েছিল। রাহীলের চেহারা খুশিতে লাল হয়ে গেল। সে বললো, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।

তারিক : কীসের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জানাচ্ছ?

রাহীল : এজন্য যে, এক ইহুদি নারীর প্রতি আপনার ভালোবাসা আছে।

তারিক (আবেগে আপ্লুত হয়ে) : হ্যাঁ ভালোবাসি। মৃত্যু পর্যন্ত এ ভালোবাসা অটুট থাকবে।

রাহীল : আমারও।

তারিক : তুমিও কি আমায় ভালোবাস রাহীল?

রাহীল : হ্যাঁ।

রাহীল আবারও লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলো। তারিক কিছু বলতে চাচ্ছিলেন এমন সময় তাদের কানে এলো–

‘ভালোবাসার স্বীকৃতি হলো সারা
তুমি তার আর সে তোমার।’

দুজনেই চোখ তুলে দেখতে পেলেন, নায়লা আর বিলকিস এদিকেই আসছে। নায়লা মূসার সঙ্গে আর বিলকিস ইসমাঈল ও মুগীছের সঙ্গে টলেডো এসেছিল। তখন থেকে তারা সেখানেই অবস্থান করছে। এ দুজন রমণীর সঙ্গেও রাহীলের পরিচয় ছিল। তারিক তাদের চিনতেন না। রাহীল তাদের দেখে লজ্জা পেয়ে গেল । তারা উভয়েই তারিকের সামনে রাহীলের পাশে গিয়ে বসলো।

নায়লা তারিককে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার মুক্তির জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিলকিস মুচকি হেসে বললো, আমিও।

তারিক : আমি দুজনকেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রাহীল মাথা তুলে চিত্তাকর্ষক দৃষ্টিতে তারিকের দিকে তাকিয়ে বললো, তাদের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি হচ্ছেন স্পেনের রানি, সম্রাট রডারিকের স্ত্রী নায়লা আর ইনি কর্ডোভার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমামনের সাধ্বী কন্যা বিলকিস।

তারিক : আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি, ইনি হলেন ‘সুন্দর হার পরিহিতা রমণী’।

রাহীল : হ্যাঁ সারা দেশে তিনি এ নামেই পরিচিতা।

নায়লা : হ্যাঁ, তিনিই সেই কুমারী।

তারিক : ইনি ইসমাঈলকে কোথায় রেখে এসেছেন?

নায়লা (একটু মুচকি হেসে) : তাকেই জিজ্ঞেস করুন না।

বিলকিস : তিনি টলেডোতেই আছেন।

তারিক : আল্লাহর বহুত শুকরিয়া। তোমরা ছাড়া পেলে কেমন করে?

নায়লা সব ঘটনা খুলে বললে তারিক অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বিলকিসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি টলেডো এলে কেন? বিলকিস কিছু না বলে লজ্জায় মুখ ঢাকলেন। নায়লা বললেন, ইসমাঈলের প্রতি হৃদয়ের টান তাকে এখানে টেনে এনেছে। তারিক তখন নায়লার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আমি তো শুনেছিলাম, আপনি টায় চলে গেছেন। এখন এখানে এলেন কী করে?

এবার নায়লা লজ্জায় মুখ ঢাকলেন। বিলকিস বলে উঠল, আবদুল আযীযের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ তাকে অস্থির করে তুলেছে। তাই তিনি এখানে চলে এসেছেন।

তারিক : তাহলে তো বলতেই হয় ...

রাহীল তাঁর দিকে তাকাতেই তারিক কথা বন্ধ করে ফেললেন। রাহীল বললেন, ঠিক আছ, আপাতত চুপ থাকুন। নাহয় তারা আমাদের সম্পর্কেও বলবে। নায়লা স্মিত হেসে বললেন, স্পেনের শাসককে তো খুব করে শাসাচ্ছ দেখছি।

রাহীল তারিককে বললো, শুনলেন তো?

বিলকিস হেসে বললেন, বাড়িয়ে তো কিছু বলেননি।

সূর্য ডুবে গেলে তারিক মাগরিবের নামায আদায়ের জন্য চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, দয়া করে রাহীলকে ক্ষেপাবেন না।

নায়লা এবং বিলকিস হেসে ফেললেন। নায়লা বললেন, আল্লাহর কী কুদরত যে আপনাকে তার ...!

তারিক মুচকি হেসে চলে গেলে এই তিন রমণী খোশগল্পে মেতে উঠলেন।

বত্রিশ. থিওডমিরের চালাকি

আবদুল আযীয মুজাহিদদের আরামেই রাত কাটালেন। খ্রিষ্টানরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে রাতের অন্ধকারে যাতে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য আবদুল আযীয পাহারা মোতায়েন করেছিলেন। মুজাহিদরা ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেন। মুজাহিদরা প্রাচীরের নিকটবর্তী হতে না হতেই খ্রিষ্টান সৈন্যরা প্রাচীরের ওপর এসে জড়ো হলো। তখনো মুসলমানরা প্রাচীর থেকে অনেক দূরে ছিল। আবদুল আযীয ভেবে পেলেন না, এতো সৈন্য থাকা সত্ত্বেও থিওডমির এতো অল্প সৈন্য নিয়ে কেন যুদ্ধে গিয়েছিল। প্রাচীরের চারিদিকজুড়ে যেসব সৈন্য দেখা যাচ্ছে তাতে খ্রিষ্টান সৈন্যের সংখ্যা দশ পনেরো হাজারের কম হবে না। এটাও বিস্ময়ের ব্যাপার, খ্রিষ্টান সৈন্যরা হাতে তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আক্রমণ করছে না। মুজাহিদরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, খ্রিষ্টান সৈন্যরা আক্রমণের সূচনা করবে; কিন্তু খ্রিষ্টান সৈন্যদের আক্রমণের কোনো ভাব লক্ষ্য করা গেল না। মুজাহিদরা ভাবলেন, হয়তো তাঁরা সামনে অগ্রসর হলেই খ্রিষ্টানরা উপর থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপ শুরু করবে। কিছুক্ষণ পর আবদুল আযীয তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরাও তাকবীর দিলেন। চারিদিকে মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। মুজাহিদরা চতুর্দিক দিয়ে একই গতিতে এগুতে লাগলেন। আবদুল আযীয উত্তর দিকে অবস্থিত দুর্গের ফটকের দিকে এগুতে লাগলেন। দক্ষিণ দিকে উসমান, পশ্চিম দিকে হাবীর ইবনে উবায়দা এবং পূর্ব দিকে ইদরীস ইবনে মায়সার। এই তিনজনই অসীম সাহসী ও বিচক্ষণ যোদ্ধা। তাঁরা বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জয়লাভ করেছেন। আবদুল আযীয সবার আগে প্রাচীরের কাছে পৌঁছার আশায় আগে আগে চলছেন। খ্রিষ্টানরা তা দেখে হইচই শুরু করে দিল; কিন্তু কোনো আক্রমণ করল না। মুসলমানরা সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুতে লাগলেন। প্রত্যেক মুজাহিদ ঢাল দিয়ে নিজেকে ও বাহনকে আড়াল করে সামনে যেতে লাগলেন।

আবদুল আযীয ঘোড়ায় আরোহণ করেছেন। তাঁর এক হাতে ইসলামি পতাকা আরেক হাতে তলোয়ার। তাঁর পেছনে সকল মুজাহিদ সারিবদ্ধভাবে এগুচ্ছেন। আবদুল আযীযের দৃষ্টি দুর্গের ফটকের প্রতি নিবদ্ধ। তার চিন্তা, ফটকের কাছে

গিয়ে তা ভাঙ্গার চেষ্টা করবেন। কাছে যেতেই ফটক খুলে গেল। পাদরির পোশাক পরিহিত এক বৃদ্ধ সাদা পতাকা হাতে বেরিয়ে এলো।

মুসলমানরা বুঝতে পারলেন, পাদরিটি দুর্গবাসীদের দূত। তাকে দেখেই আবদুল আযীয থেমে গেলেন। তাঁকে থামতে দেখে অন্য মুজাহিদরাও থেমে গেলেন। বৃদ্ধ দূত ঘোড়ায় চড়ে সাদা পতাকা তুলে এগিয়ে আসছে। বৃদ্ধটি আবদুল আযীযের কাছে এসে আরবি ভাষায় বলল, আমি একজন দূত। আপনাদের নেতা আবদুল আযীযের সাথে আলোচনা করতে চাই। আবদুল আযীয বললেন, আমি আপনার সমানেই উপস্থিত। বলুন কী বলতে চান।

দূত : আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

আবদুল আযীয : আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

দূত : মনে হয়, আপনি মুসলিম সৈন্যদলের নেতা। যার নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যরা দুর্গ ঘিরে রেখেছে।

আবদুল আযীয : হ্যাঁ, তোমার ধারণা সত্য।

দূত : মেহেরবানি করে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ও আপনার মধ্যে আলোচনা চলে আপনার সৈন্যদলকে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে বলুন।

আবদুল আযীয : হ্যাঁ তাই হবে।

দূত : তাহলে মেহেরবানি করে সৈন্যদলকে নির্দেশ দিন।

আবদুল আযীয ততক্ষণাৎ তিনজন মুজাহিদকে এই বলে পাঠান, প্রত্যেক সৈন্য যেখানে আছে, সেখানেই যেন অপেক্ষা করে। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন সামনে কিংবা পেছনে না যায়। তারপর তিনি দূতকে বললেন, বলো, তুমি কী বলতে চাও?

দূত : সর্বপ্রথম আর্জি এই যে, দুর্গবাসীদের পক্ষে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে এসেছি। আমাকে সন্ধির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যেসব শর্ত আমাদের জন্য উপযোগী মনে করব, সেসবের ভিত্তিতে আমি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করব।

আবদুল আযীয : তাহলে তো থিওডমির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

দূত : থিওডমির একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি অহেতুক রক্তপাত এড়াতে চান।

আবদুল আযীয : অহেতুক রক্তপাত আমাদের মুসলমানদের কাছেও অত্যন্ত অপছন্দনীয়। একমাত্র অনন্যোপায় হয়েই মুসলমানরা অস্ত্র ধারন করে।

দূত : তা ঠিক। আমার আর্জি, সন্ধির শর্তবলি যেন এমন হয় যাতে বীর মুজাহিদ যোদ্ধাদের বীরত্ব অক্ষুণ্ন থাকে এবং জেনারেল থিওডমিরেরও সম্মান রক্ষা পায়।

আবদুল আযীয : সে ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমরা কোনোরূপ অসম শর্তাবলি আরোপ করব না।

দূত : তাহলে বলুন, কী কী শর্তের ওপর সন্ধি হতে পারে।

আবদুল আযীয বললেন, সর্বপ্রথম কথা হলো, থিওডমির তার সকল সৈন্যসহ মুলমান হয়ে যাবে। তাহলে তারা আমাদের তথা সকল মুসলমানদের ভাই বলে গণ্য হবে। মুসলমান হিসেবে আমরা যেমন সুযোগ সুবিধা ভোগ করি, তারাও সেসব সুযোগ সুবিধা পাবে।

দূত : মাফ করবেন, এটা অসম্ভব।

আবদুল আযীয : তাহলে ইসলামি সাম্রাজ্যের আনুগত্য ঘোষণা করতে হবে এবং নিজেদের নিরাপত্তা দানের জন্য মুসলিম সরকারকে জিযিয়া দিতে হবে।

দূত : এ শর্ত মেনে নিলে আমাদের ওপর কোনোপ্রকার অত্যাচার হবে না তো?

আবদুল আযীয : নিশ্চয়ই না।

দূত : আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে তো?

আবদুল আযীয : তোমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না।

দূত : গির্জা নিরাপদ থাকবে তো?

আবদুল আযীয : অবশ্যই থাকবে।

দূত : জিযিয়ার পরিমাণ কি হবে?

আবদুল আযীয : পরিমাণ অতি নগণ্য। থিওডমির এবং অন্য অফিসাররা বার্ষিক দুই দিনার এবং সাধারণ মানুষ এর অর্ধেক হারে জিযিয়া দেবে।

দূত : আমরা তা গ্রহণ করলাম।

আবদুল আযীয : সকলকে এ কথার ওপর অঙ্গিকার করতে হবে, তারা সর্বদা মুসলমানদের অনুগত থাকবে; মুসলমানদের কোনো শত্রুদের তারা কোনোরকম সহায়তা বা আশ্রয় দেবে না। যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মগ্রহণ করবে তাদের জুলুম করবে না।

দূত : আমরা সেসবের অঙ্গীকার করব এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকব।

আবদুল আযীয : একজন অফিসারসহ দু'শ মুসলিম মুজাহিদ তোমাদের দুর্গে অবস্থান করবে। তাদের ভরণ পোষণ ও নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের বহন করতে হবে।

দূত : আমরা তা গ্রহণ করলাম।

আবদুল আযীয : তাহলে সন্ধিপত্র লেখা হোক।

দূত : তাই হোক।

আবদুল আযীয : সন্ধিপত্র লেখা হতে হতে থিওডমিরকে ডেকে আনো। কারণ সন্ধিপত্রে তাকেই স্বাক্ষর কতে হবে।

দূত : আপনি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করুন। আমি তাকে ডেকে আনছি।

আবদুল আযীয : তাহলে আমার সাথে এসো।

আবদুল আযীয দুর্গের কাছ থেকে চলে এলেন। মুজাহিদরাও নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে এলেন। আবদুল আযীয নিজ তাঁবুতে বসে সন্ধিপত্র প্রস্তুত করতে বসলেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে এ সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আমরা এখানে এর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি–

আবদুল আযীয ইবনে মূসা ইবনে নুসায়র ও থিওডমিরের মধ্যকার সন্ধির সন্ধির শর্তাবলি।

আল্লাহ তায়ালার নামে আবদুল আযীয এবং থিওডমিরের মধ্যে এ সন্ধি সম্পাদিত হচ্ছে। অরিহিউলাতে থিওডমিরের শাসন পূর্বের মতো বলবৎ থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত থিওডমির এ চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ মুসলিম সরকার তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। তার প্রজাদের ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলিম সরকার কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না। তাদের গির্জার কোনোরূপ অবমাননা করা হবে না। থিওডমির ও তার প্রজাদের নিম্নলিখিত শর্তাবলির ওপর অঙ্গিকারবদ্ধ হতে হবে এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

১. মুসলমানদের শত্রুদের কোনোরূপ সহায়তা বা আশ্রয় দেয়া চলবে না।

২. শত্রুদের সম্বন্ধে কোনো তথ্য গোপন করা যাবে না।

৩. সর্বদা মুসলিম সরকারের অনুগত থাকতে হবে।

৪. প্রতি বছর জিযিয়া আদায় করতে হবে।

৫. মুসলমানদের কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

৬. কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা যাবে না।

৭. মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গা দিতে হবে এবং মসজিদ নির্মাণে কোনোরকম বাধা প্রদান কিংবা কোনোরূপ অসম্মান করা চলবে না।

৮. যে সকল মুসলমান দুর্গে অবস্থান করবে, তাদের সঙ্গে কোনোরকম শত্রুতা কিংবা ধোঁকাবাজি করা চলবে না।

চুক্তিপত্র লেখা শেষ হলে আবদুল আযীয বললেন, এখন থিওডমিরকে ডেকে আনা যায়। কারণ তাকে শর্তাবলি পাঠ করে তারপর সই করতে হবে।

দূত : ঠিক আছে, প্রথমে আপনি সই করুন। তারপর আমি তাকে ডেকে আনব।

আবদুল আযীয : আমি দস্তখত তখনই করব যখন থিওডমির এসে তা পাঠ করবে।

দূত তৎক্ষণাৎ তার ছদ্মবেশ টেনে খুলে ফেলল। আবদুল আযীয ও অন্য মুজাহিদগণ লক্ষ্য করলেন, দূতই স্বয়ং থিওডমির। অতএব সকলেই অবাক বিস্ময়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তেত্রিশ. থিওডমিরের বুদ্ধিমত্তা

সকল ঐতিহাসিকই থিওডমিরের সে বুদ্ধিমত্তার কাহিনির উল্লেখ করেছেন। খ্রিষ্টান ও আরব ঐতিহাসিকগণ বিশদভাবে এর বিবরণ দিয়েছেন। সন্দেহ নেই, থিওডমির অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। শত্রুদের মধ্যে এভাবে বেরিয়ে আসা এবং তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসা তার জন্য একটি অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ ছিল। আবদুল আযীয তাকে লক্ষ্য করে বললেন, থিওডমির! সন্দেহ নেই, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে একটি অসাধারণ সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে; তবে তুমি কিছু নির্বুদ্ধিতার কাজও করেছ।

থিওডমির : সেটা কেমন?

আবদুল আযীয : তোমার তো মনে আছে যে, সর্বপ্রথম তুমিই মুসলমানদের মোকাবিলা করেছিলে। মুসলমানা তা এখনো ভুলেনি।

থিওডমির : হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

আবদুল আযীয : তুমিই তো ইসমাঈলকে বন্দী করেছিলে?

থিওডমির : জী হ্যাঁ।

আবদুল আযীয : এরপর রডারিকের সাথে একত্রিত হয়েও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ।

থিওডমির : জী না, সেটা করিনি।

আবদুল আযীয : আমার সাথেও যুদ্ধ করেছ।

থিওডমির : জী হ্যাঁ, সেটাতো গতকালকের ঘটনা।

আবদুল আযীয : এসব কথা মনে করে তোমার কি মনে হয় না, আমরা তোমার রক্তপিয়াসী?

থিওডমির : হ্যাঁ, সেটা মনে হয়।

আবদুল আযীয : তা জেনেও এভাবে শত্রু পরিমণ্ডলে বেরিয়ে আসা তোমার কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে?

থিওডমির : কেন এমন করেছি, তা কী আপনি জানেন?

আবদুল আযীয : না।

থিওডমির : তা হলে শুনুন। আমার বিশ্বাস জন্মেছে, মুসলমানরা সত্যবাদী এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী। তারা যা ওয়াদা করে, কখনোই তার বরখেলাফ করে না।

তাই সন্ধিপত্র লিখিত না হওয়া পর্যন্ত আমি আত্মপ্রকাশ করিনি। সন্ধিপত্র সম্পাদিত হতেই আমি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলাম।

আবদুল আযীয : মুসলিম না হয়ে যদি অন্য কোনো জাতি হতো?

থিওডমির : তাহলে তাদের বিশ্বাস করতাম না।

আবদুল আযীয : তাহলে এখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করো।

থিওডমির তাতে স্বাক্ষর করে বললেন, দয়া করে আমাকে এর একটি অনুলিপি দিন।

আবদুল আযীয : ঠিক আছে।

সন্ধিপত্রটির একটি অনুলিপি প্রস্তুত করে তাকে দেয়া হলো।

থিওডমির বললেন, আমি আপনাকে দাওয়াত জানাচ্ছি।

আবদুল আযীয : আমি গ্রহণ করছি; কিন্তু যদি কোনোরকম প্রতারণা কর?

থিওডমির : বিশ্বাস করুন, আমি প্রতারণা করতেই পারি না।

আবদুল আযীয : কেন?

থিওডমির : আপনি দুর্গে গিয়েই কারণ বুঝতে পারবেন।

আবদুল আযীয : কেবল এক শর্তে আমি দুর্গে যেতে পারি।

থিওডমির : কোন শর্তে?

আবদুল আযীয : তোমাকে দুর্গের সকল ফটক খুলে রাখতে হবে।

থিওডমির : আমি আজকেই সকল ফটক খুলে দেবো।

আবদুল আযীয : তাহলে আমি দাওয়াত গ্রহণ করলাম।

থিওডমির উঠতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খবর এলো, খাবার প্রস্তুত হয়েছে। আবদুল আযীয খাবার নিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়ে থিওডমিরকে খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। থিওডমির সম্মতি দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই খাবার নিয়ে আসা হলো। অত্যন্ত সাধারণ ধরনের। দুজনই বন্ধুর মতো একত্রে আহার গ্রহণ করলেন। আহার সেরে থিওডমির উঠে দাঁড়ালেন এবং অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। তার যাওয়ার পরপরই উসমান, হাবিব এবং ইদরীসকে ডেকে আবদুল আযীয জানিয়ে দিলেন, থিওডমিরের সঙ্গে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছে। অতএব সকলেই নিজ নিজ তাঁবুতে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। সন্ধি হয়ে যাওয়ায় সকলেই নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিলেন এবং আহার সেরে ময়দানে গিয়ে জমায়েত হলেন। দশজন দশজন করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারা মাঠের সবুজ ঘাসে বসে বিভিন্ন কাজে লেগে গেলেন।

সেদিন তারা দুর্গের বাইরেই অবস্থান করলেন। পরদিন সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের সকল ফটক খুলে দেয়া হলো। কিছুক্ষণ পর থিওডমির কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলিম সৈন্যদলের দিকে আসতে লাগলেন।

মুজাহিদরাও থিওডমিরের আগমন লক্ষ্য করলেন। আবদুল আযীয মুজাহিদদের থিওডমিরের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার কাহিনি শুনিয়েছিলেন। মুসলমানরা নিজেরাও বীর, তাই তারা বীরদের সম্মান করতেন। তারা থিওডমিরকে স্বাগত জানাতে তাঁবুর বাইরে এসে সাদর অভিবাদন জানালেন। মুসলমানদের আন্তরিকতা লক্ষ্য করে থিওডমির অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি আন্তরিকভাবে মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

আবদুল আযীয থিওডমিরকে নিজে তাঁবুতে নিয়ে বিছানায় বসালেন। থিওডমির বললেন, আমাকে আপনারা যে আন্তরিকতা দেখালেন, তাতে আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুইয়ে আসছে। আবদুল আযীয বললেন, আমাদের নবী চরিত্র ও সভ্যতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি স্বয়ং মুসলমানদেরকে সৎচরিত্র ও ভদ্রতা শিক্ষা দিয়েছেন। সৎচরিত্র মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। যে মুসলিম চরিত্রবান নন, তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়। তাই বিশ্ববাসী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশংসামুখর। আমরা অসির সাহায্যে বিশ্বজয়ের প্রয়াসী নই; বরং আমাদের চরিত্র মাধুর্য দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করতে চাই।

থিওডমির : এজন্যই খ্রিষ্টানরা আপনাদের শত্রু জেনেও আপনাদেরই মুখাপেক্ষী।

আবদুল আযীয : মনে রেখো, অস্ত্রবলে বিজিত দেশ ততক্ষণই নিয়ন্ত্রণে থাকে, যতক্ষণ অস্ত্রবল বিদ্যমান থাকে; কিন্তু চরিত্রবলে যা জয় করা হয়, তা চিরদিন অনুগত থাকে।

থিওডমির : তা ঠিক। আচ্ছা, আপনি আমাদের সাথে দুর্গে যাচ্ছেন তো।

আবদুল আযীয : যখন কথা দিয়েছি, অবশ্যই যাব।

থিওডমির : তাহলে চলুন।

আবদুল আযীয তখন হাবীব, উসমান, ইদরীসসহ আরো প্রায় একশত অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে থিওডমিরের সাথে দুর্গের দিকে যাত্রা করলেন। কাছাকছি পৌঁছে তাঁরা দেখতে পেলেন, দুর্গের প্রাচীর সম্পূর্ণ জনশূন্য। একজন সৈন্যকেও কোথাও ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল না। আবদুল আযীযের মনে সন্দেহ হলো। কোনোরকম ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে না তো? কিন্তু যেহেতু দাওয়াত গ্রহণ করা হয়েছে এবং তিনি যাত্রাও করেছেন, তাই উচ্চবাচ্য না করে নীরবে যেতে লাগলেন। দুর্গ ফটকে পৌঁছে দেখতে পেলেন, সেটি অত্যন্ত মজবুত ও

দৃঢ়। তারা ফটক পেরিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করলেন। ভেতরে গিয়েই বাদ্যের সুর শুনতে পেলেন। বালিকা বাদকদল বাঁশি বাজাচ্ছে। তাদের পরনে সুন্দর সুন্দর পোশাক। আবদুল আযীয ও মুজাহিদরা একবার তাদের দেখেই চোখ নামিয়ে ফেলেন। থিওডমির মুসলমানদের লক্ষ্য করছিলেন। তার ধারণা ছিল, মুসলমানরা সুন্দরী বালিকাদের দেখে খুশি হবেন। কিন্তু তাদের চোখ নামিয়ে ফেলতে দেখে থিওডমির বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। মুসলমানদের সততা ও চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে তার মনে আরো গভীর বিশ্বাস জন্মালো। আবদুল আযীয বললেন, আমাদের ধর্মে বাদ্য শুনা বৈধ নয়। দয়া করে তা বন্ধ করে দিন। থিওডমির তৎক্ষণাৎ বাদ্যবাজনা বন্ধ করে দিলেন। মুজাহিদরা থিওডমিরের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলেন। কাল প্রাচীরের উপর যেসব খ্রিষ্টান সৈন্য দাঁড়ানো ছিল, মুজাহিদরা মনে মনে তাদের খুঁজছিলেন; কিন্তু কাউকেই কোথাও দেখা গেল না। থিওডমির তা লক্ষ্য করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী খুঁজছেন?

আবদুল আযীয : গতকাল যেসব সৈন্য প্রাচীরের উপর মোতায়েন ছিল আমি তাদের খুঁজছি।

থিওডমির (স্মিত হেসে) : আমি তাদের বিদায় দিয়ে দিয়েছি। সন্ধি হওয়ার পর এসবের আর প্রয়োজন নেই।

আবদুল আযীয : আমরা তো কাউকেই বেরিয়ে যেতে দেখিনি?

থিওডমির : তাদের কেউ বাইরেও যায়নি।

আবদুল আযীয : তাহলে তারা কোথায় গেছে?

থিওডমির : তারা দুর্গের ভেতরই রয়েছে, তবে তারা সৈন্য নয়।

আবদুল আযীয : তাহলে তারা কে?

থিওডমির : এখনই আপনি তা বুঝতে পারবেন।

কিছুদূর গিয়ে তাঁরা একটি সৈন্যদল দেখতে পেলেন। সে দলের সৈন্য সংখ্যা প্রায় পাঁচশ কিন্তু সকলেই ছোট আকৃতির। আরো কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, তারা সবাই সুন্দরী নারী। পুরুষদের পোশাক করে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে মুসলমানরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। আবদুল আযীয থিওডমিরকে জিজ্ঞেস কলেন, এরাই কি সেই সৈন্যদল যারা গতকাল প্রাচীরের ওপর দাঁড়ানো ছিল?

থিওডমির : জী হ্যাঁ। আমি দুর্গে প্রবেশ করে দেখি, পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। সিপাহির সংখ্যা দু'শর বেশি হবে না। তাই সর্বপ্রথম এই মেয়েদের পুরুষদের পোশাক পরিধান করাই। মাথায় চুল এমনভাবে বাঁধানো হয় যে, তা দেখে দাড়ি বলে মনে হয়। এরপর তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে প্রাচীরের ওপর মোতায়েন করি।

এটাই ছিল আমার একমাত্র সৈন্য। মুসলমানরা থিওডমিরের বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হলেন।

আবদুল আযীয : তুমি মেয়েদের পুরুষ বানিয়ে এবং নিজে পাদরির বেশ ধরে আমাদের ধোঁকা দিয়েছ। তোমার এ কৌশল দেশকে রক্ষা করেছে।

থিওডমির : আমার এ কৌশলের সাথে আপনার ইনসাফের সমন্বয়েই দেশ রক্ষা পেয়েছে। আমার আত্মপ্রকাশের পর আপনারা যদি আমাকে হত্যা করে ফেলতেন, তাহলে তো এ দেশ আপনাদেরই অধীন হতো।

আবদুল আযীয : আমরা মুসলমান। মুসলমানরা ওয়াদা করে কখনো ভঙ্গ করে না।

থিওডমির : আমার তা জানা ছিল। এজন্যই আমি এতো সাহস করেছিলাম।

এরপর তারা দুর্গের রাজকক্ষের নিকট পৌছে গেলেন। তারা ঘোড়া ছেড়ে মহলে প্রবেশ করলেন। খাওয়া দাওয়ার পর মুসলমানরা নিজ তাঁবুতে ফিরে এলেন। পরদিন থিওডমির জিযিয়া নিয়ে আবদুল আযীযের কাছে উপস্থিত হলেন। আবদুল আযীয সেসব বুঝে নিয়ে পরদিন টলেডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

চৌত্রিশ. তুষ্ট লোকদের আকাঙ্ক্ষা

টলেডোয় আনন্দের ধুম পড়ে গেল। প্রায় সমস্ত মুজাহিদ দলই সেখানে পৌঁছে গেছেন। আবদুল আযীযও তাঁর সৈন্যসহ টলেডোয় পৌঁছে গেলেন; কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কোনোরূপ অহংকার বা প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। ফলে খ্রিষ্টান বা ইহুদিরা নির্ভয়ে মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারছে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুসলমানদের কাছে বসে থাকছে।

স্পেনের ইহুদিরা অধিকাংশই সম্পদশালী। এজন্য খ্রিষ্টান শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল। তাদের নানাভাবে শোষণ করত। তাছাড়া খ্রিষ্টান সমাজে তাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না; সবাই তাদের হীন দৃষ্টিতে দেখতো; যেমন বর্তমানে ভারতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেখা হয়। ইহুদিরা খ্রিষ্টানদের পাশেও বসতে পারতো না; কিন্তু স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহুদিরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তারা সকল প্রকার নাগরিক অধিকার ফিরে পেলো। ইহুদিরা তাদের হারানো সম্মান ফিরে পেয়ে অন্যদের চোখেও সম্মানের পাত্রে পরিণত হলো। মুসলমানদের চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেক ইহুদি-খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করলো। মুসলমান হওয়ার ফলে তারা মুসলমানদের মতোই সম্মান লাভ করে।

নওমুসলিমদেরকে মুসলমানরা যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখতেন। তাদের দেখে ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও নওমুসলিমদের যথেষ্ট সম্মান করতো। ধীরে ধীরে টলেডোয় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকল।

রাহীলের পিতাকে তারিক মালাগা থেকে ডেকে এনেছিলেন। তিনিও তখন টলেডোয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুসলমানদের প্রতি তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন। রাহীলের পিতা এবং আমামন একই সঙ্গে ছিলেন। তাদের দুজনের কন্যারাও তাদের সঙ্গে ছিলেন। আবদুল আযীযের টলেডোায় পৌঁছার আগেই উক্ত দুজন তাদের কন্যাসহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা সকলেই মহলে অবস্থান করছিলেন। রডারিকের এ মহলটি খুবই প্রশস্ত। এতে অনেকগুলো কক্ষ। কয়েকটিতে মূসা, কয়েকটিতে তারিক এবং বিভিন্ন অফিসাররা অবস্থান করছিলেন। কয়েকটি নায়লার অধীনে ছিল।

আবদুল আযীযও এসে এখানেই অবস্থান করলেন। আমামন ও ইয়াকূব একটি কামরায় অবস্থান করছিলেন। এখন সমগ্র স্পেনে মুসলমানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে

এসে গেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একদিন কাউন্ট জুলিয়ান এবং সেভিলের পাদরি স্ক্যাফ এসে উপস্থিত হলেন। মূসা আন্তরিকভাবে তাদেরকে অভিনন্দন জানালেন। জুলিয়ান মূসাকে বললেন, এ মহা বিজয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানানোর জন্যই আমি এখানে পৌঁছেছি।

মূসা : এ সমৃদ্ধ ও অনুপম দেশটি দখলে আমাদের উৎসাহিত করার জন্য আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনার প্রতিশোধ স্পৃহা মিটেছে তো?

জুলিয়ান : জী হ্যাঁ, আমি যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটি হয়েছে। এখন কোথায় রডারিক, কোথায় তার দোসররা। সবারই তো পতন হলো। এখন দেশে শান্তির যুগ এসেছে। খ্রিষ্টান-ইহুদি সকলেই আপনাদের ইনসাফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মূসা : হয়তো আপনার কন্যা ফ্লোরিন্ডার মনের ক্ষোভও নিশ্চয়ই দূর হয়ে গেছে।

জুলিয়ান : জী হ্যাঁ, সে এখন খুবই খুশি এবং আপনাদের প্রশংসায় সরব। আসলে আপনারা আমার ফরিয়াদে সাড়া না দিলে আমি এ লম্পট রডারিকের প্রতিশোধ নিতে পারতাম না; বরং মনের ক্ষোভে দুঃখে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।

মূসা : আমি সিউটায় আপনার শাসন ক্ষমতা বহালের নির্দেশ দিচ্ছি।

জুলিয়ান : এ মহানুভবতার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

মূসা জুলিয়ানের শাসন ক্ষমতা বহালের নির্দেশনামাটি তার কাছে হস্তান্তর করলেন। জুলিয়ান আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। যেদিন জুলিয়ান চলে গেলেন এর পরদিন নায়লা নিজ কামরার সামনে বসেছিলেন। এমনি সময় সেখানে আবদুল আযীয এসে উপস্থিত হলেন। আবদুল আযীযকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলা করছিল। আবদুল আযীযকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন।

আবদুল আযীয সেখানেই বসে পড়লেন। নায়লাও তাঁর সামনে বসে গেলেন। আবদুল আযীয বললেন, আল্লাহর হাজারো শুকরিয়া, আমি তোমাকে আবার দেখতে পেলাম। নায়লা মুচকি হেসেবে বললেন, আমার কথা আপনার মনে কী সবসময় ছিল?

আবদুল আযীয : নিশ্চয়ই মনে ছিল।

নায়লা : ভণিতা ছাড়ুন তো।

আবদুল আযীয : তুমি আমার ওপর রাগ করেছ নাকি?

নায়লা : না, তবে আমি কোনোরকম ভণিতা পছন্দ করি না।

আবদুল আযীয : আমি ভণিতা করছি নাকি?

নায়লা : না, ভণিতা করবেন কেন, খুবই ঠিক কথা বলছেন।

আবদুল আযীয : অদ্ভুত ব্যাপার তো? তুমি বিশ্বাস করছ না কেন, আমি মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারিনি; বরং তোমার ছবি সর্বদা আমার মনে আঁকা।

নায়লা : এর প্রমাণ তো এটাই যে, টলেডো ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে এসে গেছেন, তাই না?

আসলে আবদুল আযীয টলেডো ফেরার দুদিন পর নায়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। এজন্যই নায়লা তাঁকে ক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। আবদুল আযীয বললেন, আমি পৌঁছেই আসতে চেয়েছিলাম ...

নায়লা তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বললেন, কিন্তু আসতে পারেননি, তাই বলবেন তো?

আবদুল আযীয : হ্যাঁ।

নায়লা : কেন?

আবদুল আযীয : তোমার সৌন্দর্যভীতি আমাকে আসতে দেয়নি।

নায়লা : তাহলে আজ সাহস হলো কী করে?

আবদুল আযীয : আজকে অনেক কষ্টে মনটাকে শক্ত করলাম।

নায়লা : সেদিনও তো শক্ত হতে পারতেন।

আবদুল আযীয : চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।

নায়লা : আপনি এতো ভীরু কেন?

আবদুল আযীয : এটাই তো বিস্ময়ের কারণ! আমি কখনো ভীরু নই; কিন্তু তোমার সামনে এলেই ভীত হয়ে পড়ি।

নায়লা : এসব কথা আমার পছন্দ না।

আবদুল আযীয : কথা তো নয়; বরং এটাই বাস্তব।

নায়লা : আমার কি একটা ব্যবস্থা করবেন?

আবদুল আযীয : আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হলে অবশ্যই করতাম।

নায়লা আড়চোখে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, কি করে ফেলতেন আমাকে?

আবদুল আযীয : আমি তোমাকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতাম।

নায়লা : আমাকে মুসলমান বানাবেন কেন, আপনি খ্রিষ্টান হতে পারেন না?

আবদুল আযীয : না, এইজন্য পারি না যে, খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিলকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। ফলে হযরত ঈসা (আ.) যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন, খ্রিষ্টানরা আজকে আর তাতে নেই।

নায়লা : আপনি তা কি করে জানলেন?

আবদুল আযীয : তুমি কখনো আল্লাহকে দেখেছো?

নায়লা : না।

আবদুল আযীয : আল্লাহ কি মানুষের মতোই।

নায়লা : না।

আবদুল আযীয : তাহলে আল্লাহ মানুষের পিতা হন কী করে?

নায়লা : আপনি কি জানেন যে, যিশুর পিতা ছিল না?

আবদুল আযীয : আমি জানি। তুমি তো এ-ও জানো, আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

নায়লা : হ্যাঁ।

আবদুল আযীয : আল্লাহ তাঁর কুদরতের নমুনাস্বরূপ হযরত ঈসা (আ.)-কে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাঁর কেন, আল্লাহ কারোই পিতা নন। তিনি একা। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি আমাদের প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলে দিয়েছেন যে, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়; তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারো জনক নন; তাঁকে কেউ জন্ম দেননি; কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়।'

নায়লা : এসব কথার অর্থ কি?

আবদুল আযীয : অর্থ এটাই, তুমি মুসলমান হয়ে যাও।

নায়লা : কিন্তু আপনি খ্রিষ্টান হতে পারবেন না।

আবদুল আযীয : কোনো মুসলমান কোনো অবস্থায়ই নিজের ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে না।

নায়লা : তা হলে আপনার ভালোবাবসার দাবির গুরুত্ব কতখানি?

আবদুল আযীয : গুরুত্ব অনেক, তোমার প্রতি আমার সীমাহীন ভালোবাসা আছে।

নায়লা : কিন্তু ভালোবাসার গুরুত্ব ধর্মের অনেক ঊর্ধ্বে। এ জন্য ভালোবাসার খাতিরে ধর্ম ত্যাগ করতে হয়।

আবদুল আযীয : না, ধর্ম ভালোবাসার ঊর্ধ্বে। তাই ভালোবাসার জন্য ধর্ম ত্যাগ করা যায় না।

নায়লা : কেন?

আবদুল আযীয : ভালোবাসা তো একটি জৈবিক ব্যাপার। তাই জীবনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসারও পতন ঘটে, কিন্তু ধর্ম চিরঞ্জীব।

মৃত্যুর পর ধর্ম কাজে আসে এবং মানুষকে জান্নাতের সুখ দান করে।

নায়লা : তাহলে আপনি ধর্ম ত্যাগ না করলে আমি করব। আমি আমার ভালোবাসার জন্য জীবন দিতে পারি। আমিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবো।

আবদুল আযীয : তাহলে তো তোমার এ ধর্মান্তর অর্থহীন হবে।

নায়লা : কেন?

আবদুল আযীয : কারণ, কোনো কিছুর লোভে ইসলাম গ্রহণ করা ঠিক নয়।

নায়লা : তাহলে?

আবদুল আযীয : ইসলামকে সঠিক ধর্ম জেনে গ্রহণ করলেই কেবল উপকারে আসবে।

নায়লা : আমি ইসলামকে সঠিক ধর্ম বলেই জানি। কেননা ইসলাম যদি আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্ম না হতো, তবে মুসলমানরা স্পেন জয় করতে পারতো না।

আবদুল আযীয : তাহলে তুমি মুসলমান হতে পার।

নায়লা : আপনি আমাকে মুসলমান করুন।

আবদুল আযীয কালেমা পড়িয়ে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন এবং পিতা মূসাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। মূসা জানতে পেলেছিলেন, আবদুল আযীয নায়লাকে, ইসমাঈল বিলকিসকে এবং তারিক রাহীলকে ভালোবাসে। সুতরাং তিনি উক্ত তিনজনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। সকলের সম্মতি পাওয়া গেলে ইসলামি নিয়ম মতে এক অনাড়ম্বর পরিবেশে তাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিয়ের পর আবদুল আযীয নায়লাকে 'হার পরিহিতা সুন্দরী' তারিক রাহীলকে 'স্পেনের সুন্দরী' এবং ইসমাঈল বিলকিসকে 'স্পেনের চন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করলেন। তারপর এ তিন দম্পতি অত্যন্ত সুখে জীবনযাপন করতে থাকলেন।

এভাবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। মুসলমানরা যে দেশেই গিয়েছে, সে দেশকে, সে দেশের অধিবাসীদের আপন করে নিয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত করেছে। মুসলমানরা সমকালীন বিশ্বে নজিরবিহীন নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে স্পেনকে সমৃদ্ধ করেছে। তাতে বিশ্ববাসী বিস্মিত হয়েছে। এসব আবিষ্কারের কথা আজো ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

আল্লাহর অনুগ্রহে সমাপ্ত

মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম তারিক বিন যিয়াদ। অসম সাহসী যোদ্ধা হিসেবে তাঁর বিশ্ববিশ্রুত। আল্লামা সাদিক হুসাইন একজন ঐতিহাসিক ও উর্দু কথা সাহিত্যিক। ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখক উপন্যাসের আঙ্গিকে সে মহান বিজয়ীর চরিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। বইটি উপন্যাস হলেও লেখক কোনো চরিত্রকে অতিমানবিক গুণাবলীর রঙ চড়িয়ে দেননি। বরং ঐতিহাসিক চিত্রায়নে লেখকের সংযমী ভাষা কাহিনিকে করে তুলেছে আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী।

ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী তারিক বিন যিয়াদের ন্যায় প্রতিষ্ঠায় দুর্বার সংকল্প আর নিপীড়িত মানবতার মুক্তির তাঁর দরদ ও আকুতি আমাদের প্রেরণার উৎস। এ মহান বিজয়ীর অজানা ইতিহাস ভবিষ্যত বংশধরের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

গ্রন্থখানি নির্বাচন ও অনুবাদের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন বন্ধুবর আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী। একরকম তাঁর একক উৎসাহেই আমি বইটির অনুবাদে হাত দিই। পরে জীবনসঙ্গিনী বেগম জাকিয়া পারভীনের ব্যক্তিগত প্রেরণা ও উৎসাহে দেরিতে হলেও অনুবাদ কার্য সমাপ্ত করি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতেও তাঁর বিশেষ অবদান আছে।

বইটি প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ধাপে ধাপে যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এ শুভ মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে সবাইকে সরণ করছি। আল্লাহ সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পরিশেষে বলি, বইটি পাঠকের কাছে ভালো লাগলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ হাফেজ।

অনুবাদক
১৮/১২/১৯৮৮ঈ.

মাকতাবাতুত তাকওয়া
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
☎ 01962-414070 facebook.com/maktabatuttaqwa/
ISBN 978-984-90391-6-7
9 789849 039167
Cover : Hamim 01712813999